প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৯৯

প্রকাশক
সৌমোন্দু ঘোষ
৪১/১ প্রাণকৃষ্ণ গাঙ্গুলি রোড
বালি, হাওড়া

প্রচ্ছদ
সলিল সরকার

অক্ষর বিন্যাস
ওয়ার্ড ওয়ার্কস
৭২/৩ এফ/১ আর কে চ্যাটার্জি রোড
কলকাতা ৭০০ ০৪২

মুদ্রক
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

সূচী

ভূমিকা

নাট্যকার মন্মথ রায় মহাশয়ের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে নানা আলোচনা চলেছে, নানা দিক থেকে তাঁর রচনার বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। নাটকের দ্বারা একটা জাতির মনন সংস্কৃতি ফুটে ওঠে, নাট্যাভিনয় ও নাট্যমঞ্চের ইতিহাস জাতিরও মনঃপ্রকৃতির ইতিহাস। সে দিক থেকে মন্মথ রায়ের সমগ্র নাট্যকর্মের শুধু অভিনয় নয়, তার সাহিত্যগত আলোচনাও অত্যন্ত প্রয়োজন। শুধু মঞ্চ-সফল নাটকেই নাটকের সার্থকতা নয়, তার মধ্য দিয়ে দেশ ও সমাজের যথার্থ ছবি ফুটে ওঠা প্রয়োজন। অবশ্য তত্ত্বকথা প্রচারও একমাত্র লক্ষ্য নয়, যাকে Thesis drama বলে, অর্থাৎ যাতে কোনো সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈপ্লবিক বা মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব প্রাধান্য পায়, কখনো সরাসরি, কখনো বা রূপক-প্রতীকের ছদ্মবেশে। নাটক রচনার নানা শাখা-প্রশাখায় মন্মথ রায়ের ছিল অবাধ বিচরণ। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, একাঙ্ক নাটক, রূপক নাটক—এই নাট্যকার সব বিষয়েই লেখনী পরিচালনা করেছিলেন। প্রথম জীবনে অভিনয়ের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন, ফলে নাটকের সাহিত্যমূল্য ও অভিনয়মূল্য—দুই বিষয়েই তাঁর ছিল নিপুণ অভিজ্ঞতা। বার্ধক্যে পৌঁছেও তাঁর সৃষ্টিকর্মের বিরতি ছিল না, রোগশয্যায় শুয়েও নাটকের রচনা ও পরিচালনা করেছিলেন। সুতরাং একালের তরুণ গবেষকগণ যদি তাঁর নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে অনুপুংখ আলোচনা করেন, তাহলে বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই। তাতে বোঝা যাবে, যাঁরা মননের চর্চা করেন তাঁরাও এই নাট্যকারের প্রতিভা সম্বন্ধে কত আগ্রহী।

ড. শ্রীমতী জয়তী ঘোয মন্মথ রায়ের নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে যে গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করেছেন, তার গবেষণামূল্য এবং সাহিত্যমূল্য—দুটিই বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। সাহিত্যের গবেষণা একালে কারো কারো রচনায় ভীতিপ্রদ আকার গ্রহণ করে। শুষ্কং কাষ্ঠং ভূরি পরিমাণ তথ্যই শুধু গবেষণা নয়, তথ্য থেকে বক্তব্যকে সুচারু মূর্তি দেওয়া গবেষণার লক্ষ্য হওয়া উচিত। কেউ কেউ বলতে পারেন, সাহিত্যের গবেষণায় কৃত্রিম সাহিত্যের জল মিশিয়ে রসার্দ্র করার কোনো প্রয়োজন নেই। গবেষণা, তা সাহিত্যেরই হোক, আর বিজ্ঞানেরই হোক—যুক্তিবাদী হবে, এবং তার সঙ্গে হবে সুখপাঠ্য। পাঠযোগ্যতা না থাকলে সে আলোচনা ক্রমেই খরিদ্দারের অভাবে বিস্মৃত হয়ে যাবে। কিন্তু বক্ষ্যমাণ গবেষণাটি যেমন তত্ত্ববহুল, তেমনি সুবিন্যস্ত—সুখপাঠ্য তো বটেই।

মন্মথ রায় একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর পৌরাণিক নাটক পৌরাণিক হয়েও সমকালের সঙ্গে অন্বিত, দেশ ও সমাজকে বুঝবার জন্যই তিনি পুরাণকে প্রতীকের আকারে গ্রহণ করেছেন, পুরাতনকে নতুনের বাতাবরণে হাজির করেছেন। দেবাসুর সংগ্রামকে তিনি যদি শাসক-শাসিতের রূপকে ব্যাখ্যা করেন, চাঁদ

সদাগরকে যদি দেবদ্রোহী মানুষের সংগ্রামের নাটকীয়তায় স্থাপন করতে চান, 'কারাগার' নাটকে যদি কংস ও কংসহন্তা কৃষ্ণের প্রতীকে ইংরেজ শাসকের সঙ্গে ভারতবাসীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত ফুটিয়ে তুলতে চান, তা হলে তাতে anachronism বা দূরান্বয় দোষ ঘটেছে এ অভিযোগ আনা চলবে কি? জয়তী ঘোষ এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছেন।

মন্মথ রায়ের নাট্যপ্রতিভা সব থেকে সার্থক হয়েছে একাঙ্কিকায়। তাঁর পূর্বেও কেউ কেউ একাঙ্কিকা রচনা করেছেন বটে, কিন্তু একাঙ্ক নাটকের বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ আছে, সে দিক থেকে বিচার করলে মন্মথ রায়ের একাঙ্কিকাগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ একথা মানতেই হবে। স্বল্প পরিসরের মধ্যে উপস্থাপনা থেকে উপসংহার—সমস্ত পর্যায়গুলি আঁটসাঁট বন্ধনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হয়। পঞ্চাঙ্ক নাটকে নাট্যকারের অশেষ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু একাঙ্কের মধ্যে ঘনত্ব আনতে গেলে মিতভাষিতা সম্বন্ধে নাট্যকারকে সব সময়ে অবহিত থাকতে হয়। সেকালে গিরিশচন্দ্র যেমন বাংলা দর্শক, নাট্যকার ও নাট্যমঞ্চকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিলেন, একালে মন্মথ রায়ও সেই ভাবে, হয়তো আরো সার্থকভাবে মঞ্চ ও দর্শকের ব্যবধান ঘুচিয়েছেন, স্থান, কাল ও কাহিনীকে ঐক্যের মধ্যে ধারণ করতে চেয়েছেন। মন্মথ রায়ের নাটক আমাদের মনের কাছে যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করে, জয়তী ঘোষ তার যথাযথ উত্তর খুঁজেছেন, এবং তাঁর গবেষণাগ্রন্থে তার তাৎপর্য ও সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

পরিশেষে আর একটি কথা বলে বিদায় নিই। জয়তী ঘোষের বাগ্‌ভঙ্গিমা যে-কোনো পাঠককে মুগ্ধ করবে, মনে হবে না আমরা কোনো তত্ত্বগ্রন্থ বা গবেষণাগ্রন্থ পড়ছি। এই পরিচ্ছন্ন ভাষারীতি, বাক্‌প্রতিমা, বক্তব্যের গভীরতা ও মননের তীক্ষ্ণতা পাঠক-পাঠিকাকে আনন্দ দেবে তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। গবেষণা যে ধূম্রলোচন "গভেষণা' নয়, সে কথাটি জয়তী ঘোষের এই আলোচনা থেকে বোঝা যাবে। এই জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানাই।

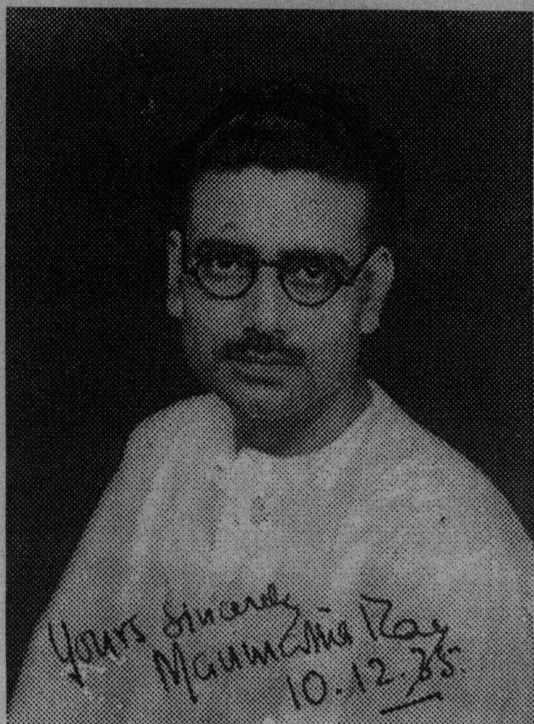
১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৯

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

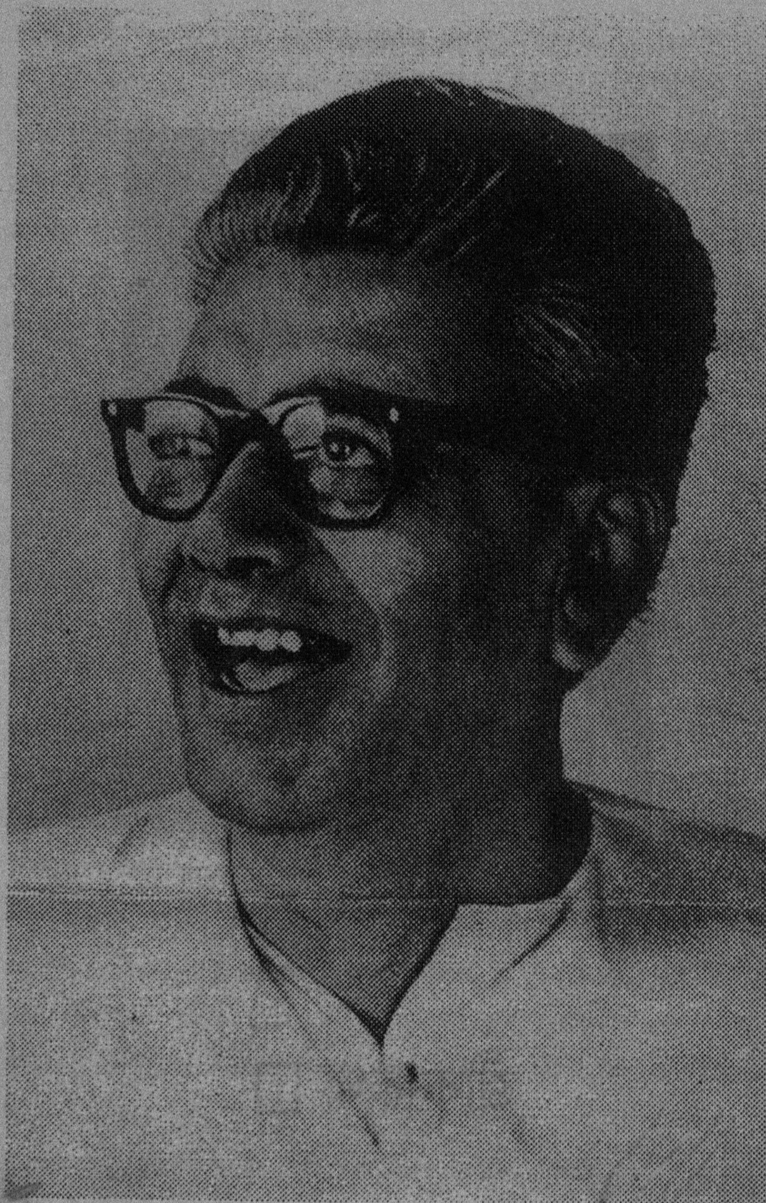
আমার কথা

মন্মথ রায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৭৭ সালে গবেষণার সূত্রে। তাঁর শেষ সাক্ষাৎকার নিয়েছি ১৬.৬.৮৮. বিকেল পাঁচটায় তাঁর জন্মদিনে। মাঝের বছরগুলিতে কাজের তাগিদে যাতায়াতে সম্পর্কে নৈকট্য এসেছে। পরিচয় সূত্রটি কেবল নাট্যব্যক্তিত্ব ও গবেষকের হয়ে থাকেনি ; পিতাকন্যার মধুর সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। সময়ে অসময়ে প্রয়োজনের তাগিদে যখনই গিয়েছি সস্নেহ আহ্বান রেখেছেন। এতবড় মাপের একজন মানুষ যাঁর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্ত ধরনের সম্মান স্বীকৃতি ছিল তিনি কত সহজে নাট্যকর্মী ও নাট্যগবেষককে সম্মান জানিয়ে প্রাণিত করেছেন। গবেষণা করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছি এক বিরল ব্যক্তিত্বকে। প্রতিদিনের দৈনিক পত্র খুঁটিয়ে পড়তেন ; কোনো ভাল কাজে অভিনন্দন ও শোকে সমবেদনাপত্র পাঠানো তাঁর অভ্যেস ছিল। বড় বড় গোটা অক্ষরে লিখতেন। বিশেষ কথা দুবার করে বলতেন। প্রাণ খুলে হাসতেন। নিজের নামের আগে 'নাট্যকার' কথাটি লিখে তিনি যে পুরোপুরি একজন নাটকের মানুষ এবং এই পরিচয়টাই যে তাঁর ক্ষেত্রে একমাত্র সত্য এটি বোঝাতে পেরে তিনি গর্বিত হতেন। জীবনে একটিও বিদেশী নাটকের অনুবাদ করেননি, কোনো উপন্যাসের নাট্যরূপও দেননি অথচ বাংলা নাট্যসাহিত্যকে দিয়ে গেছেন অজস্র গভীর মৌলিক উপলব্ধিজাত নাটক, জীবনমনস্ক মনোজ্ঞ পাঠ নাটক—পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্কের আঙ্গিকে।

তাঁর শতবর্ষে আমার নিবেদন 'মন্মথ রায় : জীবন ও সৃজন'। এই গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য আমাকে তাগাদা দিয়েছেন, প্রাণিত করেছেন, সাহস দিয়েছেন আমার মা, প্রয়াত বন্ধু প্রসূন ও অসংখ্য শুভার্থীজন। আমার অধ্যাপক সমিতির অগণিত বন্ধু। আমার স্বজন সাথী সৌম্যেন্দু, কন্যা অয়স্তিকা, গৌতম ও বিশ্ববন্ধুদা (ভট্টাচার্য) এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে আমায় ঋণী করেছেন। আমি উপকৃত হয়েছি পুস্তক বিপণির কর্ণধার অনুপবাবুর কাছেও। সকলের প্রতি জানাই আমার অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও নমস্কার।



জীবনকথা □



।। মন্মথ রায় : জীবনকথা

শিল্পী যখন জলরঙ, তেলরঙ, ক্রেয়ন বা প্যাস্টেলে ছবি এঁকে তাঁর সৃষ্টিকে জীবন্ত করেন, তখন বোঝা যায় ঐটিই তাঁর শিল্পসৃষ্টির সঠিক মাধ্যম। শতাব্দীর সমবয়সী নাট্যকার মন্মথ রায়ের সৃষ্টির ক্ষেত্রটি প্রসঙ্গে কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। তাঁর সামনে তো সাহিত্যের বিচিত্র বিভাগ ছিল--যার মধ্যে দিয়ে নিজের উপলব্ধিকে অভিব্যক্ত করা যায় ; অথচ তিনি শুরুতেই বেছে নিলেন নাটক--তাঁর প্রথম ও শেষ ভালবাসা। উপলব্ধ জীবনবোধ, দেশপ্রেম, সামাজিক দায় থেকে তিনি রচনা করলেন একের পর এক নাটক একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গের আঙ্গিকে। দীর্ঘ ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি বাংলা নাটক ও প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। শিল্পীর কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর কোনোরকম দ্বিধা বা দুর্বলতা ছিল না। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন ভাবাদর্শ নিয়ে তিনি বাংলার নাট্যাঙ্গনে পা রাখলেন এই বিশ্বাস নিয়ে যে নাটক ও নাট্যশালা যদি জাতির চেতন ও অবচেতন মনে ভালোমন্দ সম্পর্কে, অথবা অবনমনের ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চৈতন্যের জাগরণ না ঘটায়, জাতিকে যদি সংকট-উত্তরণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত না করে তবে সে নাটক ও নাট্যশালা হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট, পথভ্রষ্ট। ধর্মান্ধতা, অজ্ঞতা ও প্রথাবদ্ধতাকে মন্মথ জাতীয় সংকটের মূল কারণ বলে মনে করতেন। আদর্শহীনতা, নৈতিকমূল্যবোধের অভাব তাঁকে যন্ত্রণা দিত। তাই আজীবন তিনি একই লক্ষ্যে স্থিত রেখেছেন নিজেকে – নিজের সৃজনশীলতাকে। কারণ তিনি জানতেন দেশকে গড়তে গেলে সবার আগে জানতে হবে নিজের দেশের কথা-- আর নাটকই হচ্ছে তার উপযুক্ত মাধ্যম – এই উপযুক্ত মাধ্যমটিকে তিনি সর্বতোভাবে কাজে লাগিয়েছেন। মন্মথের মনন ও সৃজনের নেপথ্য ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের সজাগ কৌতূহল ও আগ্রহ-নিবৃত্তির জন্য তাঁর জীবন পর্যালোচনা ও যুগভাবনার বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরী। কারণ ১৮৯৯ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত--এই দীর্ঘ সময়কাল জুড়ে যাঁর পদচারণা, প্রাচীন ও আধুনিকের মেরুবন্ধনকারী হিসেবে যিনি চিহ্নিত, তাঁর নাট্যকার হয়ে ওঠার বিষয়টিকে ঘিরে তরঙ্গায়িত হচ্ছে নানান জিজ্ঞাসা--অবশ্যই ঐতিহ্যবাহিত নাট্যনির্মাণের ধারাটিকে কেন্দ্রে রেখেই।

এই বছরটি অর্থাৎ ১৯৯৯ মন্মথ রায়ের জন্মশতবর্ষ পূর্তির বছর। ১৮৯৯ সালের ১৬ জুন অবিভক্ত ভারতবর্ষের টাঙ্গাইলের গালা গ্রামে হিন্দু বৈদ্য পরিবারে তাঁর জন্ম। মা সরোজিনী, পিতা দেবেন্দ্রগতি। পিতামহ গুরুগতি রায়, পিতামহী বরদাসুন্দরী দেবী। সুন্দর হাতের লেখার জন্য পিতামহ গুরুগতি রায়ের দারোগার চাকরি পাওয়ার ঘটনাটি আজও গল্প হয়ে আছে। একারণেই বহুদিন পর্যন্ত বালুরঘাটের রায়বংশের বাড়িটিকে দারোগার বাড়ি বলে পরিচয় দেওয়া হত। মন্মথের পিতা দেবেন্দ্রগতি গালাতে তালুকদার ছিলেন এবং পরে নাটোরের সারকুটিয়া এস্টেটের (দিনাজপুরের পাটিচোরা বিভাগের) ম্যানেজার। তাঁরা ছিলেন সেনগুপ্ত। রায় তাঁদের উপাধি। মন্মথরা পাঁচ

ভাইবোন। তিনি একমাত্র পুত্র, চার বোন তাঁর ছোট। ছোটবেলা থেকেই মন্মথর মনন ও জীবনচর্চা একটি সুশিক্ষিত, সংস্কৃতিবান উদার পারিবারিক মণ্ডলে অভ্যস্ত হতে শুরু করে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর পরিবারের গভীর অনুরাগ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, সমকালীন জীবনযাত্রার অগ্রগতিতে অংশ গ্রহণ, প্রথম থেকেই তাঁর মানসিক গঠনকে শক্তপোক্ত করে দেয়। ঐসময় ১৯০৫ সালে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে বাঁচতে মন্মথর পরিবার গালা থেকে বালুরঘাটে চলে আসতে বাধ্য হয়। মন্মথর বয়স তখন ছয়। গালাতে ফেলে আসা শৈশবের স্মৃতি তিনি পরিণত বয়সেও ভোলেননি। ভোলেননি ভিন্নধর্মী ভৃত্য বাঁশী শেখের উষ্ণ সাহচর্যের কথা—যার কোলে-পিঠে চড়ে তিনি ছোট থেকে বড় হয়েছেন। ভোলেননি ছোটবেলার খেলার সাথী বাঁশী শেখের মেয়ে ফুলির কথা, হিন্দু-মুসলমান পরিবারের সম্প্রীতির কথা। বাছবিচার ছিল ঠিকই কিন্তু সদ্ভাব-সম্প্রীতির অভাব ছিল না।

নাট্যকারের স্মৃতিচারণে পাই গালা থেকে বালুরঘাট আসার পথে তাঁর প্রথম রেল ও স্টিমার চড়ার অভিজ্ঞতা হয়। সেই সুদীর্ঘ যাত্রাপথটির স্মৃতি তিনি দীর্ঘদিন সযত্নে লালন করেছেন। গালা থেকে বালুরঘাটে এসে মাটির ঘরে ঠাঁই পাবার স্মৃতিটিও তিনি ভোলেননি। বড় সুন্দর মনে হয়েছিল জীবনের এই নব দিগ্‌দর্শন। গালাতে ফেলে আসা বিশাল দীঘির অভাব তাঁকে ভুলিয়ে দিয়েছিল বাড়ির কাছের আত্রেয়ী নদী। তখন সবে বালুরঘাট মহকুমা সদর শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানেই মন্মথ ১৯০৬ সালে ভর্তি হন গৌরী পালের পাঠশালায়। পাঠশালার শিক্ষার স্মৃতিতে তাঁর সবচেয়ে ভয়ানক লেগেছিল শিক্ষকদের বেতমারার শাসন। এর কিছুকাল পরে বালুরঘাটে প্রথম উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের চক্রান্তের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন। ১৯০৬ এর ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সারা বাংলাদেশ জুড়ে পালিত হয়েছে অরন্ধন ও রাখীবন্ধন। ব্রিটিশ সরকার আইন পাশ করে রাজদ্রোহাত্মক সভাসমিতি বন্ধ করেছেন। দেশের জন্য ক্ষুদিরাম বসু ফাঁসির মঞ্চে জীবন দিয়েছেন। জাতীয় বিপ্লবীরা গ্রেফতার বরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথের মত বহু কবির কলম দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আগুন ঝরেছে। বাংলা রঙ্গমঞ্চও চুপ করে থাকেনি। জাতীয় সংকটে দেশাত্মবোধের এই উন্মাদনা নাটক ও নাট্যশালাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। এই সময়কালে বাংলা রঙ্গমঞ্চে বহু দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র, ক্ষিরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমরেন্দ্র দত্ত এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। মিনার্ভা, স্টার, ক্ল্যাসিক, কোহিনূর থিয়েটারে সগৌরবে অভিনীত হয়েছে সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, প্রতাপাদিত্য, রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, মেবারপতন, সাজাহান এবং বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ। এই সময়কালে রচিত প্রহসনগুলির মধ্যেও জাতীয়তাবোধের উন্মাদনার ধারা প্রবাহিত হয়েছে। অমৃতলাল বসুর 'সাবাস বাঙালী' তার অন্যতম। গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা'র আহ্বান সেদিন স্বেচ্ছাচারী ইংরেজকে সতর্ক করেছে অকুণ্ঠভাবে :

"...হয় যদি বিদ্রোহ সফল
বাঙ্গালায় বঙ্গবাসী-হইবে নবাব।।
কিন্তু সাবধান!
ফিরিঙ্গিরে নাহি দিও সূচ্যগ্র স্থান"।।

এই উত্তাল উন্মাদনার মধ্যেই মন্মথ পাঠশালা ছেড়ে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। তখন থেকেই শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ ও বুদ্ধিমত্তায় শিক্ষক মহলে তিনি অন্য ছাত্রদের থেকে আলাদাভাবে নজরে পড়েন। লেখাপড়ায় তিনি বিশেষ মনোযোগী ও মেধাবী ছিলেন। পাশাপাশি খেলাধূলা, বনভোজন, প্রতিবেশীদের বিপদে আপদে সাহায্য করাও চলত। একটু উঁচু ক্লাসে উঠে তিনি হাতে লেখা সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করে তাঁরই সমবয়সী আক্কেল মণ্ডল। যার কথা পরবর্তীকালে যখনই মন্মথর মনে হয়েছে তিনি আক্ষেপ করেছেন : "আক্কেল মণ্ডল খুব ভালো লিখতো। বড় হয়ে এই আক্কেলকে আমি হারিয়ে ফেলেছি, কোন খোঁজ পাইনি সেজন্য দুঃখ হয়"। (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার থেকে)

শিক্ষানুরাগী পিতা দেবেন্দ্রগতির আগ্রহে রায় বাড়িতে নেওয়া হত নানান পত্রপত্রিকা, চলতি নাটক নভেল। বঙ্কিমের উপন্যাস, মানকুমারীর কবিতা। এছাড়া পিতার সংগ্রহে ছিল গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসুর নাটক ও হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের যাত্রাপালাগুলি। মন্মথর প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিতা মা সরোজিনীর অদম্য উৎসাহ দেবেন্দ্রগতিকে এই সংগ্রহে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। স্বামীর কাছে গয়নার বদলে সরোজিনী চেয়েছেন বই, পত্রপত্রিকা। সেযুগের অনেক কবিতা ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। গৃহকর্মের ফাঁকে লুকিয়ে তিনি কবিতা লিখতেন। মন্মথর স্মৃতিচারণে পাই "আমার মা লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতাও লিখতেন, যার একমাত্র পাঠক ছিলেন আমার বাবা"। মায়ের সাহিত্যপ্রীতি, কবিতাচর্চা মন্মথর সামনে জ্ঞানের নতুন জগৎ উন্মোচন করে দেয়। আগামী দিনে নাট্যকার হয়ে ওঠার ক্ষেত্রটিকেও প্রস্তুত করে। গালা ছেড়ে বালুরঘাটে আসবার আগেই মন্মথর জীবনে ঘটে যায় এক অভাবিত ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকে শিশু ধ্রুব-র চরিত্রে অভিনয়ের সূত্রে ঘটে নাট্যমঞ্চে প্রথম অবতরণ। বালুরঘাটে এসে বাড়ির পাশে কালিমন্দির প্রাঙ্গনে মথুর সাহার যাত্রাদলের 'পদ্মিনী' পালা দেখে নয় বছরের মন্মথ ১৯০৮ এ উন্মাদনায় লিখে ফেলেন দু'পাতার একটি নাটক—'রানী দুর্গাবতী'—নাট্যকারের লেখা প্রথম নাটক। এক্ষেত্রে হয়ত নাট্যকারের অজান্তে কাজ করেছিল পারিবারিক পরিমণ্ডলের সংস্কৃতিমনস্কতা ও দেশপ্রেম। এসময় দেশব্যাপী মিছিলের মুখে মুখে ফিরছে দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা দেশাত্মবোধক গান—'ধনধান্যে পুষ্পেভরা', 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে', 'ভারত আমার', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে'। গোটা দেশজুড়ে স্বাধীনতার জন্য উন্মাদনা।

১৯১৩ সাল। মন্মথ তখন বালুরঘাট হাইস্কুলের ছাত্র। ঐ সময়ে ঐ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হয়ে এলেন প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত নলিনীকান্ত ভট্টশালী। বিদ্যালয়ের পারিতোষিক

বিতরণী অনুষ্ঠানে ছাত্রদের দিয়ে তিনি অভিনয়ে করালেন রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর'। এতে অমলের ভূমিকায় তিনি নির্বাচিত করলেন কিশোর মন্মথকে। এ প্রসঙ্গে তাঁরই লেখায় পাই : "....দেখিলাম মহকুমা শহরটিতে সাহিত্যচর্চার বালাই বিশেষ নাই। স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় আমার উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' অভিনীত হইল। নাট্যকার শ্রীমান মন্মথ রায় তখন সেই স্কুলের......ছাত্র। এই প্রিয়দর্শন বালকটিকে অমলের ভূমিকায় অভিনয় করিতে নির্বাচিত করিয়াছিলাম। অমলের পার্ট সে চমৎকার করিল। আমি এখন মনে মনে এই বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করি যে এই অভিনয়ের সাহিত্যরস সংক্রমনই হয়তো ভবিষ্যতে শ্রীমান মন্মথ রায়ের নাট্য প্রতিভার বিকাশের কারণ হইয়াছিল"। (শনিবারের চিঠি /১৩৪৮/ আশ্বিন : নলিনীকান্ত ভট্টশালী)

বালুরঘাটে ঐ সময় যুবক ও মধ্যবয়সীদের মধ্যে নাট্যপ্রীতি ও নাট্যচর্চার প্রাবল্য দেখা দেয়। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকায় দেখা যায় সেখানকার দক্ষ অভিনেতা আশুতোষ ঘোষ, চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায়, ক্ল্যারিওনেট বাদক মতিলাল মুখোপাধ্যায়কে। সংগঠক ও উদ্যোক্তা হিসেবে এগিয়ে আসেন বিভিন্ন পেশার মানুষরা— শশাঙ্কশেখর রায়, রাধাচরণ ভট্টাচার্য, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ সেন, নলিনীকান্ত অধিকারী এবং মন্মথর পিতা দেবেন্দ্রগতি রায় ও আরো অনেকে। এঁদের অনেকেই ছিলেন সে যুগের নামকরা আইনজীবী, মোক্তার, মুহুরি, কনট্র্যাকটর ও ব্যবসায়ী। প্রায় সকলেই সম্পন্ন পরিবারের। বালুরঘাটে একটি স্থায়ী নাট্যশালা নির্মাণে এঁরা উদ্যোগী হলেন। বালুরঘাটের সরকারি হাসপাতালের উত্তর দিকে সংগৃহীত হল একখণ্ড জমি। কাছের ইঁট খোলা থেকে বয়ে আনা হল ইঁট ছেলে বুড়ো সকলের সম্মিলিত উদ্যোগে। জনসাধারণের মেহনতে, জনসাধারণের সম্পদ হয়ে গড়ে উঠল স্থায়ী নাট্যশালাটি। স্বাধীনতার পূর্বে যার নাম ছিল 'এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ক্লাব' এবং স্বাধীনতার পরে 'নাট্যমন্দির'। দেবেন্দ্রগতি একসময় এর সম্পাদকও হয়েছিলেন। মন্মথর স্মৃতিচারণে পাই : "আজ আমার এই বয়সেও পরম গর্ব যে...যে স্থায়ী নাট্যশালাটি গড়ে উঠল তার ভিত এ আমার বয়ে আনা ইঁট আর তার মেহনত আছে।—নাট্যমন্দির নামে আজও সগৌরবে বর্তমান"। (অমৃত : বিনোদন সংখ্যা / বাঙলার সাধারণ মঞ্চ ও আমি / মন্মথ রায়) পরবর্তী কালে মন্মথও বেশ কিছু দিন এই নাট্যমন্দিরের সম্পাদক ছিলেন। এখানে নাট্যচর্চা হত বেশ। তখন স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য বা নাটকে নাচগানের জন্য গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে সামান্য কিছু হাত খরচের বিনিময়ে আনা হত কমবয়সী ছেলেদের। উদ্যোক্তারা ব্যক্তিগতভাবে তাদের খাওয়াপরার ভার নিতেন। মন্মথদের বাড়িতেও এমন একটি ছেলেকে এনে রাখা হয়েছিল যা তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে জানতে পারি। ১৯১৪ সাল। শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যরা বৃটিশের হয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। লক্ষ প্রাণের বলি হয়। ধনের বিনাশ ঘটে।

এরই মাঝে ১৯১৭ সালে মন্মথ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক উত্তীর্ণ হলেন কিন্তু বৃত্তি পেলেন না। দেবেন্দ্রগতির বদ্ধমূল ধারণা হল থিয়েটারের প্রতি ঝোঁক এর প্রধান কারণ।

ইতিমধ্যেই কিশোর মন্মথ লুকিয়ে পড়ে ফেলেছেন বাড়িতে সংগ্রহ করে রাখা গিরিশ ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসুর নাটক ও হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের যাত্রা পালাগুলি। পিতা দেবেন্দ্রগতি একমাত্র পুত্র মন্মথকে রাজশাহী পাঠিয়ে দিলেন আই. এ পড়তে। ১৯১৯ এ প্রথম বিভাগে আই-এ উত্তীর্ণও হলেন কিন্তু এবারেও বৃত্তি পেলেন না। কলেজে পড়ার সময়ে সুদক্ষ ছাত্র অভিনেতা অস্তিম বোস-এর পরিচালনায় গিরিশ ঘোষের 'পাণ্ডবগৌরব' নাটকে দণ্ডীরাজের ভূমিকায় অভিনয় করলেন তিনি। প্রশংসিতও হলেন। ছুটিতে বালুরঘাটে ফিরে থিয়েটার প্রীতি ও নাট্যচর্চার অদম্য ইচ্ছায় মন্মথ সহযোগী বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তুললেন 'ভেকেশন ক্লাব'—কলেজের ছুটিতে যারা ফিরে আসত বালুরঘাটে তাদেরই পরিচালিত ছিল এই সংস্থা। এই ভেকেশন ক্লাবের উৎসাহী সদস্যদের মধ্যে মন্মথর সাথে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন তারকেশ্বর গুহ, জিতেন চৌধুরী, রামকালী সান্যাল, নরেন অধিকারী, দ্বিজেন চক্রবর্তী, প্রফুল্ল নিয়োগী এবং অনিলশঙ্কর চৌধুরী। এই সংস্থার উদ্যোগে অভিনীত হল অতুলানন্দ রায়ের 'পাণিপথ', ডি এল রায়ের 'নূরজাহান'। অভিনয় হল এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ক্লাব মঞ্চে। প্রত্যক্ষ নাট্যচর্চার সঙ্গে এ ভাবেই জড়িয়ে পড়লেন নাট্যকার। ১৯১৭ সালে সোবিয়েত বলশেভিক পার্টির বিপ্লবের বাণী পৃথিবীর অন্যদেশের মত ভারতেও আলোড়ন সৃষ্টি করল। পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষ উদ্দীপিত হল। এই সময়কালটি পৃথিবীর ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের পতনের ও শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের বিজয়লাভের যুগ বলে চিহ্নিত হল। নজরুল লিখলেন : 'ওই নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড় / তোরা সব জয়ধ্বনি কর'।

১৯১৮তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল। জয়ী হল সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু ভারতে দেখা দিল খাদ্যাভাব, মূল্যবৃদ্ধি। ভারত রক্ষা আইনের জায়গায় এল নতুন আইন রৌলট আইন, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সভা-সমিতি করার অধিকারকে নস্যাৎ করতে। সমগ্র ভারতে জ্বলে উঠল আগুন। গান্ধীজী এগিয়ে এলেন গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন তখনকার মত সফল হল না।

১৯১৯ ঘটে যায় আর একটি অমানবিক ঘটনা। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে বৃটিশবাহিনী হত্যা করে হাজার হাজার মানুষকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায়। সমস্ত দেশজুড়ে বর্ষিত হয় ঘৃণা। সংগঠিত হয় প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনার প্রতিবাদে প্রত্যাখ্যান করেন 'সার' খেতাব। দেশজুড়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বৈরাচারী ইংরেজের বিরুদ্ধে আরম্ভ হয় আইন অমান্য আন্দোলন। এসময় বাংলা নাটক ও নাট্যশালা মূক হয়ে থাকেনি। বরদাপ্রসন্ন বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লেখেন 'মিশরকুমারী'। ক্ষীরোদপ্রসাদ লেখেন 'আলমগীর'।

হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি নিয়ে নিশিকান্ত বসুরায় লেখেন 'দেবলাদেবী' ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীরে' সময়ের তাগিদেই ঔরঙ্গজীবের মুখ দিয়ে বলানো হয় হিন্দুমুসলমানের মিলনের কথা।

১৯২০ সালে মন্মথকে পাঠানো হল স্কটিশচার্চ কলেজে বি. এ পড়তে। জনডাস হোস্টেলে থেকে তাঁর পড়ার ব্যবস্থা হয়। এই সময় স্কটিশচার্চ কলেজের বাংলার বিভাগীয় প্রধান ছিলেন অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু--থিয়েটার মহলে যিনি 'মোশান মাষ্টার' হিসেবে খ্যাত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে "আমাদের মাষ্টার মশাই অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু একাধারে ছিলেন শিক্ষক ও নাট্যাচার্য।....নাট্যাভিনয় ও নাটক রচনায় তাঁর কৃতিত্ব ছিল।....অধ্যাপকের মর্যাদার সঙ্গে নাট্যগুরুর মর্যাদা দুইই তাঁতে মিলে গিয়েছিল"। (নাট্যাচার্য শিশিরকুমার : শঙ্কর ভট্টাচার্য)। শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নরেশচন্দ্র মিত্র তাঁর কাছ থেকে নাটকের পাঠ নিয়েছেন। মন্মথও প্রেরণা পেলেন তাঁর কাছ থেকে। ১৯২০তেই বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গদেশ বিজয়ের ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে মন্মথ লিখলেন তাঁর প্রথম পঞ্চাঙ্ক নাটক 'বঙ্গে মুসলমান'। ছুটিতে 'ভেকেশন ক্লাব'-এর সদস্যরা এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ক্লাবমঞ্চে মঞ্চস্থ করল এই নাটকটি। বালুরঘাটে তখন নাটকের অভিনয় শুরু হত রাত ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে। শেষ হতে (পঞ্চাঙ্ক নাটক) সময় লাগত চার-পাঁচ ঘণ্টা। কিন্তু পরিচালনার অনভিজ্ঞতায় নাটকটি শেষ হতে পরদিন সূর্য উঠে গেল। নবনাট্যকার মন্মথকে শুনতে হল নানা বিদ্রূপাত্মক কথা যা পরবর্তীকালে তাঁর নাট্যজীবনে সূর্য উদয়ের সূচনা করল।

বি. এ পরীক্ষায় বসার আগেই ১৯২১ এ ভারত জুড়ে শুরু হয়ে গেল অসহযোগ আন্দোলন। দেশজুড়ে স্বাধীনতার জন্য উত্তাল উন্মাদনা। আবেগপ্রবণ মন্মথ পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখলেন সিনেট হাউসের সামনে অশ্বারোহী মিলিটারী সৈন্যরা মেয়ে পিকেটারদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। দেশপ্রেমের উন্মাদনায় মন্মথ তখন পরীক্ষা বর্জন করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন। 'ভারতসেবক সংঘ'-এর সভ্য হয়ে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। পরীক্ষা আর দেওয়া হল না। কিন্তু এর কিছুদিন পর মন্মথ সুভাষচন্দ্র প্রমুখ দেশনেতার পরিচালিত 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন' থেকে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

পরের বছর ১৯২২-এ স্কটিশ থেকে উত্তীর্ণ হলেন বি. এ। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার অধ্যক্ষ ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও আইন বিশারদ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। দেবেন্দ্রগতির অত্যন্ত পরিচিত। ছেলেকে তাঁর ভরসাতে পাঠিয়ে দিলেন ঢাকায় এম. এ ও আইন পড়তে। জগন্নাথ হলের আবাসিক ছাত্র হয়ে গেলেন মন্মথ। একই সাথে 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাব' ও 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন'-এর--সম্পাদক হয়ে গেলেন তিনি। পড়াশোনা, ছাত্রসংগঠন করার পাশাপাশি চললো ক্রীড়াচর্চা। ঢাকাতে থিয়েটারের আবহাওয়া তখন খুবই প্রবল ছিল। কলকাতায় যেসব থিয়েটার নাম করতো ঢাকার বুকে সেগুলিই আগ্রহ নিয়ে অভিনয় করতো ঢাকার নাট্যপ্রেমীরা। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের অনুপ্রেরণায় মন্মথ জগন্নাথ হলের ছাত্রদের জন্য ১৯২৩-এ বৌদ্ধযুগের পটভূমিতে লিখলেন এক দৃশ্যে সম্পূর্ণ দেড়ঘণ্টার একটি নাটক--নাম দিলেন 'অম্বা'। নরেশচন্দ্র নাটকটি পড়ে খুশি হলেন। কিন্তু

চরিত্রসংখ্যা অল্প বলে নাটকটি জগন্নাথ হলের ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হল না। এরপর ১৯২৩-এর নভেম্বরে মন্মথ সহপাঠীদের জন্য লিখলেন কল্হণের রাজতরঙ্গিণী অবলম্বনে দেবদাসী কমলাকে নিয়ে 'দেবদাসী'। ১৯২৩ এর ডিসেম্বরে 'জগন্নাথ হল ড্রামাটিক এসোসিয়েশন' এর উদ্যোগে এটি অভিনীত হল। 'দেবদাসী'তে বিজয়াদিত্যের ভূমিকায় অভিনয় করলেন নাট্যকার।

এরই মধ্যে নাট্যকারের জীবনে ঘটে গেল অভূতপূর্ব এক ঘটনা--যা তার জীবনের মোড় ফিরিয়ে পথনির্দেশ করে দিল। নরেশচন্দ্র তাঁকে জানালেন তাঁর লেখা 'অম্বা' 'মুক্তির ডাক' নামে অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় ১৯২৩ এর ২৫ শে ডিসেম্বরে স্টার থিয়েটারে সে যুগের বিখ্যাত প্রযোজনা 'কর্ণার্জুনের' সাথে অভিনয় হবে। মাত্র ২৩ বছর বয়সী নাট্যকার মন্মথ তাঁর ক্ষুদ্র নাটিকা 'মুক্তির ডাক'-এর মাধ্যমে সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শক মহলে সেদিন পরিচিত হয়ে গেলেন বাংলা একাঙ্ক নাটকের প্রথম শৈল্পিক স্রষ্টা হিসেবে। কিন্তু চার-পাঁচ ঘণ্টার নাটক দেখতে অভ্যস্থ দর্শক মাত্র দেড়ঘণ্টার নাটক দেখে তৃপ্ত হল না। প্রথম অভিনয় রজনীতে প্রেক্ষাগৃহে বসেই নাট্যকারকে শুনতে হল বিরূপ মন্তব্য। এছাড়া তাঁকে বেদনার্ত করেছিল আরো একটি ঘটনা যা পরবর্তীকালে তিনি তাঁর স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন। সেটি হল তিনি যখন খবর পেলেন ১৯২৩-এর ২৫শে ডিসেম্বর স্টারে তাঁর 'মুক্তির ডাক' অভিনীত হবে তখন বালুরঘাট থেকে কলকাতায় ছুটে এসেছিলেন বহু আশা নিয়ে যে পোষ্টারে নিজের নামটি দেখবেন। কিন্তু তাঁর আশা ভঙ্গ হলো। উপরন্তু প্রেক্ষাগৃহে বসে কটু মন্তব্য শুনে তিনি স্থির করলেন-- আর নাটক লেখা নয় ; আইন পাশ করে তিনি ওকালতিতেই মন দেবেন।

ইতিমধ্যে এম. এ পাশ করার আগেই মন্মথ পিতামাতার অনুরোধে ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ৩রা ফাল্গুন বিবাহ করেন বগুড়া জেলার ডাক্তার সুরেন্দ্রচন্দ্র বক্সীগুপ্তের তৃতীয়া কন্যা তাঁর চেয়ে দশ বছরের ছোট তপোবালাকে। বিবাহের পর মন্মথ তার নাম রাখেন চিত্রলেখা। তপোবালারা তিন বোন, তিন ভাই। মাত্র পনেরো বছর বয়সে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময়তেই তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর মন্মথ ঢাকায় ফিরে ১৯২৪-এ অর্থনীতিতে এম. এ ও ১৯২৫-এ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ সময়েই জগন্নাথ হলের বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর একটি নাটক 'সেমিরেমিস'। এক অঙ্ক এক দৃশ্যের নাটক। ইতিহাসের আদিমযুগে রানী সেমিরেমিসের ভারত আক্রমণের অস্পষ্ট ঐতিহাসিক কাহিনীকে কল্পনার রঙ মিশিয়ে লেখা হয় এ নাটক। ১৯২৪ সালে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের আন্তরিক উদ্যোগে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশ করলেন মন্মথ রায়ের প্রথম মুদ্রিত নাট্যগ্রন্থ 'মুক্তির ডাক'। দাম হল ছ আনা। হরিদাস চট্টোপাধ্যায় সমালোচনার জন্য বইটি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পাঠালেন। সে যুগের বহুল প্রচারিত পত্রপত্রিকাতে সমালোচনাও বার হল। নাট্যপত্রিকা 'শিশির' লিখলো (১৩৩০ বঙ্গাব্দ ১৩ পৌষ) : "ছোট্ট একখানি ছবির মত বই। একদৃশ্যে সম্পূর্ণ।...শেষ পর্যন্ত দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাটকখানি"। সাহিত্যপত্রিকা প্রবর্তক লিখলো

(১৩৩১ আষাঢ় সংখ্যা) : "মুক্তির ডাক নাটকখানি ক্ষুদ্র হইলেও প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য"। রমেশচন্দ্র মজুমদার পত্রে নাট্যকারকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন (২৮. ৬. ২৪) : "মুক্তির ডাক পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইহা সত্য সত্যই মুক্তির ডাক"। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (২৬. ৬. ২৪) পত্রে জানালেন : 'মুক্তির ডাক' বাংলা নাট্যসাহিত্যে একটা নতুন পথ ধরিয়াছে"। 'মুক্তির ডাক'-এর খ্যাতি তাঁকে বিখ্যাত সাহিত্য বোদ্ধাদের মনের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। অপরিচয়ের অচলায়তন ভেঙে তৈরি হয় আন্তরিক সখ্যতা। নাটকের স্বাদু পাঠযোগ্যতা নির্মাণের ক্ষেত্রে মন্মথ যে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করলেন এ বিষয়ে অকুণ্ঠিত প্রশংসা করলেন প্রমথ চৌধুরী :

প্রমথ চৌধুরীর পত্র

নাটকটি তেমন মঞ্চ সাফল্য না পেলেও উপস্থাপনার অভিনবত্বে প্রশংসা আদায় করে নিল অনেকের। পাঁচ অঙ্কের দীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ দেখতে অভ্যস্ত মানুষ এক অঙ্কের সংহত বন্ধনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত সময়ের এই নাট্য নির্মাণ দেখে চমকিত হল ; যার মধ্যে একই সাথে তারা পেল দৃশ্যকাব্য ও রাসোত্তীর্ণ নাট্যরচনা—এই দ্বিবিধ গুণ।

১৯২৬ সালে সূচনা হয় মন্মথর কর্মজীবন। ঢাকা থেকে বালুরঘাটে আসার পর ওকালতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন তিনি। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রগতি তখন কঠিন নেফ্রাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে রোগশয্যায়। রায় পরিবারের শুভানুধ্যায়ী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মন্মথকে তার পিতার চাকরিটির ব্যবস্থা করে দেন। ওকালতির পাশাপাশি শুরু হয় জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজারির কাজ। এই সময় আর একটি পত্র মন্মথকে

অভিভূত করে তোলে। নজরুল ইসলাম তাঁকে পত্রে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন বার্তা পাঠান।

এক বুক কান্না [redacted] ভেঙে পথ চলে এক-দীঘি পদ্ম দেখলে দু চোখে আনন্দ যেমন ধরে না, তেমনি আনন্দ দু চোখ পুরে পান করেছি আপনার লেখায় — এ লেখা আপনি কী মনে করেছেন জানিনে, তবে আমার প্রাণের আনন্দ এর চেয়ে ভাল করে [redacted] প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই বলে শুধু অনুভব করছি।

ইতি।
"[illegible]" দর্শনাকাঙ্ক্ষী—
নজরুল ইসলাম

নজরুল ইসলামের পত্র

এই পত্র প্রাপ্তি মন্মথর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে দেখা দেয়। নাট্যকার সত্তা তাঁকে আবার হাতছানি দিতে শুরু করে। অসুস্থ পিতাও পুত্রগর্বে গর্বিত হন। পুত্রকে নাটক লেখায় উৎসাহিত করেন। ১৯২৬-১৯২৮ এই তিনবছর মন্মথ সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা সবুজপত্র, ভারতবর্ষ, কল্লোল, বিচিত্রায় লেখেন বিচিত্র স্বাদের অনেকগুলি একাঙ্ক। সেগুলি বেশ প্রশংসিত হয় এবং নানান পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে তাঁর কাছে অনুরোধ-পত্র পাঠানো হয় নাটক চেয়ে। এই ঘটনা মন্মথকে নাটক রচনায় প্রাণিত করে। বিশিষ্টজনদের এবং সেযুগের সাহিত্যবোদ্ধাদের উৎসাহ প্রেরণা ও অভিনন্দনকে পাথেয় করে তিনি গভীর প্রত্যয়ে নাটক লেখাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন।

পারিবারিক পরিমণ্ডলের উদারতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি মনস্কতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা শৈশব থেকেই তাঁর মানসিক গঠনকে শক্তপোক্ত করে দেয়। মায়ের সাহিত্যপ্রীতি, কবিতাচর্চা, নাট্যানুরাগ তাঁকে এ ব্যাপারে আরো ক ধাপ এগিয়ে দেয়। শৈশব থেকে কৈশোর— কৈশোর থেকে বয়ঃসন্ধি পার হবার প্রতিটি পর্যায় তাঁর কাছে অন্যভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে। নানাধরণের বই পড়ার পাশাপাশি নাট্যপাঠে আগ্রহ— বিশেষ করে দেশাত্মবোধক নাটক—এই ঘটনাগুলিকে একই সূত্রে গেঁথে নিলে তাঁর নাট্যকার হয়ে ওঠার নেপথ্য প্রস্তুতিটি সম্পর্কে কোনো সংশয়ই থাকে না। এ ব্যাপারে তাঁকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে পারিবারিক পরিবেশ এবং প্রত্যক্ষভাবে সমকালীন সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডল। দেশের মুক্তি কামনায় আন্দোলিত সে যুগের আদর্শ, বিপ্লববাদ, স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাপ-উন্মাদনার আঁচে মন্মথও উষ্ণ হয়েছিলেন। পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার আদর্শই তাঁর কাছে মুখ্য ছিল। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা নয়। দেশপ্রেমের অঙ্গীকার তাঁর মননে প্রোথিত করে দিয়েছিল মানব প্রেম। মানব প্রেমের

সূত্রেই তাঁর নাট্য নির্মাণের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে সমাজসংস্কার—যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

১৯২৭ এর শেষ ভাগ থেকে ভারতে জাতীয় আন্দোলন নতুন বাঁক নিয়েছে। তার আগেই ঘটে গেছে বহু মনে রাখবার মত ঘটনা। ১৯২১ ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি মস্কোতে গঠিত হয়েছে। ঐ সালেই পেশোয়ারে কমিউনিস্ট মামলা, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। বৃটিশ শাসক শ্রেণী কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ধ্বংস করতে চাইল। পারলোনা। শুরু হল সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, ধর্মঘট, স্বাধীনতা আন্দোলন তুঙ্গে উঠল।

এ সময় সোজাসুজি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নাটক লেখা বেশ কঠিন হয়ে উঠেছিল। নাট্যকাররা আকারে ইঙ্গিতে ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে দিয়ে দেশাত্মবোধ জাগরণের চেষ্টা করছেন। এই সময় আর্ট থিয়েটারের হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মন্মথকে মনোমোহন থিয়েটারের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখে দিতে অনুরোধ করলেন। এ সম্পর্কে নাট্যকারের দ্বিধা এবং ভীতি ছিল। তাঁর লেখাতে পাই : ".....কিন্তু পঞ্চাঙ্ক নাটকের বিশাল দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আমি তখনও ভীত এবং ত্রস্ত। কলকাতায় তদানীন্তন সাধারণ নাট্যশালায় যে সকল পঞ্চাঙ্ক নাটক আমি দেখেছিলাম তার মধ্যে স্টার থিয়েটারে অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' এবং নাট্যমন্দিরে যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' আমায় অভিভূত করেছিল সত্য কিন্তু ঐ নাট্যসৃষ্টির প্রধান চমক ছিল স্টারের অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস এবং নাট্যমন্দিরের শিশিরকুমার প্রমুখ নবাগত নাট্য শিল্পীদের অভিনয়ের নবনাট্যরীতির সমৃদ্ধি। সাহিত্যরস কিন্তু এই নবনাট্য সৃষ্টিতে কিছুটা উপেক্ষিত আমার মনে হয়েছিল"। (বাঙলার সাধারণ মঞ্চ ও আমি / মন্মথ রায় / অমৃত, বিনোদন সংখ্যা)

সচেতন নাট্যকার অত্যন্ত সতর্ক পর্যবেক্ষণ শক্তি নিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এমন নাটক লিখতে হবে যাতে নাট্যসৃষ্টির প্রধান চমক যেন শুধু অভিনয় কেন্দ্রিক না হয়—নাট্য বিষয় এবং উপস্থাপনার অভিনবত্বের পাশাপাশি তা যেন যুগোপযোগী ও সমকালীন হয়। এই বিশ্বাস থেকেই ১৯২৭ সালে সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকরুচি, জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে লৌকিক পুরাণ মনসামঙ্গলের কাহিনী নিয়ে মন্মথ লিখলেন 'চাঁদ সদাগর'। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে প্রতিভাসিত করে তুললেন সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তা, স্বাধীনতা কামনা, স্বদেশপ্রীতি, সমানাধিকারের দাবি এবং সর্ববিধ সামাজিক শৃঙ্খল থেকে মানবতার মুক্তি কামনাকে। ঐ সালেরই ১৪ সেপ্টেম্বর বিপুল সমারোহে মনোমোহন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় এ নাটক। পত্রপত্রিকাগুলি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে নাটক ও নাট্যের—উভয়েরই। নাট্যকারের অনুভবে প্রোথিত হয়ে গেল "নাটক আর বিলাস নয়, আত্মরক্ষার হাতিয়ার"।

মন্মথ ১৯২৮ সালে লেখেন 'দেবাসুর'। তাঁর প্রথম দেশাত্মবোধক নাটক। এ নাটকে মানবিক সম্মান ও অধিকারের দাবি নিয়ে দেবতাদের বিরুদ্ধে বৃত্রাসুরকে করেন বিদ্রোহী। পৌরাণিক কাঠামোর ভেতর ফুটে ওঠে সে যুগের সমাজদ্বন্দ্বের ছবি। ঐ সালেই লেখেন 'শ্রীবৎস'। এই সময় জন্ম হয় মন্মথর প্রথম কন্যাসন্তানের। এরপর

১৯২৯-এ 'মহুয়া'। দুটি নাটকেই ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি, মানবজীবনের প্রতি গভীর ভালবাসা। প্রথানুগ ভক্তির বদলে প্রাধান্য পায় বাস্তববোধ ও আধুনিক জীবন রস। স্টার ও মনোমোহন থিয়েটারে নাটক দুটি অভিনীত হয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করে।

কিন্তু শুধু মনোরঞ্জন নয়, নাট্যকার মন্মথর সচেতন মননে তখন শাণিত হচ্ছিল অন্য হাতিয়ার। তিনি নাটক নির্মাণের মধ্যে দিয়ে শুরু করেন আনন্দ ও জাগরণের সাধনা। লিখিত নাটকের প্রযোজিত রূপায়ন কী অভূতপূর্ব জনজাগরণ ও উন্মাদনা সঞ্চার করতে পারে তা তিনি জানতেন। কারণ ১৮৭২ এর ৭ ডিসেম্বর ন্যাশানাল থিয়েটারে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয়ের প্রতিক্রিয়ার ইতিবৃত্ত তাঁর জানা ছিল। জানা ছিল শিবনাথ শাস্ত্রীর মন্তব্যও। 'নীলদর্পণ' নাটকের ব্যাপক প্রভাব সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন ঃ "নাটকখানি বঙ্গসমাজে কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল, তাহা কখনও ভুলিব না। আবাল বৃদ্ধ বণিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম। ঘরে ঘরে সেই কথা, বাসাতে বাসাতে তাহার অভিনয়। ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমান্ত পর্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। এই মহা উদ্দীপনার ফলস্বরূপ নীলকরের অত্যাচার জন্মের মত বঙ্গদেশ হইতে বিদায় লইল"। একটি জাতির জীবনে একটি মাত্র নাটক কতদূর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, কেমন করে অত্যাচারী শাসকের মানসিক শক্তিকে পরাভূত করতে পারে 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয়ের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তব্যই তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে।

১৯৩০ সাল (১৩৩৬/৩১ ভাদ্র) মাত্র ৫৪ বছর বয়সে দেবেন্দ্রগতি প্রয়াত হন এবং জন্ম হয় মন্মথর প্রথম পুত্র সন্তানের। নাটক লেখায় কিছুদিনের বিরতি ঘটে। দেশে তখন রাজশক্তির বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন চলছে। বিবেকবান নাট্যকার চুপ করে থাকতে পারলেন না। ব্যক্তিগত শোক পরিত্যাগ করে আবার কলম তুলে নিলেন। অহীন্দ্র চৌধুরী তখন সবে মিনার্ভা থিয়োটারে যোগ দিয়েছেন। তিনি মন্মথকে অনুরোধ করলেন মিনার্ভার জন্য একটি নাটক লিখে দিতে হবে। নাটক ও নাট্যশালার অর্ন্তনিহিত শক্তি সম্পর্কে সচেতন মন্মথ নিজেই পথ খুঁজে নিলেন। শয়ে শয়ে লোক তখন দেশের জন্য স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজীর নেতৃত্বে কারাবরণ করছে। সমকালীন দেশকালের এই উন্মাদনাময় ঘটনায় মন্মথ তাঁর সচেতন মননের অভিব্যক্তি ঘটাতে উন্মুখ হবেন এটা খুব স্বাভাবিক। নাট্যকারের নিজের কথাতেই পাই : "দলে দলে লোক কারাবরণ করছিল।...এই পটভূমিকায় মহাভারত বর্ণিত কংস-কারাগার-এর কথা আমার মনে এসেছিল"। (অমৃত বিনোদন সংখ্যা / বাংলার সাধারণ মঞ্চ ও আমি / মন্মথ রায়) গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন, পরাধীন জাতিকে অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত করার দুর্জয় সাহস মন্মথকে অভিভূত করে। দেশাত্মবোধের আবেগকে নাটকের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্যই রচিত হয়, 'কারাগার'। ১৯৩০ সালের ২৪ ডিসেম্বর মনোমোহন থিয়েটারে এ নাটক

মঞ্চস্থ হয়। পত্রপত্রিকা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। পৌরাণিক ছদ্মবেশে লেখা রাজনৈতিক এ নাটক জনচেতনা জাগ্রত করছে দেখে বৃটিশ সরকারের টনক নড়ে। অষ্টাদশ অভিনয়ের পর ১৯৩১-এর ১লা ফেব্রুয়ারি বন্ধ করে দেওয়া হয় 'কারাগার'-এর অভিনয়। বিদেশী শাসকের এই স্বেচ্ছাচার দেশবাসী সেদিন নীরবে মেনে নেয়নি। নাট্যশালার কণ্ঠরোধ, স্বাধীন শিল্পসৃষ্টির প্রতিবন্ধকতায় চারিদিকে ওঠে প্রতিবাদের ঝড়—পত্র-পত্রিকায়, প্রাদেশিক আইন সভায় ও আরো নানাস্তরে। নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে শক্তিশালী জনমত। ফলে বৃটিশ সরকার তার পূর্ব আদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। সম্পূর্ণ অক্ষত ও অপরিবর্তিত রূপে নাটকটি আবার মঞ্চস্থ হয় নাট্য নিকেতনে ৮ আগষ্ট ১৯৩১। মন্মথ রায়ের 'কারাগার' সেদিন সাধারণ রঙ্গালয়ের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। এই বছরেই জন্ম নিয়েছে মন্মথর দ্বিতীয় পুত্রসন্তান।

১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত মন্মথ পরপর রচনা করেন মঞ্চ সফল বক্তব্য সমৃদ্ধ বেশ কিছু পূর্ণাঙ্গ নাটক—পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক শৈলীতে। সাবিত্রী, খনা, অশোক, সতী এবং মীরকাশিম। ১৯৩৪ এ জন্ম হয় তাঁর দ্বিতীয় কন্যার। বালুরঘাটে বসে একনাগাড়ে পনেরো বছর নাট্যচর্চা করেছেন। এই সময় কালেই মন্মথর 'কারাগার'-এর পাশাপাশি সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'গৈরিকপতাকা'—স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রের উচ্চারণ ; অভিনীত হয়েছে 'সিরাজদ্দৌলা'—নাট্যনিকেতনে। এ নাটকে শচীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন ভারতের আসন্ন বিপর্যয়ের ছবি।

বঙ্গীয় নাট্যশালার গৌরব জাতীয় সংকটের মুহূর্তে বৃটিশ সরকার ভয় দেখিয়ে, চোখ রাঙিয়ে রাজভক্তির প্রচারক নাটক রচনায় বাধ্য করতে পারেনি আমাদের নাট্যকারদের। বরং শাসকশ্রেণীর দমননীতি যত তীব্র হয়েছে—পরাধীনতার জ্বালা ও স্বাধীনতার আকাঙক্ষাকে সে যুগের নাট্যকারেরা তত তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ করেছেন নাটক নির্মাণের মধ্যে দিয়ে—রূপক প্রতীকের আবরণে বা শাসক শ্রেণীর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণবান হেনে। একজন দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে মন্মথ সে দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠা নিয়ে। এই সময়েতেই গড়ে উঠেছে প্রগতি লেখক সংঘ (১৯৩৬)। জোরদার হয়েছে ছাত্র আন্দোলনও।

১৯৩৮ পর্যন্ত বালুর ঘাটে মন্মথ রায়ের ভূমিকা ছিল বিস্তৃত। ১৯৩০ পর্যন্ত আইন ব্যবসায় যুক্ত থাকার পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গেও তিনি জড়িয়ে পড়েন—পৌরপিতা, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিকতার কাজে। বালুরঘাটে সে সময়ে সংবাদপত্রের কোনো এজেন্সি ছিলনা। কিছু মানুষের নামে ডাক বিভাগ মারফৎ কাগজ আসত। মন্মথই প্রথম তা চালু করলেন কয়েকটি সংবাদপত্রের এজেন্সি নিয়ে—ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ পেপার, বেঙ্গলি পত্রিকা ও আনন্দবাজার পত্রিকা। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, ইউনাইটেড প্রেস, ফ্রি.প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার হয়ে বালুরঘাট শহরে সংবাদদাতার কাজ শুরু করেন। গ্রাহকদের বাড়ি বাড়ি পত্রিকা তিনি সাইকেলে করে দিয়ে আসতেন। খবর য

পাঠাতেন তা পুরোপুরি ছাপা হত না। মাসে টাকা পাঁচেকের মত রোজগার - - - কাজ তাঁকে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা ও সংবাদ সম্পাদনার শিক্ষায় শিক্ষিত করে।

ঐসময় বালুরঘাট 'মিডল ইংলিশ গার্লস স্কুল' একটিই ছিল। উচ্চতর স্ত্রী শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। মন্মথ রায় এ ব্যাপারেও উদ্যোগী হয়ে মেয়েদের ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দিলেন। তাঁর ছোট বোন লীলা রায়ই প্রথম এ ব্যবস্থার ফলে ম্যাট্রিক দিতে পেরেছিলেন। তিনি দিনাজপুর স্কুল বোর্ড, বালুরঘাট লোকাল বোর্ড, বালুরঘাট হাই স্কুলের পরিচালন সমিতির সদস্য, বালুরঘাট গার্লর্স স্কুলের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন দীর্ঘকাল। সমাজসেবামূলক মনোভঙ্গি থেকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বালুরঘাটে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়। জড়িয়ে পড়েন বালুরঘাটের সমবায় আন্দোলনের সাথেও।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যখন বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত বিক্ষুব্ধ , সে সময় বালুরঘাটে মন্মথ রায়ের ওপরও কিছু দায়িত্ব এসে পড়ল। কিন্তু সরাসরি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়াটা তাঁর জীবনে ঘটেনি। অথচ ১৯৩৮ এ নেতাজীর গভীর সান্নিধ্যে এসেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন : "কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পারিনি।...আমার নিজের মনে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে কিছু ধারণা ছিল। এ বিষয়ে পড়াশুনাও...কিছু করেছি। দেশীয় ও বিদেশী নেতাদের রচনা ও গ্রন্থাদি পড়েছি।...আমার জ্ঞান কক্ষের সব বাতায়নই খোলা ছিল। তা থেকে আমার নিজস্ব একটা মতাদর্শ গড়ে উঠেছিল। সেটাতে প্রগতি ছিল, মানবিকতা ছিল এবং দেশহিতৈষণাও ছিল। কিছু মতবাদ ভালো লাগত, কিছু লাগত না। যা ভালো লাগত গ্রহণ করেছি, যা লাগত না তা বর্জন করেছি। এইভাবেই আমার মানসিক সত্তা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে"। (নাট্যকারের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত)

১৯৩৮ সালে বালুরঘাট থেকে তিনি স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ স্থায়ীভাবে কলকাতায় এসে উঠলেন। প্রথমে ৩০নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়িতে। পরে ২২৯/সি বিবেকানন্দ রোড মানিকতলায়। ১৯৩৯ এ শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪২ এ গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো আন্দোলন। স্বাধীনতা কামনায় তখন অগ্নিগর্ভ ভারতবর্ষ। শয়ে শয়ে মানুষ কারাবরণ করছে, প্রাণ দিচ্ছে। আর নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীরা যুদ্ধক্ষেত্রের বাদ্যকরদের মত অনুপ্রাণিত করছেন দেশের স্বাধীনতার সৈনিকদের। এ সময় মন্মথর নাট্যরচনা থেমে থাকেনি। দেশপ্রেমিকের সঠিক ভূমিকা থেকে রচনা করছেন অজস্র একাঙ্ক। ক্যালকাটা আর্টস প্লেয়ার্সের জন্য নাটক—সাবিত্রী, বিদ্যুৎপর্ণা, রাজনটী ও রূপকথা। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৩ চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে লিখলেন চিত্রকাহিনী, চিত্রনাট্য। ইতিমধ্যে মধু বসুর সঙ্গে সি. এ. পিব সূত্রে তাঁর যোগাযোগ ঘটে গেছে। এর আগে ১৯৩৪ এ 'শুভব্রহ্মস্পর্শ' নামে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি ও পরিচালনা করেছেন তিনি। কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের আগেই মন্মথ প্রতিষ্ঠিত নাটক রচয়িতা হিসাবে সম্মানিত হয়ে গেছেন। অথচ কলকাতায় যখন এলেন তখন মনের মধ্যে নাট্যকার হিসেবে আরো কিছু করার অদম্য

আকাঙ্ক্ষা তাঁকে অস্থির করে তুলছিল। স্থায়ী রোজগার ছিল না। অনিশ্চিত অজানা ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে ঝাঁপ দিয়ে ছবির জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। চাঁদ সদাগর, মহুয়া, অভিনয়, খনা, কুমকুম রাজনর্তকী, মীনাক্ষী, যোগাযোগ, অলকানন্দা, হাসপাতাল (হিন্দি) নির্মিত হল।

কলকাতায় আসার অল্প দিন পরে বেঙ্গল কো অপারেটিভ অ্যালায়েন্স নামে একটি আধা সরকারি সংস্থার 'ভাণ্ডার' সমবায় পত্রিকা, ত্রৈমাসিক বেঙ্গল কো অপারেটিভ জার্নাল পত্রিকার সম্পাদক হলেন মাত্র আড়াই শো টাকা বেতনে। কৃষিপত্রিকা 'বসুন্ধরা'-র সম্মানিত সম্পাদক হলেন। ১৯৩৮-১৯৪১ পর্যন্ত মন্মথ এই সম্পাদনার কাজের সঙ্গে যুক্ত রইলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হওয়ার পর (১৯৩৯এ) কলকাতা ছেড়ে বগুড়া এবং সেখান থেকে রায়গঞ্জ ও কৃষ্ণনগরে। অত্যন্ত দুঃসময়ের মধ্যে কাল কাটাতে হয় তাঁকে। জীবনের এই অনিশ্চয়তার মধ্যে তিনি সাধনা বসুর অনুরোধে পয়গম ছবির চিত্রকাহিনী রচনা করেন। আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা, দারিদ্র্য, নির্মম জীবনাভিজ্ঞতা মন্মথর মনোজগতে আনে যুগান্তর। এ সময় পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনায় বিরতি ঘটলেও একাঙ্ক রচনা থেমে থাকেনি। বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে জন্ম নিয়েছে অগণিত একাঙ্ক। ঠিক এই সময়েই কতগুলি ঘটনা বাংলা তথা ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নতুন দিক নির্দেশের সূত্রপাত করে। ১৯৪১ এ বাঙ্গালোরে গঠিত হয় ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। ১৯৪২ এ ঢাকায় সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডের পর প্রতিষ্ঠিত হয়, ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। ১৯৪৩ এর মে মাসে গঠিত হয় সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘ–আই.পি.টি.এ। এ সময়কালে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে। সারা বিশ্বজুড়ে চলছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ভারতে স্বাধীনতার প্রশ্নে দেশ নেতাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে বিরোধ। গান্ধীজীর সঙ্গে বিরোধে সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগ, আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন–জাপানের সাহায্য নিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখা সে অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ।

বিজন ভট্টাচার্য ৪২ এর আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিতে এসময় লিখলেন 'নবান্ন' নাটক। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার নিজেই বলেছেন : "ঘরে যেদিন অন্ন ছিল না, নিরন্নের মুখ চেয়ে সেদিন আমি নবান্ন লিখেছিলাম।" (নবান্ন নাটকের ভূমিকা / চতুর্থ সংস্করণ মার্চ ১৯৬২) 'নবান্ন' বিষয়ের অভিনবত্বে, উপস্থাপনের নতুনত্বে বাংলা নাটকের ইতিহাসে নতুন দিক নির্দেশ করেছিল। মন্মথ রায় এ নাটক সম্বন্ধে বললেন : "১৯৪৪ সালে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'...সমাজ বাস্তবতা ও মননশীলতার এক নবজীবনদর্শন।...নতুন এক সৃষ্টি, নতুন এর ভাবাদর্শ নিয়ে...শুরু হয়ে গেল নবনাট্য আন্দোলন"।

(স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা / মন্মথ রায়)

পেশাদার নাট্যশালার বাইরে অপেশাদার নাট্যপ্রয়াসও যে জনচিত্ত জয় করতে পারে, নবান্ন নাটক অভিনয়ের মুহূর্ত্ত থেকে তা প্রমাণিত হয়ে গেল। অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী তৈরির জোয়ারও দেখা দিল। নাট্যকাররা যেমন নতুন নাটক লিখতে লাগলেন তেমনি

নাটকের প্রযোজনা নিয়ে শুরু হয়ে গেল নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা।

১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট দেশবিভাগের মূল্যে এল স্বাধীনতা। মন্বন্তরে মহামারীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে অনশনে প্রাণ হারাল। উদ্বাস্তু সমস্যার পাশাপাশি শিল্প সম্প্রসারণ, শ্রমিক আন্দোলন, পাশাপাশি জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি ঘটল। অর্থনৈতিক বনিয়াদ ধ্বসে পড়ল। মধ্যবিত্ত সমাজজীবনেও এল পরিবর্তন। একান্নবর্তী প্রথায় ফাটল দেখা দিল। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন এল। বেকার সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হল। এই সমস্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়া তাঁর নিজ জীবনের অনুভবে মিলে মিশে গিয়ে জীবনসর্ম্পকে মন্মথ'র অভিজ্ঞতা ও কৌতূহলকে করল আরো শাণিত। তিনি পা রাখলেন মাটিতে। উপলব্ধি করলেন তাঁকে নতুন নাটক লিখতে হবে—নতুন কথা বলতে হবে। গান্ধীবাদী চেতনা ও আর্দশে বিশ্বাসী মননে জন্ম নিল সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা।

এই সময়েতেই মন্মথ পঃ বঃ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগে প্রযোজক আধিকারিক হিসেবে যোগদান করেন। পরে তথ্যচিত্র বিভাগের পরিচালক হন। এই কাজে তিনি নিযুক্ত থাকেন ১৯৫৮ পর্যন্ত। তাঁর কার্যকালের এই সময়কালে তিনি সরকারের হয়ে পঞ্চাশটি তথাচিত্র তোলেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে জনজীবনের নানা প্রামান্য তথ্যকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। টোটোদের নিয়ে তোলা ছবিটি এ প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় নজরুল ইসলামকে নিয়ে তোলা তথ্যচিত্রটির প্রসঙ্গ যেটি ১৬টি কপি করিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গের ছবিঘরে এবং মোবাইল ভ্যানের সাহায্যে প্রদর্শন করা হয়। তথ্যচিত্রের পরিচালক থাকার সময়ে ঐ দপ্তরের তৎকালীন প্রচার অধিকর্তা প্রকাশস্বরূপ মাথুর মন্মথকে জানান বাইরে কিছু লেখালিখি করতে হলে তাঁর অনুমোদন নিতে হবে। নাটক লেখার অধিকারকে খর্ব করার প্রতিবাদে মন্মথ ইস্তফা পত্র লেখেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কিরণ শংকর রায় প্রচার অধিকর্তার হুকুম বাতিল করে দেন ফলে মন্মথ সরকারি চাকরি করেও লিখতে পারেন 'ধর্মঘট', 'আজব দেশ', 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'অমৃত অতীত'-এর মত রাজনৈতিক মতবাদপুষ্ট নাটক।

এর মধ্যে সত্যজিৎ রায় ১৯৫৫ সালের কিছু আগে 'পথের পাঁচালী' ছবির কিছুটা তুলে অর্থাভাবে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে অর্থানুকূল্যের জন্য আবেদন জানান কিন্তু প্রকাশ স্বরূপ মাথুর তা অনুমোদন করেন না। কিন্তু মন্মথ ছবিটি সম্পর্কে অনুকুল রিপোর্ট ডাঃ রায়কে দিয়ে দেন এবং বিধানচন্দ্র রায় মাথুরের রিপোর্ট নাকচ করে ছবিটির জন্য সরকারি তরফ থেকে ষাট হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। ঘটনাটি নাট্যকারের বড়োমনের পরিচয়ের উদাহরণ হয়ে আছে।

১৯৫২ থেকে মন্মথর পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু। এই সময় তিনি রচনা করেন অনেকগুলি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ, লোকরঞ্জন শাখার জন্য সরকারী প্রচার নাটক, 'সি. এ পি'র জন্য বিশুদ্ধ বিনোদনের নাটক। ১৯৫২ সালের এপ্রিল, জুলাই, আগষ্ট ও

সেপ্টেম্বর মাসে রচনা করেন মহাভারতী, মমতাময়ী হাসপাতাল, পথে বিপথে এবং জীবনটাই নাটক। ১৯৫৩তে লেখেন আজব দেশ, চাষীর প্রেম, ধর্মঘট, ১৯৫৮তে সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৯৫৯ এ অমৃত অতীত, বন্দিতা, ১৯৬১ তে বন্যা, ৬৩তে দুর্গেশনন্দিনীর জন্ম, ৬৫তে তারাস শেভচেঙ্কো, ৭০-এ লালন ফকির, ৭২-এ আঠারশ বাহাত্তর। সব কটি নাটকেই নাট্যকার তাঁর নিজস্ব সামাজিক অভিপ্রায়ে চালিত হয়েছেন। 'মমতাময়ী হাসপাতালে' ব্যক্ত হয়েছে নিপীড়িত মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, 'পথেবিপথে'-তে ফুটে উঠেছে বিপর্যস্ত মূল্যবোধের অসঙ্গতি, জীবনটাই নাটক হয়ে উঠেছে মনস্তাত্ত্বিক জীবন সমস্যার রূপায়ণ। 'আজবদেশ'-এ প্রথা শাসিত ভারতবর্ষের স্থবিরতার অবসান কামনা, 'চাষীর প্রেম'-এ সুখদুঃখে ভরা পল্লী বাংলার কৃষকের বাস্তব জীবনের ছবি। শ্রমিক জীবনের পটভূমিতে, শ্রমিক শোষণের ছবি, শ্রমিক মালিকের সংঘর্ষ ফুটে উঠেছে 'ধর্মঘট' নাটকে, 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'-এ ব্যক্ত হয়েছে বঞ্চনা থেকে মুক্তিলাভের জন্য সাঁওতালদের আত্মত্যাগ, বিদ্রোহ এবং সংগ্রামের ছবি, 'অমৃত অতীত'-এ সুদূর ঐতিহাসিক পটভূমিকে উপস্থাপিত করেছেন সমকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে, 'বন্দিতা'-য় ফুটে উঠেছে নারীত্ব ও মাতৃত্বের দ্বন্দ্ব, 'বন্যা'-য় সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শের ভিত্তিতে নতুন সমাজগঠনের ইঙ্গিত, 'দুর্গেশ নন্দিনীর জন্ম'-তে দুর্গেশ নন্দিনী রচনার সমসাময়িক কালের ছবি, 'তারাস শেভচেঙ্কো'-নাটকে ইউক্রেনের বিপ্লবী জনকবি তারাস শেভচেঙ্কোর জীবন-সংগ্রাম, 'লালন ফকির'-এ লালনের জীবন এবং 'আঠার-শ বাহাত্তর'-এ বাংলার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় 'ন্যাশানাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার নাটকীয় ইতিবৃত্ত চিত্রিত হয়েছে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই পর্বে রচিত নাটকগুলি সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়নি। এগুলির রচনার ক্ষেত্রে রঙ্গালয়ের তরফ থেকে তাগিদও আসেনি। ফলে ধরে নেওয়া যায় নাট্যকারের স্বতঃস্ফূর্ত সমাজভাবনা ও সৃজনমানসিকতা থেকে নাটকগুলির জন্ম। তাই নাটকগুলিতে অভিব্যক্ত হতে দেখা যায় স্বাধীনভারতকে পুনর্গঠিত করার স্বপ্ন সমাজতান্ত্রিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে। প্রায় প্রতিটি নাটকেই মন্মথ প্রগতিশীল চিন্তা ও আর্দশের ছাপ রেখেছেন। তিনি বিশ্বাস করেছেন সব প্রয়োজনের চেয়ে বড় প্রয়োজন দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ। সেটি সঞ্চার করাই সাহিত্য সৃজনের পরমতম কর্তব্য। এ কর্তব্য পালন না করলে সাহিত্যচর্চা হবে নিছক কলাবিলাস। এই সচেতনতা মন্মথর মননে আজীবন জাগরূক ছিল। তাই স্বাধীন ভারতের নানান উন্নয়নশীল কাজের সঙ্গে কর্মসূত্রে জড়িত থাকার জন্য তাঁকে রচনা করতে হয়েছে প্রচারধর্মী নানান ধরণের নাটকও। গণজীবনের পটভূমিতে গণ জাগরণের জন্য লিখিত এই শ্রেণীর নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীদের দ্বারা। একটি সুস্পষ্ট আদর্শবাদ ও প্রচারধর্মিতার লক্ষ্যে নাটকগুলি রচিত হওয়ায় শিল্পগুণ ব্যাহত হয়েছে। লোকরঞ্জনের লক্ষ্যে লেখা হয়েছে মহাভারতী (৫২), গুপ্তধন (৫৪), জীবনমরণ (৫৪), লাঙল (৫৫), জটাগঙ্গার বাঁধ (৫৫), মহাপ্রেম (৫৯), এক আকাশ দুই আঙ্গিনা (৬১), কৃষাণ (৬১), মহাউদ্বোধন (৬৩), গঙ্গাবতরণ

(৫২) যাত্রা হল শুরু (৫২) মানভঞ্জন, সাতভাই চম্পা ও যক্ষ। শেষের পাঁচটি নৃত্যনাট্য। এরই মধ্যে বিষয় এবং পরিবেশনের গুণে উল্লেখযোগ্যতা পেয়েছে মহাভারতী, লাঙল, মহাপ্রেম। 'মহাভারতী' নাটকে ১৮৫৭-১৯৪৬ অর্থাৎ স্বাধীনতালাভের পূর্বসময় পর্যন্ত সময়কালটিকে চিত্রিত করা হয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা কাল থেকে পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশ্বস্ত চিত্রায়ন এ নাটকে পাই। নাট্যবিষয়ের মূলবক্তব্যের কেন্দ্রে রয়েছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ— যাদের আত্মত্যাগে ঘটেছে দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি। 'মহাভারত' এমনই একজন মানুষ যে বহন করে চলেছে প্রতিবাদী চরিত্রের উত্তরাধিকার। 'লাঙল' নাটকটিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে একেবারে সমসময়ের বাস্তব সমস্যার কথা। এ নাটকের মূল বক্তব্য 'লাঙল যার জমি তার'। এখানে নাট্যকার কৃষক শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন এবং তাঁর নিজস্ব প্রত্যয়কে অকুণ্ঠিতভাবে ব্যক্ত করেছেন—এ শোষণের অবসান হবে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনে। 'মহাপ্রেম' নাটকটির উৎসর্গপত্রে নাট্যকার নিজেই জানিয়েছেন— "বীরের রক্তস্রোত ও মাতার অশ্রুধারা—অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ জনগণের এই সিদ্ধি অক্ষয় অক্ষুণ্ণ থাক এই ব্যগ্র কামনাতেই এই নাটকের জন্ম"। এর সার্থক রূপায়ন ঘটে যখন ১৯৫৪ সালে মন্মথ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার প্রচার প্রযোজক হিসেবে নিযুক্ত হন। লোকরঞ্জনের লক্ষ্যে সঙ্গীত আর নাটকের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন উৎসাহ সঞ্চারের জন্য লেখেন দশটি নাটক ও পাঁচটি নৃত্যগীত বহুল নাটিকা। এই নাটকগুলিতে নানা ভূমিকায় প্রাধান্য পায় সাধারণ মানুষ, দেশের অর্থনীতি, পুঁজিবাদী শোষণ, কায়েমী স্বার্থ ও ধনবন্টনের বৈষম্য। ১৯৬৩ পর্যন্ত লোকরঞ্জনের শাখার সঙ্গে যুক্ত থাকেন তিনি।

১৯৫৮—১৯৬১ পর্যন্ত তিনি কলকাতার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রচার প্রযোজক হিসেবে কাজ করেন। এ সময় তিনি প্রযোজনা করেন প্রায় পঁয়ত্রিশটি নিজের লেখা প্রচার নাটক। যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'জীবনটাই নাটক', 'চাষীর প্রেম', 'ফকিরের পাথর', 'টোটোপাড়ায় আসুন', 'দুর্গেশ নন্দিনীর জন্ম', 'শ্রেষ্ঠ শাশুড়ি প্রতিযোগিতা'। ১৯৬২ সালে মন্মথ অপেশাদার নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। তৎকালীন পঃ বঃ সরকার 'ড্রামাটিক পারফরম্যান্স বিল' আইনে পরিণত করার জন্য গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। উদ্দেশ্য ছিল সব ধরণের অভিনয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা। এই ঘটনায় সংস্কৃতিজগতের সকলে দলমত নির্বিশেষে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। গঠিত হয় প্রস্তুতি পরিষদ। মন্মথ রায় হন এই পরিষদের সভাপতি। ১৩. ৪. ৬৩-তে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে এই পরিষদের প্রথম সভা থেকে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয় এই বিলের বিরুদ্ধে। বিলটি পঃ বঃ সরকার প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন।

১৯৬৩ সালে মন্মথর মা সরোজিনী দেবী প্রয়াত হন। মন্মথ তখন প্রগতিশীল নাট্যআন্দোলনের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠিত নাম। নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মধারার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। তাই ব্যক্তিগত শোক পরিহার করে বৃহত্তর স্বার্থে সৃজনশীল

কর্মপ্রক্রিয়াকে অব্যাহত রেখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতামালায় "স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা" বিষয়ক বক্তৃতা দিলেন। সরকারি ঔদাসীন্যে রবীন্দ্র সদনের নির্মানে বিলম্বের জন্য সর্বদলীয় শিল্পীদের নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করে তুললেন সভাপতি হিসেবে। এই সময়েতেই মন্মথ 'বিশ্বরূপা স্বর্ণপদক' লাভ করেছেন। ১৯৬৭ তে "আন্তর্জাতিক সোভিয়েট ল্যাণ্ড নেহেরু সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার" পেয়েছেন। ১৯৬৮ সালে গোর্কি মহানগরীতে অনুষ্ঠিত ম্যাক্সিম গোর্কির আন্তর্জাতিক জন্মশতবর্ষ উৎসবে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি হয়ে সেখানে গিয়েছেন। ১৯৬৯ এ কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক আকাদেমির শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনা পুরস্কার, ১৯৭১-এ পঃ বঃ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমির শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনা পুরস্কার, ১৯৭২ এ নাট্যরচনায় কৃতিত্বের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুধাংশুবালা পুরস্কার, ১৯৭৯-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ নাট্যশালা শতবার্ষিকী স্মারক স্টার থিয়েটার স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছেন। ঐ সালেই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় মন্মথকে সাম্মানিক ডি লিট, ১৯৮১ তে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডি লিট-সম্মান দিয়েছেন। ১৯৮১ সালে বিশ্বশান্তি সংসদ তাঁকে শান্তি আন্দোলনের জন্য পুরষ্কৃত করেছেন। এই সালেই পঃ বঃ সরকার তাঁকে জাতীয় সম্বর্ধনা দিয়েছেন। ১৯৮২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁকে সম্মানিত করেছে। ১৯৮৩ তে ভারতের গণতান্ত্রিক যুবফেডারেশন এবং কলকাতা কর্পোরেশন মন্মথকে সাংস্কৃতিক সম্বর্ধনা জানান। ১৯৮৪ তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে শ্রেষ্ঠ নাট্য সম্মান 'দীনবন্ধু পুরস্কার' প্রদান করেন। ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার্স ১৯৮৬ সালে মন্মথকে সম্বর্ধিত করেন। ১৯৮৭ তে দিশারী দেয় ইন্দিরা গান্ধী স্মৃতি পুরস্কার। এই সালেই প্রতিষ্ঠিত হয় পঃ বঃ নাট্য আকাদেমী। মন্মথ রায় হন তার প্রথম সভাপতি।

নাট্যকার মন্মথ রায় শিল্পী ও স্রষ্টার সামাজিক রাজনৈতিক দায়বদ্ধতায় বিশ্বাসী থেকেছেন আজীবন। দুই এর দশক থেকে আটের দশক—এই দীর্ঘ সময় ধরে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন দেশের অসংখ্য ওঠানামা—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বলয়ে বিচিত্র টানাপোড়েন—পটপরিবর্তন। সময়ের সঙ্গে সব সময় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। ফলে তাঁর সমাজ চিন্তা, রাজনৈতিক দর্শন বিবর্তিত হয়েছে—দেশাত্মবোধক জাতীয়তাবাদী গান্ধী নীতি পরিবর্তিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসে। তাঁর নাটক রচনার সময়কালের মধ্যে স্পষ্ট দুটি পর্যায় বিভাজন করা যায় এই পরিবর্তনের সূত্ররেখাটি ধরে। প্রথম পর্যায়ের নাটক নির্মাণের (১৯২৭—১৯৩৮) মধ্যে অভিব্যক্ত দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদী ভাবনা, স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এইপর্বের রচনাগুলির প্রায় সব কটিই সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রয়োজনের তাগিদে লেখা। যে কারণে তাঁকে 'দর্জিনাট্যকার' অভিধাও পেতে হয়েছিল। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না, কালের দাবি মেনে দেশের ব্যাপকতম অংশের মানুষের চাহিদাকে মন্মথ মর্যাদা দিয়েছেন তাঁর নাটকে— জাতীয় সংকটের মোকাবিলার জন্য, জাতির

দেশাত্মবোধের উন্মাদনাকে নাটক ও নাট্যশালায় প্রতিফলিত করার লক্ষ্যে। কাজেই প্রথম পর্যায়ের রচনা প্রয়োজনের তাগিদে হলেও নাট্যকার 'কাপড় অনুযায়ীই পোশাকটি তৈরি করেছেন'--ইংরাজির প্রবাদের বাংলা করে এমনটিই বলতে হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯৫২--১৯৭২) মন্মথ অনেক বেশি জীবনের কাছাকাছি। এই পর্বে তাঁর সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি খানিকটা প্রতিবাদী ভূমিকায় নাটকগুলিতে প্রতিফলিত। কারণ ইতিমধ্যেই ঘটে যাওয়া যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশবিভাগ জনিত অসহনীয় বিপর্যয়, উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়--স্বাধীনদেশে দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণ, শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার, সাম্যবাদী নীতির প্রভাব বৃদ্ধি জ্বলন্ত বিষয় হিসেবে দেশের সৃজনশীল লেখকদের সামনে এসেছে। একজন দায়বদ্ধ লেখক হিসেবে মন্মথ এক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করছেন।

পূর্ণাঙ্গের মত একাঙ্ক রচনার ক্ষেত্রেও দুটি পর্যায় বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায়ের রচনায় (১৯২৩--১৯৩৩) রয়েছে রোমান্টিক ভাবনা, পৌরাণিক পরিমণ্ডল, সুতীব্র আবেগ। দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯৫৩-১৯৮৬) র রচনাগুলি অনেক বেশি জীবননিষ্ঠ। সমাজ ও সময় সচেতনতা নাটকগুলিতে যোগ করেছে গভীরতর মাত্রা। কখনো তা মমতায় অন্তরঙ্গ, কখনো বা ব্যঙ্গে ক্ষুরধার। মোট দুশো চারটি একাঙ্ক রচনা করেছেন তিনি-- বিচিত্র স্বাদের। নানান উৎস থেকে সংগ্রহ করেছেন নাটকের উপাদান। পরিণত মনন ও চৈতন্যের জাগরণ মুহূর্ত থেকেই তিনি সমস্ত রকম প্রগতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন। বয়স ও অভিজ্ঞতা তাঁর প্রতিবাদী মননকে করেছে আরো শাণিত। তিনি বিশ্বাস করেছেন-- নাটক শুধু চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম নয়--সংগ্রামের হাতিয়ার। এই হাতিয়ারটিকেই তিনি বিচিত্রমুখী নাট্যনির্মাণের কাজে লাগিয়েছেন-মানুষের ব্যথা, বেদনা, গ্লানি, নানাবিধ নৈরাশ্য, পিছুটান অবক্ষয়কে পেছনে ফেলে এক মঙ্গলময় অনাগত উজ্জ্বল দিনের কামনার আশ্বাসে। নিজের রাজনৈতিক চেতনাকে রেখেছেন সজাগ। এরজন্য প্রতিদিনের দৈনিক সংবাদপত্র খুঁটিয়ে পড়ার অভ্যাসটি বজায় রেখেছেন যতদিন জীবিত ছিলেন। নিজেকে 'নাট্যকার' ভেবে গর্বিত হয়েছেন। জীবনে কখনো কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। পারিবারিক জীবনেও তিনি ছিলেন স্নেহের আধার। আবার স্পষ্টবক্তা, দৃঢ়চেতা, শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র। নাট্যকার হয়ে ওঠার প্রেরণা লাভ করেছিলেন এক নারীর কাছ থেকে-- তিনি তাঁর মা সরোজিনী দেবী। সেই প্রেরণাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল তাঁর মনে আলাদা করে নারীর প্রতি সম্মান। তাঁর সব কটি নাটকেই নারী সম্পর্কে তাঁর এই শ্রদ্ধাবোধ গোপন থাকেনি। সমাজে নারীর অবস্থান--মনস্তত্ত্বের পটভূমিতে নারী প্রকৃতির বিশ্লেষণ, নারী পুরুষের সম্পর্ক, প্রেম সম্পর্কে আধুনিক ভাবনা, নারীর মর্যাদারক্ষার সংগ্রাম খুব সহজেই স্থান করে নিয়েছে তাঁর নাটকের মধ্যে।

মন্মথ রায় কোনো উপন্যাসের নাট্যরূপ দেননি, একটিও বিদেশী নাটকের অনুবাদ করেননি, অথচ বাংলা নাট্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে অজস্র মৌলিক, গভীর উপলব্ধিজাত নাটক, প্রতিবাদী নাটক, জীবনমনস্ক মনোজ্ঞ পাঠ নাটক তিনি রচনা

করেছেন। দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ এবং তার ফলশ্রুতি— প্রতিক্রিয়া তিনি জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। প্রাচীন ও আধুনিক মননের সমন্বয় সাধনে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছেন। কেবলমাত্র দেশের স্বাধীনতার জন্যই নয়, যাবতীয় অত্যাচার পীড়ন, শোষণ ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে মন্মথ আজীবন সংগ্রাম করেছেন। ১৯২৭-১৯৮৬ পর্যন্ত মন্মথ তাঁর সৃষ্টিশীলতার মধ্যে দিয়ে ধারাবাহিকভাবে সে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। স্বাধীনতালাভের পরবর্তীকালেও তিনি আদর্শভ্রষ্ট হন নি— পরিবর্তিত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাকে সমন্বিত করে নিয়েছেন। যুগধর্মকে অস্বীকার করে নয়— অঙ্গীকার করে। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে তাঁর সর্ববিধ চিন্তা ও সৃষ্টির মূল কেন্দ্রে রেখেছেন মানুষকে—সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন মনুষ্যত্বকে, মানবতাকে। মন্মথ সব সময়, দেশের যে কোনো পরিস্থিতিতেই নিজের বিবেককে জাগ্রত রেখেছেন অতন্দ্র প্রহরীর মত এবং খুব সচেতনভাবেই তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে দেশের মানুষকে ভাবতে সাহায্যে করেছেন—কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি এবং কোথায় চলেছি। তাঁর এই পদক্ষেপের নেপথ্যে কাজ করেছে এক বিবেকবান মননের প্রেরণা—যার উৎস তাঁর নিজের অন্তর। বিবেকী শিল্পী ও স্রষ্টার কণ্ঠরোধ যাতে না হয় এ চেষ্টা মন্মথর আজীবন কালের—যা তিনি আহরণ করেছেন বিভিন্ন দেশকালের প্রগতির ইতিহাস থেকে। অথচ আট-এর দশকের পরবর্তী সময়ে তাঁর সৃজন আমাদের রঙ্গমঞ্চে পেশাদার বা অপেশাদার কোনো ক্ষেত্রেই সগৌরবে প্রযোজিত হবার সম্মান আদায় করে নিতে পারেনি। মনে হয় মন্মথর ক্ষেত্রে বোধকরি এটাই সত্য, তাঁর রচনার গভীরতর তাৎপর্য যে সময়কালকে ঘিরে অর্থবহ হয়েছে—যে সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্য নিয়ে তার নির্মাণ হয়েছে তাতে তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যপূরণ হয়ত হয়েছে কিন্তু সে সৃজন আবহমান কাল ধরে চিরন্তন শাশ্বতবানীরূপের বাহক হবার আধার হয়ে উঠতে পারেনি।

বিজন ভট্টাচার্য মন্মথকে 'নাট্য শিল্পের ক্ষেত্রে দুর্লভ সম্পদ' অভিধায় ভূষিত করেছেন। উৎপল দত্ত বাংলা নাট্যশালাকে হাত ধরে ধ্রুপদ থেকে আধুনিকে পৌঁছে দেবার কৃতিত্ব তাঁকে দিয়েছেন। সুকুমার সেন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে বলেছেন--সে যেন সোনার প্রতিমাকে সোনালি রং দেওয়ার মতই নিরর্থক। ১৯৮৪ সালে শ্রেষ্ঠ নাট্য সম্মান দীনবন্ধু পুরস্কার প্রদানের সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছেন--"ওঁর আর এই পুরস্কারের প্রয়োজন ছিল না। মানুষই এঁনাকে বহু আগে সম্মানিত করেছে। ওঁকে সম্মান জানিয়ে আমরা আজ সম্মানিত হলাম"। এই সম্মানিত জায়গায় পৌঁছেছেন মন্মথ দেশ ও জাতিকে ভালবাসার গুণে। এই ভালবাসা, সম্মান শ্রদ্ধা নিয়েই তাঁর প্রয়াণ ঘটেছে ২৬ আগষ্ট ১৯৮৮ দুপুর ২টো ২৫ মিনিটে।

নাট্যকার মন্মথ রায় জীবনপঞ্জী

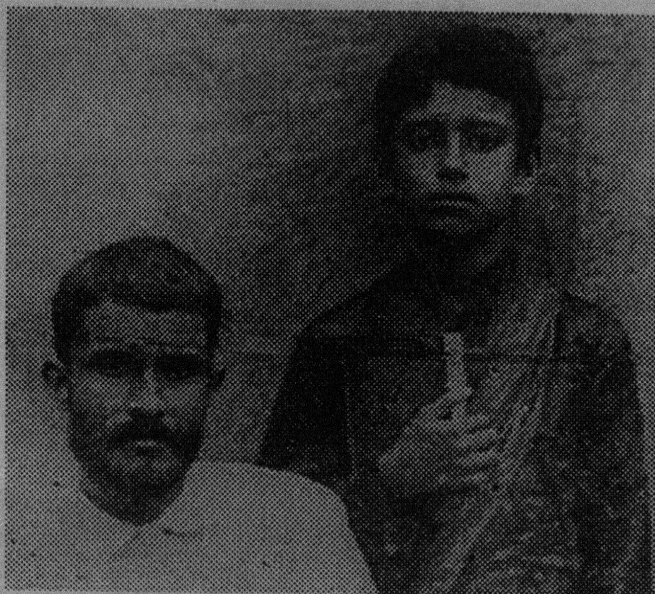
জন্ম	১৬ জুন ১৮৯৯, টাঙ্গাইল (মৈমনসিংহ) এর গালাগ্রামে।
মাতা, পিতা	সরোজিনী ও দেবেন্দ্রগতি রায়।
বিদ্যালয়	বালুরঘাট হাইস্কুল। ম্যাট্রিক ১৯১৭, প্রথম বিভাগ।
মহাবিদ্যালয়	রাজশাহী কলেজ. আই এ ১৯১৯, প্রথম বিভাগ। স্কটিশচার্চ কলেজ বি. এ ১৯২২।
বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম. এ (অর্থনীতি) ১৯২৪। আইন ১৯২৫।
নাটকের প্রতি অনুরাগ	মায়ের কাছ থেকে পাওয়া।
প্রথম মঞ্চে অবতরণ	১৯০৫, ছ বছর বয়সে বিসর্জনের ধ্রুব চরিত্রে। গালাতে।
নাটক লেখায় হাতেখড়ি	১৯০৮, নয় বছর বয়সে, 'পদ্মিনী পালা' দেখে রানী দুর্গাবতী।
প্রথম অভিনয়	১৯১৩ ডাকঘরের অমল চরিত্রে। বালুরঘাট হাইস্কুলে ছাত্রাবস্থায়।
প্রথম পঞ্চাঙ্ক নাটক	১৯২০, বঙ্গে মুসলমান।
নাটক লেখার প্রেরণা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধ্যক্ষ ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের কাছ থেকে।
কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন	১৯২৩, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের উদ্যোগে।
বিবাহ	১৯২৩। (১৩৩০, ৩রা ফাল্গুন)
সহধর্মিনী	তপোবালা (নাট্যকারের দেওয়া নাম চিত্রলেখা)।
সন্তান	দুই পুত্র, দুই কন্যা।
প্রথম ও শেষ ভালবাসা	নাটক।
আলাপচারিতার বৈশিষ্ট্য	বিশেষ কথা দুবার করে বলা।
নিজেকে ভাবতে ভালবাসেন	নাট্যকার।
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	মানবতাবাদী, স্বদেশপ্রেমিক।
জীবিকা	ওকালতি, জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজারি, পৌরপিতা, প্রচার প্রযোজক (পঃ বঃ), প্রযোজক, আকাশবাণী কলকাতা, প্রচার প্রযোজক, লোকরঞ্জন শাখা, তথ্য চিত্র পরিচালক (পঃ বঃ সরকার)।
প্রথম একাঙ্ক রচনা	'মুক্তির ডাক'—১৯২৩।
মোট একাঙ্ক	দুশো চারটি।
সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত প্রথম পূর্ণাঙ্গ	চাঁদসদাগর, থিয়েটার ১৯২৭-১৪ সেপ্টেম্বর।

মোট পূর্ণাঙ্গ	পঁচিশটি। (অভিনীত ২৪টি / অনভিনীত ১টি)
লোকরঞ্জন শাখার জন্য লেখা	দশটি।
ক্যালকাটা আর্টর্স প্লেয়ার্সের জন্য লেখা নাটক	চারটি।
চিত্রনাট্য ও চিত্রকাহিনী	চোদ্দটি।
চিত্র পরিচালনা	পূর্ণদৈর্ঘ্য একটি, তথ্যচিত্র পঞ্চাশটি।
গ্রামাফোন-ডিস্ক নাটক	ষোলোটি।
প্রবন্ধ ও প্রবন্ধগ্রন্থ	একত্রিশটি, একটি।
পত্রিকা সম্পাদনা	তিনটি (ভাণ্ডার, বেঙ্গল কো অপারেটিভ জার্নাল, বসুন্ধরা)।
সম্মান স্বীকৃতি	অগণিত।
মৃত্যু	২৬ আগষ্ট ১৯৮৮ দুপুর ২-২৫ মি:।

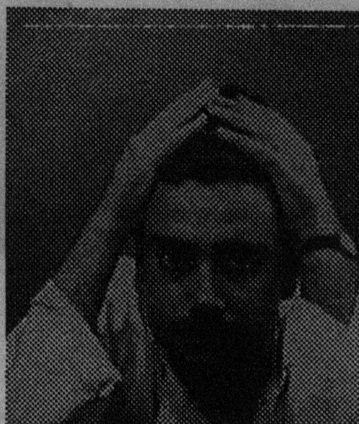
মন্মথ রায় : সম্মান স্বীকৃতি

বিশ্বরূপা স্বর্ণপদক—১৯৬৪
আন্তর্জাতিক সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহেরু সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার—১৯৬৭
সাহিত্যবাসর উল্টোরথ শ্রেষ্ঠ নাট্য পুরস্কার—১৯৬৭
ম্যক্সিম গোর্কির আন্তর্জাতিক জন্মশতবর্ষে গোর্কি মহানগরীতে প্রতিনিধি হয়ে যোগদান—১৯৬৮
কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক আকাদেমির শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনা পুরস্কার—১৯৬৯
পঃ বঃ রাজ্য সঙ্গীত নাটক আকাদেমির শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনা পুরস্কার—১৯৭১
নাট্যরচনায় কৃতিত্বের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুধাংশুবালা পুরস্কার—১৯৭২
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এল. রায় রিডার—১৯৭০-৭২
বালুরঘাট পৌরসভার সৌজন্যে শহরের একটি প্রধান রাস্তার নাম 'মন্মথ রায় রোড'—১৯৭৩
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবার্ষিকী স্মারক স্টার থিয়েটার স্বর্ণপদক—১৯৭৯
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি. লিট—১৯৭৯
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি. লিট—১৯৮১
শান্তি আন্দোলনের জন্য বিশ্বশান্তি সংসদ কর্তৃক পুরস্কৃত—১৯৮১
পঃ বঃ সরকারের জাতীয় সম্বর্ধনা—১৯৮১
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর সম্বর্ধনা—১৯৮২
কলকাতা কর্পোরেশনের সাংস্কৃতিক সম্বর্ধনা—১৯৮৩
ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এর পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা—১৯৮৩
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রেষ্ঠ নাট্য সম্মান 'দীনবন্ধু পুরস্কার'—১৯৮৪
ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার্সের সম্বর্ধনা—১৯৮৬
দিশারী ইন্দিরা গান্ধী স্মৃতি পুরস্কার—১৯৮৭
বালুরঘাট পৌরসভার সৌজন্যে মন্মথ রায় নাট্য ও সাংস্কৃতিক চর্চাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা—১৯৯৯

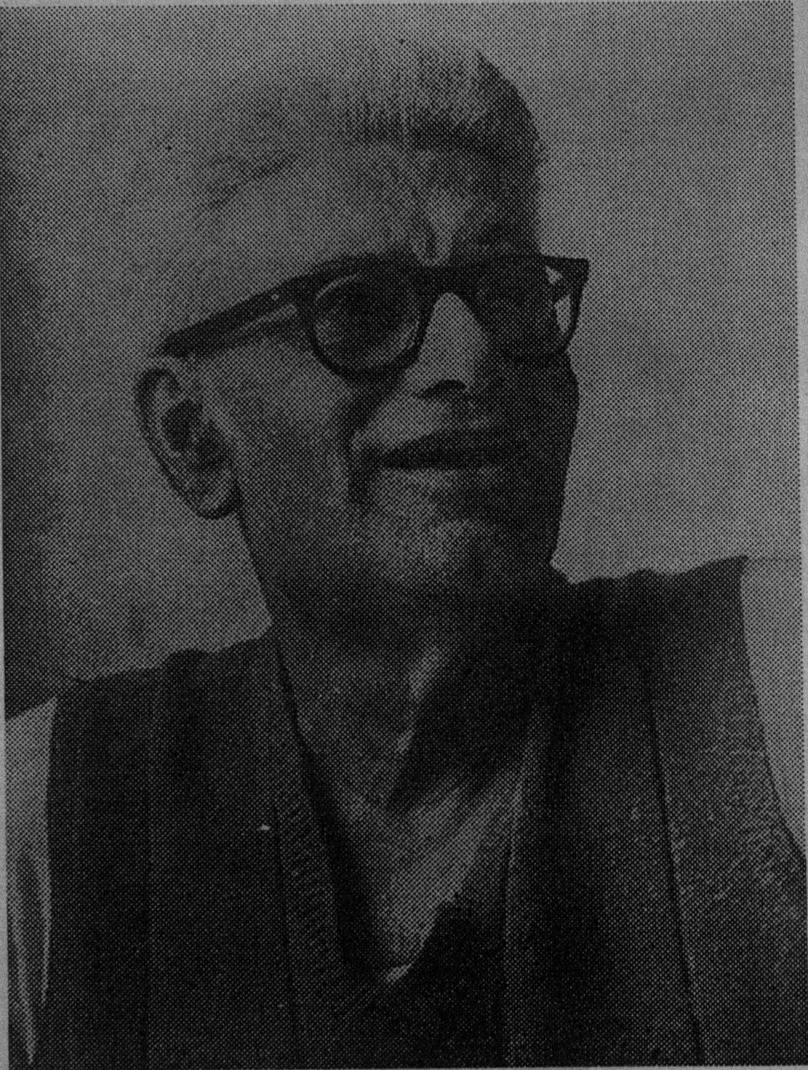
বিভিন্ন বয়সের ছবি



শিক্ষক মশাই ও কিশোর মন্মথ



১৯৩০এ কারাগার রচনার সময় মন্মথ



৭৮ বছর বয়সে

— ছুটী উপলক্ষে —

বুধবার ও শুক্রবার (১২ই ও ১৪ই মে) দুইবার অভিনয়

ক্যালকাটা থিয়েটার্স

রাজা রাজকিষণ ষ্ট্রীট **নাট্য নিকেতনে** (ফোন বড়বাজার ...)

মঙ্গলবার ১১ই মে—সন্ধ্যা ৭৷৷ টায়

বুধবার ১২ই মে—বেলা ৫৷৷ টায়

বৃহস্পতিবার ১৩ই মে—সন্ধ্যা ৭৷৷ টায়

শুক্রবার ১৪ই মে—বেলা ৫৷ টায়

শনিবার ১৫ই মে—বেলা ৫৷ ও রাত্রি ৯৷ টায়

রবিবার ১৬ই মে—বেলা ৫৷ ও রাত্রি ৯৷ টায়

নব-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার—শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় এম-এ প্রণীত

হিন্দু-নারীর চিরন্তন আদর্শ, নবরূপে নববেশে

অনবদ্য নাট্যরূপে—মনোরম দৃশ্যপটে—নিরুপম নৃত্যগীতে

অসামান্য সাফল্যমণ্ডিত পৌরাণিক নাটক



(মহাসমারোহে ১৬ হইতে ২৩ অভিনয়)

পরিচালক—নরেশ মিত্র

"সতী" নাটকে কিন্নর ও কিন্নররমণীদের মনোরম নৃত্য বিপুল বিস্ময় জাগাইয়া তোলে আবার বৈপ্লবিক আবহে যখন তাণ্ডব শুরু হয়, দর্শকদের ধমনীতে রক্ত তখন রুদ্র তালে নাচিয়া ওঠে



চাঁদ সদাগর নাটকে অহীন্দ্র চৌধুরী ও রানীসুন্দরী

সৃজন : পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক

সাধারণ নাট্যশালার ঐতিহ্যের আদর্শকে সামনে রেখে মন্মথ রায় পূর্ণাঙ্গ নাট্য রচনা শুরু করেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তি কামনায় আন্দোলিত সেযুগটি ছিল উত্তাল উন্মাদনার যুগ। নাট্যকারের পারিবারিক পরিবেশেও ছিল স্বদেশচেতনার অনুরাগ। খুব স্বাভাবিকভাবেই দেশপ্রীতি--মুক্তিকামী মনন তাঁকে যে নাটক রচনায় অনুপ্রাণিত করবে--নির্মাণের উৎসমুখ খুলে দেবে এটি বুঝে নিতে অসুবিধে হয়নি। পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে সাধারণ রঙ্গালয়গুলিরও ঐতিহ্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তা হল নাট্যপ্রযোজনা ও নির্মাণের মধ্যে দিয়ে সমাজসংস্কার ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। শুধু স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামই নয়--অত্যাচার, পীড়ন, শোষণ ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম। ১৯২৭ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত মন্মথ রায় তাঁর সৃষ্টিশীলতার মধ্যে দিয়ে ধারাবাহিকভাবে সে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়েও তিনি আদর্শভ্রষ্ট হননি--পরিবর্তিত সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাকে সমন্বিত করে নিয়েছেন। যুগধর্মকে অস্বীকার নয়--অঙ্গীকার করে নিয়েছেন তাঁর নাটকে।

সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকার হিসেবে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাঁর রচিত পূর্ণাঙ্গ গুলি। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক মিলিয়ে মোট পঁচিশটি পূর্ণাঙ্গ লিখেছেন তিনি। প্রায় সবগুলি নাটকই সে যুগে মঞ্চসাফল্য ও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। লক্ষণীয় বিষয়, প্রায় সব নাটকগুলিতেই তিনি ভক্তিবাদ নয় যুক্তিবাদ, আধুনিক জীবনবোধ, স্বাধীনতা কামনা, স্বদেশপ্রীতি, স্বাজাত্যবোধ, নরনারীর সমানাধিকারের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং সফলও হয়েছেন। ফলে মন্মথর প্রথম পর্বের পূর্ণাঙ্গ নাটক আলোচনার ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে পড়বে সাধারণ রঙ্গালয়গুলির কথা--তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণার কথা। রঙ্গালয়গুলিকে জড়িয়ে রেখেই তাই এই আলোচনার অবতারণা।

বিষয়বস্তুর উৎসকে ভিত্তি করে নাটকে শ্রেণীবিভাগ করার রীতিটি বহু প্রাচীন। সেই ভিত্তিতেই মন্মথ রায়ের নাটকগুলিকে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক এই তিনটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করবো। তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার পর্যায়কে স্পষ্টত দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বের সময়কাল ১৯২৭-১৯৩৮। এই পর্বে রচিত নাটকগুলি সাধারণ রঙ্গালয়ের তাগিদেই রচিত। শ্রেণী বিচারে এগুলি মূলত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক। দ্বিতীয় পর্বের সময়কাল ১৯৫২-১৯৭২। এই সময়ে লিখিত সমস্ত নাটকগুলিই সামাজিক। দুই পর্বের মাঝখানে চোদ্দ বছরের দীর্ঘ ব্যবধান। এই সময় তিনি যে নাটক রচনা থেকে একেবারে বিরত ছিলেন একথা বলা চলে না, কারণ একাঙ্ক নাটক সৃজন এই সময়েও থেমে থাকেনি। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনা থেকে তিনি বিরত ছিলেন। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে তাকে তৎকালীন সরকারের হয়ে তথ্যচিত্র, প্রচার নাটক, বেতার নাটক, চিত্রকাহিনী, চিত্রনাট্য রচনার কাজে নিযুক্ত হতে হয়। নানা ধরনের

এই শিল্প সৃজনের মধ্যে থেকে তাঁর নাটকের প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসাকেই পরিস্ফুট হতে দেখেছি।

পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার ধারায় উপরোক্ত তিন শ্রেণী ছাড়াও আরো দুটি ধারাকে অন্তর্ভুক্ত করা হল। C.A.P. (CALCUTTA ARTS PLAYERS) ও লোকরঞ্জন শাখা অভিনীত নাটক। কারণ তাঁর নাট্যকার সত্তার সঠিক মূল্যায়নের জন্য এই ধারার নাটকগুলির আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। C.A.P-র জন্য লিখিত নাটকগুলির রচনাকাল ১৯৩৭-১৯৩৮। অর্থাৎ নাট্যরচনার প্রথম পর্বের শেষের দিকে। সাধারণ রঙ্গালয়ের স্তিমিত গৌরব, দর্শক রুচির পরিবর্তন, ঠাকুরবাড়ির আনুকূল্যে রঙ্গমঞ্চে অভিজাত শিক্ষিতা মহিলাদের অকুণ্ঠিত পদার্পণ, মঞ্চে নৃত্যকলার মর্যাদাবৃদ্ধি বিষয়ে নাট্যকারের তীক্ষ্ণ সচেতনতা C.A.P-র জন্য লেখা নাটকগুলির নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

'লোকরঞ্জন শাখা'র জন্য লেখা তাঁর নাটকগুলির রচনাকাল ১৯৫২-১৯৬৩। অর্থাৎ তাঁর নাট্যরচনার দ্বিতীয় পর্বের মধ্যেই। তিনি এই সময় লোকরঞ্জন শাখার আধিকারিকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সঙ্গীতে আর নাটকের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে উৎসাহ দেবার আর্দশেই নাটকগুলি রচিত ও অভিনীত হয়েছিল। প্রচার ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ধর্মিতার কারণে সেগুলি উল্লেখযোগ্যতার মান স্পর্শ করতে না পারলেও মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসার উপলব্ধিতে, দেশপ্রেমের আন্তরিক ঋজুতায়—সর্বোপরি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ একজন নাট্যকারের রচনা হিসেবে—এ নাটকগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করার নয়।

মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটকে পুরাণ শুধুমাত্র তার অর্থ নিয়েই নয়, যা কিছু প্রাচীন, অনৈতিহাসিক যেমন লোকগাথা, কিংবদন্তী, রূপকথা প্রভৃতিকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে। যে ধর্মোদ্দীপনা ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখা গিয়েছিল ধীরে ধীরে বিংশ শতকের গোড়া থেকেই তা স্তিমিত হয়ে আসছিল। এ প্রসঙ্গে বাংলা নাটকের ইতিহাসের লেখক ড. অজিত কুমার ঘোষের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে : 'বিংশ শতাব্দীর ভাব বিপ্লবের স্পর্শ আমাদের দেশও লাভ করিল, সর্বশক্তিময় বিজ্ঞানের অদ্ভুত লীলার পরিচয় আমরাও পাইলাম।" রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে দুই-একজন লেখক পৌরাণিক নাটক লিখেছেন তাঁদের নাটকের সঙ্গে পূর্বতন পৌরাণিক নাটকের কোন যোগ লক্ষ্য করা গেল না। মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটকের আলোচনায় এই কথাগুলি খুব জরুরী। গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকের পর নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জটিলতায় মানুষের চিন্তা ও কল্পনাশক্তি আপ্লুত। ধর্ম সম্বন্ধে তাদের কৌতূহলও কমে এসেছে। দর্শকের মনও ক্রমে অধ্যাত্ম বিমুখ ইহসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। তখন যাঁরা পৌরাণিক নাটক লিখেছেন তাঁদের মধ্যেই দু'টি ধারার অনুসরণ দেখা গিয়েছে। একদল নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে অনুসরণ করে (ক্ষীরোদপ্রসাদ, অপরেশচন্দ্র, মহেন্দ্র গুপ্ত) লিখেছেন ভক্তিরসাপ্লুত পৌরাণিক নাটক ; অন্যরা দ্বিজেন্দ্রলালকে অনুসরণ করে

লিখেছেন, মানব-রসাশ্রিত পৌরাণিক নাটক। এই ধারার মধ্যে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর পাশাপাশি মন্মথ রায়ের নামটিও অবশ্যই উচ্চারিত হবে। প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতকের পৌরাণিক নাটকের গতানুগতিকতাকে মন্মথ রায়ই ভাঙবার চেষ্টা করেন প্রথম। তাই তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলিতে পুরাণের বিশেষ ঘটনা বা কাহিনী থাকলেও ছিল না পৌরাণিক ভাব, আদর্শ ও নীতি। চির ধর্মাদর্শ বা ভক্তিভাবের পরিবর্তে এসেছে গতানুগতিক পৌরাণিক সংস্কার ও নিষ্ঠার প্রতি একটা বিদ্রোহের ইঙ্গিত। চাঁদ সদাগর তাঁর লিখিত প্রথম পৌরাণিক নাটক। এই নাটক রচনার অনুপ্রেরণা প্রসঙ্গে নাট্যকার নিজেই লিখেছেন : "এতকাল আমাদের পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরসের আধিক্য এবং প্রাবল্য দেখা গেছে। সুরটা বদলাতে ইচ্ছা হল।" ('চাঁদ সদাগর' সৃজন প্রসঙ্গে নাট্যকার) ফলে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে পরিবেশিত হয়েছে বাস্তব জগতের রস। এই প্রথাভাঙার ফলশ্রুতিতেই চাঁদ সদাগরে পরিবেশিত হয়েছে বাস্তবতা, মানবীয় দ্বন্দ্ব ও সুখ দুঃখের সংঘাত।

গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাটকে যে ভক্তিভাব ও আধ্যাত্মিকতার একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল তাকে আঘাত করেছিল দ্বিজেন্দ্রলালের যুক্তিনিষ্ঠ বুদ্ধিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। মন্মথ রায় মূলত পৌরাণিক নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালকেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু নাট্যকার হিসেবে তিনি ছিলেন বিপরীত মেরুর। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাট্য রচনার প্রয়োজনে পুরাণকে বিকৃত করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছেন। মন্মথ রায় সেদিক থেকে তথ্যধর্মকে অবিকৃত রেখে বক্তব্যকে অভিনব করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বাস্তব সচেতনতা নরনারীর প্রেমের যৌন বিশ্লেষণে, মন্মথ রায় সেখানে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতে অন্তর্দ্বন্দ্বের আর্বত রচনা করে আধুনিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যাগুলিকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি পৌরাণিক উপাদানকে অবলম্বন করে তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাকে বিকশিত করেছেন—এটি তাঁর একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি। পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করেও অতি আধুনিক যুগের মনোভাব যে সার্থকভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে, মন্মথ রায়ের নাটকগুলিই তার প্রমাণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্য ও সাহিত্যে স্বাধীনতা কামনা, স্বদেশপ্রীতি, স্বাজাত্যবোধ, সমানাধিকারের দাবিটি, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ দেশ ও জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছিল, মন্মথ রায় বাংলা নাটক রচনার ক্ষেত্রে তার সংযোগ ঘটালেন। পৌরাণিক উপাদানের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ সৃষ্টির তাগিদ চলছিলই। তার মূল আবেদন ছিল সমাজের নাগপাশ থেকে মুক্তি। ভক্তি ও ধর্মের বদলে মানবধর্মের জয় ঘোষণাই ছিল নাটকের মূল প্রতিপাদ্য। মন্মথ রায় তাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি পৌরাণিক নাটকে পুরাণের কাহিনীকে সঠিকভাবে অনুসরণ করে নাটকে প্রাধান্য দিলেন সমকালীন যুগচেতনাকে। কাহিনীর খাতিরে অলৌকিকতা ও ভক্তির আধিক্য দেখানো হলেও যে বিষয়টি সেযুগে সকলের চোখে পড়েছে তা হল তাঁর নাটকে দেবদ্বেষী চরিত্রের প্রাধান্য। কাহিনীর স্বার্থে শেষপর্যন্ত তাদের পরাজয় ঘটলেও বীর্যে,

সংগ্রামে, অকুতোভয় দৃঢ় মানসিকতা ও সুদৃঢ় সঙ্কল্পে তারা মহান হয়ে উঠেছে। সব চেয়ে লক্ষণীয় বিষয় এটিই যে চরিত্রগুলি মহান মানবিকতায় উদ্ভাসিত ; তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব বেদনাবোধ, পরাজয়, নৈরাশ্যের হাহাকারে আমরাই ব্যথিত হয়ে পড়ি। আমাদের সহানুভূতি জাগে।

চাঁদ সদাগর

১৯২৭ সালে আর্ট থিয়েটারের পরিচালক, নাট্যকার, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কর্ণধার হরিদাস চট্টোপাধ্যায়-এর অনুরোধে তিনি লেখেন পৌরাণিক শৈলীতে পাঁচ অঙ্কের পূর্ণাঙ্গ নাটক 'চাঁদ সদাগর'। লৌকিক পুরাণ মনসামঙ্গলের পরিচিত কাহিনীকে নতুনভাবে উপস্থাপন করলেন। এ ব্যাপারে মন্মথকে সাহায্য করেন লোকসাহিত্যে পণ্ডিত রামপ্রাণ গুপ্ত (সম্পর্কে নাট্যকারের দাদামশাই)। পৌরাণিক কাহিনী কাঠামোর মধ্যে তিনি সঞ্চারিত করেন আধুনিক মনন ও সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদ। মনসা ও চাঁদ সদাগরের বিরোধকে এ নাটকে প্রতিভাত করা হয় বৃহত্তর শক্তির দ্বন্দ্বের প্রতীক হিসেবে। মর্ত্যে মনসার পূজা প্রচারকে কেন্দ্র করে চাঁদ সদাগর ও মনসার বিরোধ ও তার ফলে চাঁদের জীবনে নেমে আসে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়—সপ্তডিঙা মধুকর জলে তলিয়ে যাওয়া, ছয় পুত্রের মৃত্যু, লখীন্দরের মৃত্যু—মৃতস্বামীকে নিয়ে পুত্রবধূ বেহুলার কলার ভেলায় ভেসে যাওয়ার অনমনীয় তপস্যা কিছুতেই চাঁদের অকম্পিত দৃঢ়তাকে আন্দোলিত করতে পারে না। দেবদ্রোহী চাঁদ সদাগরের বজ্রকঠোর অমিতবীর্য, অসম্ভব সাহস পাঠক এবং দর্শককে আবেগে উদ্বেল করে। নাটকটির চরিত্রাঙ্কন, ঘটনা সংস্থাপন, অত্যন্ত প্রশংসনীয়। লেখক নিজেই 'চাঁদ সদাগর'-এর ভূমিকায় 'লেখকের কথা' অংশে বলেছেন : "চাঁদ সদাগর লিখিতে বসিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রিতে সর্প-বিভীষিকায় চমকিত হইয়াছি।" বিদ্রোহী চাঁদ-এর সংগ্রামী মনোভাব বহন করে আনে আধুনিক জীবনচেতনা। পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষ মনসা ও চাঁদসদাগরের বিরোধের মধ্যে আভাসিত হতে দেখে শাসকের সঙ্গে শোষিতের দ্বন্দ্বের ছবি। কিন্তু সব ছাপিয়ে এ নাটকে বড় হয়ে ওঠে পৌরাণিক দেবী-চরিত্রের আধুনিক মানবীকরণ। 'মনসা' হয়ে ওঠে নাট্যকারের অভিনব সৃষ্টি। চাঁদ বেনে বেহুলা লখীন্দরের পুরোনো কাহিনীকে নতুন শৈলীতে মন্মথ নতুন করে আধুনিক সংলাপে, চরিত্রায়নের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উপস্থাপিত করলেন। বেহুলা প্রচলিত বিধি নিয়মকে অস্বীকার করে পরিচয় দেন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির। আর মনসাকে মনে হয় বাংলার অবহেলিত নারীত্বের একটি অশ্রুসজল প্রতিমা।

মনোমোহনে 'চাঁদ সদাগর' মঞ্চস্থ হবার আগে প্রযোজক ও পরিচালকের মধ্যে নাটকটির অভিনবত্বের প্রসঙ্গে প্রথমে আলোচনা হয় ও পরে এটি নির্বাচিত হয়। এ প্রসঙ্গে অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন : "সেই চাঁদ বেনে বেহুলা লখীন্দ্ররেব পুরোনো গল্প। কিন্তু লেখার স্টাইলটা নতুন ধরনের, সংলাপও আধুনিক। এসব কারণে পুরোনো গল্প নতুন এক রূপ নিয়েছে।" (নিজেরে হারায়ে খুঁজি)

'চাঁদ সদাগর' প্রথম অভিনীত হয় মনোমোহন থিয়েটারে ১৪.৯.২৭ বুধবার সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায়।

চরিত্রলিপি :	চাঁদ সদাগর	:	অহীন্দ্র চৌধুরী।
	বেহুলা	:	সুশীলা সুন্দরী।
	লখীন্দর	:	ইন্দু মুখোপাধ্যায়।
	নেতা	:	আশ্চর্যময়ী।
	কালু সর্দার	:	কুঞ্জলাল সেন।
	নেড়া	:	তুলসী চক্রবর্তী।
	ধন্বন্তরী	:	সন্তোষ কুমার শীল।
	মনসা	:	নিভাননী।
	সনকা	:	রানী সুন্দরী।
	সাঁই সদাগর	:	কনক নারায়ণ ভূপ।

'চাঁদ সদাগর' সেকালে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় থিয়েটার দেখে মুগ্ধ হয়ে অভিনন্দন জানান পরিচালক অহীন্দ্র চৌধুরীকে। এ বিষয়ে অহীন্দ্র চৌধুরীর মন্তব্য, "........এতদিন যাবৎ স্টারে করছি....প্রশংসা সহানুভূতি অনেক পেয়েছি, কিন্তু এ অভিনয় ও প্রযোজনায় যা পেলাম তা হলো ঠিক প্রশংসা নয় যাকে বলে শ্রদ্ধা। এ রকমটি আর কখনও পাইনি।.....নিজের ওপর এলো নির্ভরশীলতা। এই চাঁদ সদাগর থেকেই আমার সত্তা এখানে সম্যক প্রতিষ্ঠিত হলো।" (নিজেরে হারায়ে খুঁজি)

'চাঁদ সদাগর' প্রযোজনায় বেশ কিছু চিন্তাভাবনা ছিল নতুনতর। সংলাপ ছিল যেমন সাধারণ-বোধ্য, তেমনি তীক্ষ্ণ। এ নাটকের গান লিখে দিয়েছিলেন কবি নরেন্দ্র দেব। নাটকে নৃত্যের ব্যবহার ছিল এবং তাতেও নতুনত্ব ছিল। বিলেত থেকে ড্যান্সিং টাইম আনাতেন অহীন্দ্র চৌধুরী। নৃত্য শিক্ষক ললিতমোহন গোস্বামী অহীন্দ্র চৌধুরীর কাছে যখন নৃত্য পরিকল্পনার ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন তখন ললিত গোস্বামীর আগ্রহে তিনি 'ড্যান্সিং টাইমস' থেকে কিছু ছবি আর গ্রাফ দেখিয়ে বুঝিয়ে বললেন, বেশি অঙ্গভঙ্গি বা পায়ের কাজ না করিয়ে, হাতের ভঙ্গী দিয়ে ভাব ফুটিয়ে তুলতে। যেমন "সাপ দুধ খেতে আসছে বা বাঁশী শুনে আনন্দে দুলছে বা দংশন করতে চলেছে—ইত্যাদি সর্পগতিকে হাত বা দেহভঙ্গিমার মধ্যে" (নিজেরে হারায়ে খুঁজি) নিয়ে আসতে হবে। ফলে এসব নৃত্য নতুনত্ব পেয়েছিল। মন্মথ রায় ও অহীন্দ্র চৌধুরী এই নাটকের মাধ্যমেই বাংলার বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা হিসেবে পরস্পর অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা পড়ে গেলেন।

'চাঁদ সদাগর' সেযুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পত্রপত্রিকাগুলি খুব প্রশংসা করেছিল। 'নাচঘর' (২৩.৯.২৭) লিখলো : "শ্রীমতী নিভাননী মনসার ভূমিকায় অভিনয় চমৎকার করেছেন। নেতার ভূমিকায় আশ্চর্যময়ীর অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য।

......সকলের চেয়ে ভাল লেগেছে চাঁদ সদাগরের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর অনবদ্য অভিনয়। বস্তুতঃ এ নাটকে অহীন্দ্র চৌধুরী অসাধারণ নাট্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।"

Amrita Bazar Patrika (2.10.27) অহীন্দ্র চৌধুরীকে 'The Wizard Chowdhuri' আখ্যায় ভূষিত করে লিখলো : "......The whole credit of the evening went to him (Ahindra Chowdhuri) for his splendid representation of the character......no praise would be too high for him."

"Really no word of compliment can be too high for the management for their excellent mounting of the play......"

'চাঁদ সদাগর' প্রযোজনা করার পূর্বেই 'স্টারে' আর্ট থিয়েটারের হয়ে একাধিক নাটকে প্রযোজক রূপে অহীন্দ্র চৌধুরী নাট্য রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর সেইসব নাট্যকর্মের মধ্যে পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও শিল্প প্রতিভার পরিচয় মিললেও 'মনোমোহন'-এ প্রযোজিত 'চাঁদ সদাগর'ই তাঁকে সর্বপ্রথম সফল প্রযোজক হিসেবে সাফল্য এনে দিল। এ প্রসঙ্গে শচীন সেনগুপ্ত লিখেছেন : "নূতনের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ আর্ট থিয়েটারে বারবার প্রকাশ পেয়েছে।" (বাংলার নাটক ও নাট্যশালা)

সুশীল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "..........The dramatist gave it a modern appeal, emphasizing the human rather than the devotional aspect of the story, using short and pointed prose dialogues instead of the flowing blank verse of Girish Chandra, which was hither to so popular and the usual medium of mythological plays. Though not without songs and dances and even the supernatural element, Chand Sadagar, Manmatha Ray's first full-length drama on the public staze, caused a surprise by its sheer dramatic quality." (The Story of Calcutta Theatre 1753-1980)

'আত্মশক্তি' (৪ঠা কার্তিক ১৩৩৪) লিখলো : "নাটকখানি আমাদের ভাল লেগেছে নাট্যকারের চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনা সংস্থাপনের প্রশংসনীয় দক্ষতায়।......পুরাণোল্লিখিত চরিত্রের ওপর কল্পনার তুলিতে তিনি যে রঙ ফলিয়েছেন, তা বাস্তবিকই অনিন্দনীয়।"

মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর' মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে মানবিক সংগ্রামী চরিত্রের নাট্যরূপ। চাঁদ সদাগর দেবী মনসার বিরুদ্ধে যে কঠিন সংগ্রামী প্রতিজ্ঞা নিয়ে অটল চারিত্রশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, বিংশ শতকের পরাধীন বাঙালী চরিত্রে সেই তেজ ও বীর্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন বলেই নাট্যকার সুদূর পুরাণের পরিবর্তে বাঙালীর পুরাণকেই তাঁর প্রথম আদর্শ করেছিলেন।

সাধারণ নাট্যশালার নাট্যকাররূপে এমনি করেই মন্মথ চিহ্নিত হয়ে গেলেন। আর তখন তাঁর এ উপলব্ধি এল যে সাধারণ নাট্যশালার ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক তাঁকে হতে হবে। সে ঐতিহ্যটি হল নাটকের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার এবং স্বাধীনতার জন্য

সংগ্রাম। শুধু স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম নয়—অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ এবং দুঃশাসনের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম।

The Bengalee Stage

Magnificence & Realism Make "Chand Sadagar" An Outstanding Play

Rabindranath's "Paritran" At The Star

(By "The Night Bird").

MANOMOHAN THEATRE.

"Chand Sadagar."

Once in a while a play is produced which theatregoers [illegible] ... Not only was the theatre packed, but very few plays have had [illegible] ... the audience applauding scene after scene and [illegible] ... It was a [illegible] night which must have pleased the management as much as their patrons—a rare occurrence.

[illegible]

দেবাসুর

মন্মথ রায় আর্ট থিয়েটারের জন্য 'দেবাসুর' লেখেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় 'লেখকের কথা' অংশে এই নাটকের পরিকল্পনা বিষয়ে তাঁর মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে : "......ঋগ্বেদে দেবাসুর সংগ্রামের যে সুপ্রচুর ইঙ্গিত রহিয়াছে, সেই ইঙ্গিতে এই নাটক পরিকল্পিত হইয়াছে।" জাতির মুক্তিযজ্ঞে দধীচির আত্মদানকে কেন্দ্র করে বৈদিক কাহিনী অনুসরণে গড়ে উঠেছে এ নাটক। পাহাড় আর অরণ্যে ঘেরা একদুর্গে বৃত্রাসুরের আবাস। সূর্যের কন্যা সূর্যা এখানে বন্দিনী। তাকে পাহারা দিচ্ছে বলাসুর। সূর্যাকে হারিয়ে সূর্য, ইন্দ্র, বরুণ, দধীচি—সবাই বিমর্ষ। একদিন দধীচি বৃত্রাসুরের কাছে এল সূর্যার মুক্তি চাইতে। বৃত্রাসুর দধীচির কাছে সম্মতি চাইলেন পৌলমীকে (শচী) বিবাহ করবার জন্যে। দধীচি জানালেন পৌলমী কখনও তার পিতৃহন্তাকে স্বামীত্বে বরণ করবে না। তখন বৃত্রাসুর শর্ত আরোপ করলেন যে পৌলমীকে পেলেই তিনি সূর্যাকে মুক্তি দেবেন। দধীচি ইন্দ্রের হাতে পৌলমীকে তুলে দিলেন। বৃত্রাসুর ক্ষিপ্ত হয়ে ইন্দ্রকে আক্রমণ করল। আর এও সে জানালো যে দধীচি যতক্ষণ নদীতে ডুবে থাকবেন সে সময়টুকুর মধ্যে যে দেবতারা সেতু পার হয়ে যাবেন তারা ছাড়া বাকি যাঁরা এপারে থাকবেন, দধীচি নদী থেকে ওঠার পর তাঁদের সকলকে সে হত্যা করবে। দধীচি তাতেই রাজী হয়ে নদীতে ডুব দিলেন। একে একে দেবতারা সেতুপার হয়ে গেলেন কিন্তু দধীচি নদী থেকে উঠলেন না—আত্মদান করে তিনি অসুর নিধনের আগুন জ্বালিয়ে গেলেন। দধীচি বলেছিলেন আজ না হয় একযুগ পরেও দেবতাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ অসুরের অত্যাচার থেকে দেবভূমিকে রক্ষা করবে। এই দধীচির অস্থি থেকে নির্মিত বজ্র-অস্ত্রে দেবরাজ ইন্দ্র পরে বধ করেছিলেন বৃত্রাসুরকে। দেবতার হৃত স্বাধীনতা এইভাবে আবার উদ্ধার হয়েছিল।

শচী ও সূর্যা এই দুটি চরিত্র নিয়ে নাট্যকাহিনী অত্যন্ত ঘনীভূত হয়েছে। সূর্যার জন্য বৃত্রাসুরের ভাই বলাসুর আত্মহত্যা করেছে। কালো হয়ে আলোর রাজ্যের মেয়ের জন্যে তার আকুল আকুতির মধ্যে একটা করুণ ট্রাজেডিও যেন লক্ষ্য করা গেছে। এই পঞ্চাঙ্ক নাটকটির প্রতিটি অঙ্কে মাত্র একটিই দৃশ্য। নাটকটির মধ্যে পূর্ববর্তী নাট্য সমালোচক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য দেখেছিলেন, "ইহাতে জাতির মুক্তিযজ্ঞের মহর্ষি দধীচির আত্মদানকে কেন্দ্র করিয়া বৈদিক কাহিনীর ভিত্তিতে একটি দেশাত্মবোধক নাটক সৃষ্টি হইয়াছে। লাঞ্ছিত নিপীড়িতের বক্ষপঞ্জরে যে বিক্ষোভের অগ্নি জ্বালিয়াছিল, তাহা বিদ্রোহের বজ্রশক্তি হইয়া অত্যাচারীর বক্ষ বিদীর্ণ করিল।" (বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস) কেউবা নাটকটিতে খুঁজে পেলেন পরাধীন ভারতবাসীর চোখে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশজননীর স্বপ্ন। (বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক, ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। কেউবা লক্ষ্য করলেন সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের প্রভুত্ব, হৃদয়হীন শাসন, কঠোর উৎপীড়ন, অন্যায় অত্যাচার, ঔপনিবেশিক শোষণে অতিষ্ঠ দেশবাসীর অত্যাচারিত বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ, ঘৃণা, ভয়ত্রস্ত মানুষের অসহায়তা, পরাধীন ভারতবর্ষের এক বাস্তব

ছবি নাটকে পৌরাণিক পরিবেশের সঙ্গে এক হয়ে উঠেছে। সমগ্র নাট্য পরিকল্পনায় তাই প্রতীকী অর্থ সংগুপ্ত।" (বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা, ড. দীপক চন্দ্র)। কিন্তু নাটকে তার সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয়না। বিরোধ যেন মূলত দেবতা ও অসুরের বদলে কালো চামড়ার সঙ্গে সাদা চামড়ার যদিও বৃত্রাসুরের চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার আধুনিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন এবং এই চরিত্রটিকে তিনি সাম্য, মৈত্রী আর স্বাধীনতার আদর্শে মানবতার উদার প্রাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। চরিত্রটি সমান অধিকারের উদার নীতির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। বলাসুর, বৃত্রাসুর দধীচি ও শচী চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে নাট্যকারের অপূর্ব সৃষ্টি। নাট্যকার এই রচনায় শুধুমাত্র সমাজবোধেরই পরিচয় নয় পাণ্ডিত্যেরও পরিচয় দিয়েছেন। নাট্যকার ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের এক নতুন ক্ষেত্র সন্ধান করেছেন। বাঙালী দর্শককে তিনি বৈদিক বিষয় নিয়ে নাটকরচনার পথনির্দেশ করেছেন। এ সম্বন্ধে নাট্যকার গ্রন্থের ভূমিকায় 'লেখকের কথা' অংশে বলেছেন : "নাটকখানিকে বৈদিক নাটক বলিলে ভুল বলা হইবে কিনা জানি না, কিন্তু পৌরাণিক নাটক বলিলে যে বিশেষ ভুল করা হইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অনেক স্থলে আমার পরিকল্পনা পুরাণের বিরোধীও বটে।" নাটকের মুখবন্ধে সন্ধানীপত্রে মন্মথ উল্লেখ করেছেন ঋগ্বেদ উল্লিখিত দেবাসুর সংগ্রাম ভারতবর্ষে আর্য-অনার্য যুদ্ধরূপে পরিচিত, তাহারই ছায়ায় এই দেবাসুর নাটক।"

অহীন্দ্র চৌধুরী এ প্রসঙ্গে তাঁর 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' গ্রন্থে বলেছেন : "......পৌরাণিক নাটকের প্রধান উপকরণ হলো ভক্তি ও করুণ রস। এখানে তা অনুপস্থিত। এখানে ভক্তিও নেই, কারুণ্যও নেই। এ নাটক শুধু বুদ্ধিজীব্য এবং কিছুটা প্রতীকীও বটে। দধীচির আত্মদান ও অস্থিই সেই প্রতীক। নিপীড়িত জনগণের শক্তি-প্রেরণার উৎস।"

দ্বিতীয় নাটক 'দেবাসুর' প্রসঙ্গে মন্মথর স্বীকৃতি এটি তাঁর প্রথম দেশাত্মবোধক নাটক। অত্যন্ত সচেতনভাবে এ নাটকে তিনি পৌরাণিক কাহিনীর আবরণে সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সময়ের দাবি মেনে দেশপ্রেমিক নাট্যকার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমকালীন ঘটনাকে নাটকের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। পরাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে যখন সরাসরি রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করা যেত না সেই সময়েতেই তিনি দেবতা অসুর দ্বন্দ্বের প্রাচীন কাহিনীর মোড়কে ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান কামনা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রকাশের ইঙ্গিত। বৃত্রাসুরের হাতে দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয়, বৃত্রাসুরের স্বর্গরাজ্য অধিকার, শেষপর্যন্ত দধীচির দেহের অস্থি দিয়ে তৈরি বজ্রে বৃত্রাসুরের মৃত্যু—স্বর্গে দেবতাদের প্রতিষ্ঠা—এ কাহিনীতে যেন দ্যোতিত হয়ে ওঠে সমকালীন ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস। নাটকের দেবভূমি যেন পরাধীন ভারতবর্ষ—দেবতারা স্বাধীনতাকামী দেশবাসী আর অসুররা পররাজ্যলোভী অত্যাচারী ইংরেজ। নাটকটি যখন মনোমোহন থিয়েটারে (২৮শে এপ্রিল ১৯২৮) অভিনীত হয়

তখন দর্শকমহলে একই সাথে সৃষ্টি হয় দেশকে ভালবাসার আবেগ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হবার সাহস।

নাটকটিকে নাট্যকার বৈদিক নাটক বলতে চেয়েছেন। রমেশচন্দ্র দত্তের অনূদিত বেদের অনুবাদ অনুসরণেই নাটকটি লেখা। নাটকে আর্য অনার্যের দ্বন্দ্বের চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে ভুবনজয়ী বিশ্বত্রাস, দেববিদ্বেষী বৃত্রাসুরের পৌলমীর প্রতি আকর্ষণজনিত কামনা। সে যখন উন্মাদের মত বলে—"তোমার প্রতি আমার অক্ষয় অনন্ত প্রেম...আমি তোমায় চেয়েছিলাম...আজো চাই, চিরকাল চাইব...মরণের শেষ মুহূর্তেও চাইব...কেন চাইব না? আমার শৌর্য আছে, শক্তি আছে, প্রতিভা আছে,....." তখন মহাপরাক্রমশালী এক শক্তিধরকে শিশুর মত অসহায় মনে হয়। আলোয়, ছায়ায় দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত এই চরিত্র মন্মথ অসাধারণ দক্ষতায় এঁকেছেন মনে হয়। একই চরিত্রে দানবিক ও মানবিক শক্তির কি অসাধারণ সংগ্রামের ছবি লক্ষ্য করি।

সংলাপ এ নাটকের সম্পদ। নাট্যমুহূর্ত নির্মাণে এ প্রযোজনাটি স্মরণীয়। এ নাটকে অভিনয় শিক্ষা দেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মূল চরিত্রে (বৃত্রাসুর) অভিনয় করেন অহীন্দ্র চৌধুরী। গান লিখে দেন নরেন্দ্র দেব। পরাধীন দেশের মানুষ এ নাটকে খুঁজে পায় এক গভীর বিশ্বাসের প্রার্থিত ভূমি—তা হল অত্যাচারের অবসান হবেই ; নিশ্চিতভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটবে ; যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে দেশবাসীকে প্রস্তুত হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে। এ নাটকের আসল জোর এখানেই—এই দৃপ্ত রাজনৈতিক বিশ্বাসে।

মনোমোহন মঞ্চে আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনায় 'দেবাসুর' ৮শে এপ্রিল ১৯২৮ সালে। এ নাটকে অভিনয় করেছিলেন :

বৃত্রাসুর	:	অহীন্দ্র চৌধুরী
বলাসুর	:	সন্তোষ কুমার দাস
উরণ	:	সন্তোষ শীল
শচী	:	নিভাননী
উষা	:	নীহারবালা
সূর্যা	:	সুশীলাবালা
রৈভী	:	তারকবালা
ইন্দ্র	:	মণীন্দ্রনাথ ঘোষ
দধীচি	:	নরেশ ঘোষ

নাট্যশিক্ষক : অপরেশচন্দ্র। সহশিক্ষক : অহীন্দ্র চৌধুরী। এ নাটকের গান লিখে দিয়েছিলেন নরেন্দ্র দেব। অসুরবালাদের একটি গান লিখে দিয়েছিলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কিন্তু সে যুগে এমন 'বুদ্ধিজীব্য' বিষয় নিয়ে নাটক দর্শক নিল না। এ প্রসঙ্গে সুশীল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "*Debasur* also struck a modern note though it

was an old mythological story on the war between the Gods and the *asuras*. *Debasur* failed to be popular." (The Story of the Calcutta Theatre 1753-1980)" কাহিনী বিশ্লেষণে এবং চরিত্রচিত্রণে নাট্যকারের কল্পনার আশ্রয় অতিরিক্ত বলে এমনটা হয়েছিল বললে তো নাট্যকারের বিশিষ্টতাকেই ক্ষুণ্ণ করা হবে।

এই নাটক সম্বন্ধে 'আনন্দবাজার' (১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) লিখলো : "পরাধীন ভারতের মর্মকথা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নাটকের মধ্যে সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। বিশেষভাবে আত্মত্যাগী দধীচির চরিত্র অতি মহান হইয়াছে।"

ঐ সালেই পৌষ সংখ্যায় 'কল্লোল' লিখলো : "নাটক প্লাবিত বঙ্গদেশে মাঝে মাঝে যে দুই-একখানি নাটক স্বীয় বৈশিষ্ট্যে কলারসিকের মনোহরণ করে 'দেবাসুর' তাহারই একখানি। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, সুললিত ভাষা গৌরব, অপূর্ব চরিত্র চিত্রণ নাটকখানিতে অপরূপ রূপদান করিয়াছে। শৃঙ্খলিতা, নির্যাতিতা দেশজননীর মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা কোনখানে নাটককে ক্ষুণ্ণ না করিয়া জাতিকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বৃত্রাসুর, বলাসুর, শচী এবং দধীচির চরিত্র চতুষ্টয় দর্শক ও পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করিবে। শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের নাটক লেখার নিজস্ব ভঙ্গি এই নাটকে বর্তমান।"

'মুক্তির ডাক', 'চাঁদ সদাগর' আর 'দেবাসুর' নিয়েই নাট্যকার যে লেখার নিজস্ব ভঙ্গি তৈরি করে ফেলেছেন এবং তা সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে একথা স্বীকার করতেই হবে। সমালোচক আরও বলেছেন 'দর্শক ও পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করিবে'। নাট্যকার মন্মথ রায়ের নাটকের পাঠযোগ্যতাও যে অসাধারণ ছিল এটি 'কল্লোলের' প্রতিবেদক ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন আজ থেকে প্রায় ৭২ বছর আগে একথা বোধহয় আর প্রমাণের অপেক্ষা করে না।

শ্রীবৎস

'শ্রীবৎস' নাটকের ভূমিকায় নাট্যকারের মন্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, ১৯২৮-এর বড়দিনের উৎসবে 'স্টার থিয়েটার' অভিনয় করবে বলে নাট্যকারকে একটি নাটক লিখতে অনুরোধ করে। তখন নাট্যকার মন্মথ রায় ৫ই নভেম্বর থেকে ১৯শে নভেম্বরের মধ্যে 'শ্রীবৎস' রচনা করেন। কিন্তু স্টার থিয়েটার বড়দিনের উৎসবে নাটকটি মঞ্চস্থ করতে পারেনি। কারণ নাট্যকার তাঁর পিতার অসুস্থতার জন্য নাটকটিকে যথাসময়ে অভিনয়োপযোগী করে দিতে পারেননি।

শ্রীবৎস ও চিন্তার সুপরিচিত পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে পাঁচ অঙ্কের পৌরাণিক নাটক 'শ্রীবৎস'। শনি ও লক্ষ্মীর বিবাদকে কেন্দ্র করে শ্রীবৎস'র দুর্ভাগ্য ও জীবন সংগ্রাম এ নাটকে চিত্রিত হয়েছে। শনির কোপদৃষ্টির ফলে রাজা শ্রীবৎসকে যে লাঞ্ছনার আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল সেই ঘটনাকেই অত্যন্ত নিপুণভাবে গেঁথেছেন নাট্যকার। মধ্যযুগের পৌরাণিক নাটকগুলিতে ভক্তির সুর প্রবল হওয়ার ফলে বিষয়

বৈচিত্র্য ছিল কম। কিন্তু মন্মথ রায়ের হাতে পৌরাণিক চরিত্র ও কাহিনীতে খুব সহজভাবেই এসেছে সমকালীন জীবন চিন্তার ছাপ, ভক্তির সুর নয়, ভক্তির বদলে প্রাধান্য পেয়েছে নিয়তি।

১৯২৯ সালের ৮ই জুন স্টার থিয়েটারে 'শ্রীবৎস' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম রাত্রি থেকেই নাটকটি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। দর্শকদের মধ্যে বিশেষ করে মহিলারা এ নাটকটিকে বেশি পছন্দ করেছিলেন। এ নাটকে অভিনয় করেছিলেন :

শ্রীবৎস	:	অহীন্দ্র চৌধুরী
বাসুদেব	:	কুঞ্জলাল চক্রবর্তী
শনিদেব	:	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
বনিক	:	ননীগোপাল মল্লিক
নগর পাল	:	তুলসী চক্রবর্তী
রাখাল	:	সরস্বতী
মালিনী	:	তারকবালা (লাইট)
নন্দিনী	:	নীহারবালা
লক্ষ্মী	:	ঊষারানী
চিন্তা	:	শান্তবালা
ভদ্রা	:	সুশীলাবালা (ছোট)।

নাট্যকার শ্রীবৎসের চরিত্রটিকে খুবই মর্মস্পর্শী করে এঁকেছিলেন। চরিত্রটি অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরীরও খুব 'সিমপ্যাথেটিক' বলে মনে হয়েছিল। নাট্যকার মন্মথ রায় দর্শকদের চাহিদা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বলেই এ নাটকে এমন একটি দৃশ্য রেখেছিলেন যা দর্শকরা ঘনঘন করতালিতে অভিনন্দিত করত। দৃশ্যটি হল শ্রীবৎস-এর উন্মাদ দৃশ্য। চিন্তাকে হারানোর পর শ্রীবৎস চলেছেন রাস্তা দিয়ে উন্মাদের মত। ছেলেরা পাগল দেখে পিছনে হাততালি দিচ্ছে আর রাস্তা থেকে ধুলো কুড়িয়ে শ্রীবৎস ছিটোচ্ছেন আর বলছেন— 'নেই—নেই—নেই'। এই দৃশ্যটি অত্যন্ত করুণ হত, আর আবেগপ্লুত দর্শকদের ঘনঘন করতালিতে প্রেক্ষাগৃহ সরব হয়ে উঠত। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নাটকটির স্বত্বাধিকারী ও অভিনেতৃবর্গের মধ্যে অনিবার্যকারণবশত এমন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে নাটকটির অভিনয় বন্ধ করে দিতে হয়।

মহুয়া

নাট্যকারের মানুষ সম্পর্কে বিচিত্র আগ্রহ, কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা থেকেই 'মহুয়া' রচনার সূত্রপাত। অবশ্য এ নাটকটি লেখার ব্যাপারে তাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন মনোমোহন থিয়েটারের তৎকালীন পরিচালক প্রবোধচন্দ্র গুহ। অভিনয় করার তাগিদেই তিনি নাট্যকার মন্মথ রায়কে বালুরঘাটে পরপর দুখানি টেলিগ্রাম করেন। তাঁর টেলিগ্রাম পেয়ে মন্মথ রায় ১৯২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর এটি রচনা শুরু করে কিছুদিনের মধ্যেই

শেষ করেন এবং প্রবোধচন্দ্র গুহের উদ্যোগে ৩১শে ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) ১৯২৯ সালে এটি 'মনোমোহন'-এ মঞ্চস্থ হয়।

দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি গভীর ভালবাসা থেকেই নাট্যকার মন্মথ রায়ের এই ধরনের নাটকের জন্ম, যাকে বৃহত্তর অর্থে পৌরাণিকই বলতে হবে। যদিও এর মধ্যে পৌরাণিক লক্ষণ ও ধর্মের কিছুমাত্র প্রকাশ ঘটেনি, কিন্তু ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, অতীত ইতিহাসের প্রতি ভালবাসাই তাঁকে এই ধরনের নাটক লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। পুরাতন ঘটনা, বিশ্বাস, কিংবদন্তী, লৌকিক গল্প, প্রবাদ, হিতোপদেশ, রূপকথা, সামাজিক প্রথা থেকে মানবপ্রীতির সূত্রে তিনি ঘটনা বেছে নিয়েছেন—যা একই সঙ্গে অতীতের আবার বর্তমানেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের নাটকে তিনি পুরাতনের মধ্যে দিয়ে আধুনিক জীবন সংকটকে ছুঁতে চেয়েছেন। এবং পাশাপাশি সমাজের সমস্যা, প্রেম, ঘৃণা, মিলন, বিরহ, হিংসা, দ্বেষ, অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সমস্তই আশ্রয় পেয়েছে, এমনকি মনস্তত্ত্বও বাদ যায়নি।

আলোচনার সুবিধার্থে 'পৌরাণিক' অর্থটিকে একটু ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করছি। সাধনকুমার ভট্টাচার্য ঐতিহাসিক যুগের পূর্ববর্তী কালের কাহিনীকে 'পৌরাণিক' বলেছেন। সেদিক থেকে ব্যাপকতর অর্থে এই নাটকগুলিকে পৌরাণিক বলাই বোধহয় শ্রেয় হবে।

তিনশো বছর আগেকার লেখা পূর্ববঙ্গের পল্লীকবি দ্বিজ কানাই-এর লেখা 'মহুয়া' পালার আখ্যান ভাগটিও নাট্যকারকে নাট্য রচনায় সাহায্য করে খুব। জাতিধর্ম সংস্কারের ঊর্ধ্বে মানুষী প্রেমের সংস্কার-মুক্ত রূপের জয়গান গেয়েছেন পল্লীকবি তাঁর পালাটিতে। মন্মথ রায় তাকেই উপজীব্য করে অতীত ঐতিহ্য, মানবতাবাদ, সংস্কার-মুক্তি ও জীবনের জয়গানকে সমন্বিত করে রচনা করেন 'মহুয়া'। এ নাটকে নাট্যকার বাংলার প্রকৃতির বুকে বেড়ে ওঠা ভবঘুরে মানুষগুলির বিচিত্র জীবনযাত্রাকে চিত্রায়িত করেন। অতীত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মানবতাবাদ, সংস্কারমুক্তি, জীবনের জয়গান এ নাটকের মূল কথা। লোকগাথার মধ্যে যে বলিষ্ঠ জীবনধর্ম প্রকাশ পায় তাকে মূলধন করে নাট্যকারের রোমান্টিক কবিসত্তা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

'মহুয়া' রাজার মেয়ে, হুমড়ো বেদে তাকে শিশুকালে অপহরণ করে বেদেনী করেছেন। আলাদা পরিবেশে সে বেদে দের আচার ব্যবহার গ্রহণ করেছে, সেই ভবঘুরে জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। বংশের গরিমা নয়, পরিবেশ যে স্বতন্ত্র মানুষ সৃষ্টি করতে পারে, এ নাটকের মধ্যে তা দেখেছি। নাট্যকার সচেতনভাবে বাংলার প্রকৃতির বুকে বেড়ে ওঠা এই ধরনের মানুষগুলির এক অদ্ভুত রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। নদনদী, বনজঙ্গলে ঘেরা মাটি মাখা জীবনের গন্ধ নাটকেও এনেছে এক ব্যাপ্তি। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেপরোয়া আবেগ, প্রেম, প্রতিহিংসা—এ যেন জীবনের এক অপরূপ আলেখ্য। জাতি ধর্ম সংস্কারের ঊর্ধ্বে মানুষী প্রেমের সর্বসংস্কার মুক্ত রূপটিকেই তিনি মহুয়া ও নদেরচাঁদের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করেছেন। নাম- গোত্রহীন অন্ত্যজ, অবহেলিত বেদে-সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনাকে নাট্যকার পরম মমতায় নাটকে প্রস্ফুটিত

করেছেন। এ নাটকে একদিকে তাঁর উদার মনোভাবের আঙ্গিকে সমাজতান্ত্রিক চেতনার যে বিকাশ, বদ্ধ জীবনের যে ছবি তা ফুটে উঠেছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে। উপেক্ষিত মানুষগুলি সরাসরি তাদের প্রচণ্ডতা, অশান্ততা, প্রমত্ততা নিয়েই যেন বাস্তবজীবন থেকে উঠে এসেছে।

নাটকের কুশীলব :

হুমড়ো সর্দার	নির্মলেন্দু লাহিড়ী
নদের চাঁদ	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সুজন	প্রভাতচন্দ্র সিংহ
মানিক	সতীশচন্দ্র গোস্বামী
সন্ন্যাসী	গণেশচন্দ্র গোস্বামী
কোতয়াল	বিজয় কার্তিক রায়
ধনপতি সাধু	সুশীল ঘোষ
রাধু পাগলী	ইন্দুবালা
চন্দ্রাবলী	কালীদাসী

'মনোমোহনে' 'মহুয়া'র প্রযোজিত রূপ দেখে দর্শকরা তো বটেই, পত্রপত্রিকাগুলিও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে।

'নাচঘর' (১০.১.১৯৩০) লেখে, "এই নাটকখানিকে আধুনিক নাট্যসাহিত্যের অন্যতম রত্ন বলতেও আমাদের আপত্তি নেই। মন্মথবাবুর লেখনী অক্ষয় হোক। ...হুমড়ো সর্দারের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নির্মলেন্দু লাহিড়ী তাঁর বহুমুখী শক্তির আর একটি বিচিত্রতার বিকাশ দেখিয়েছেন।....শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নদেরচাঁদ' ও তাঁর পূর্বখ্যাতিকে কিছুমাত্র ম্লান করেনি।...শ্রীমতী সরযূবালার 'মহুয়া' যে কত সুন্দর হয়েছে...এই নবীনা নটীর শক্তি আমাদের বিস্মিত করেছে। তবে নাচে গানে তাঁকে আরো উন্নত হতে হবে।...নৃত্যগুলির ভিতরে এমন নূতনত্ব ও মাধুর্য...বাংলা রঙ্গালয়ে...দুর্লভ। ....নজরুল ইসলাম স্বরচিত গানগুলিতে যেসব সুর দিয়েছেন, বাংলা রঙ্গালয়ের পেশাদার সঙ্গীত শিক্ষকদের তা লজ্জা দিতে পারে।"

কারাগার

অহীন্দ্র চৌধুরী মির্নাভা থিয়েটারে যোগদান করে নাট্যকার মন্মথ রায়কে তাঁদের জন্য একটি নাটক লিখে দিতে অনুরোধ করেন। তখন দেশ জুড়ে চলছে আইন অমান্য আন্দোলন। শ'য়ে শ'য়ে লোক দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজীর নেতৃত্বে কারাবরণ করছে। সমকালীন দেশকালের এই উন্মাদনাময় ঘটনার মন্মথ তাঁর সচেতন মনের অভিব্যক্তি ঘটাতে উন্মুক্ত হবেন এটা খুব স্বাভাবিক। নাট্যকারের নিজের কথাতেই পাই—"দলে দলে লোক কারাবরণ করছিল।...এই পটভূমিকায় মহাভারতে বর্ণিত কংস-কারাগার-এর কথা আমার মনে এসেছিল। যে কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

জন্ম হয়েছিল সেই কারাগারেই আজ উদিত হবে আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাধীনতা সূর্য।......এই ভাব থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল আমার এই কারাগার নাটক।" ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে 'কারাগার' রচনার পরই এটি মঞ্চস্থ হয় না। প্রবোধচন্দ্র গুহের উদ্যোগে অভিনীত হবে বলে নাটকটি ঐ বছরেই ২৫শে নভেম্বর থেকে ১৩ই ডিসেম্বরের মধ্যেই পুনর্লিখিত হয় নতুনভাবে।

'কারাগার' নাটকের পৌরাণিক কাহিনী কাঠামোর মধ্যে নাট্যকার তুলে ধরেন সমকালীন সময়ের ছবি। কারাগার কাহিনীর যে প্রধান দুই প্রতিপক্ষ—অত্যাচারী রাজা কংস ও বসুদেবের নেতৃত্বে পরিচালিত যদুবংশের মানুষগুলির মধ্যে ফুটে ওঠে সমকালীন ভারতবর্ষের অত্যাচারী শাসক ইংরেজ ও ভয়কাতর পরাধীন ভারতের প্রজাদের ছবি। ভারতবর্ষে সমসাময়িক ইতিহাসভূমি থেকে উঠে আসা এই দুই শ্রেণীর চরিত্রের সংঘাত সেদিনের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। পুরাণের কংস কারাগার এ নাটকে রূপান্তরিত হয় ব্রিটিশ শাসিত ভারত কারাগারে। বসুদেব সংগ্রামী মুক্তিকামী জনতার নায়ক। কংকন ও কংকা সংগ্রামী যুবশক্তির প্রতীক। অগণিত সাধারণ মানুষ যেন পরাধীন ভারতবাসী। শাসক শ্রেণীর নির্মম অত্যাচারে তারা ভয়কাতর। মনুষ্যত্বহীন ভয়কাতরতার প্রতি প্রবল ধিক্কার এ নাটকের প্রধান বিশেষত্ব। নাট্যকারের বিশ্বাস কংসকে নিধন করার জন্য তারই কারাগারে ভূমিষ্ঠ হন কৃষ্ণ, তেমনই আগামীদিন পরাধীন ভারতবর্ষের বুকে জন্ম নেবেন দেশের মুক্তিদাতা সেই মহান নেতা। অত্যাচার নিপীড়ন ব্যর্থ হবে—ভারতবর্ষে উদিত হবে স্বাধীনতার সূর্য। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ও দুর্জয় সাহস মন্মথকে অভিভূত ও আবেগাপ্লুত করে। দেশাত্মবোধের আবেগকে নাটকের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য সেই আদর্শকে সামনে রেখে রচনা করেন 'কারাগার'। পরাধীন জাতির মনে সঞ্চারিত হয় মুক্তির আবেগ। নাট্যকার হিসেবে এই মহান ভূমিকা পালনের ফলশ্রুতি চিরন্তন হয়ে আছে বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যনির্মাণের ইতিহাসে।

এ নাটকের কাহিনী নেওয়া হয়েছিল 'শ্রীমদ্ভাগবত' থেকে। ভোজবংশের নৃপতি উগ্রসেনের পুত্র কংস রাজা হয়ে নিষ্ঠুর অত্যাচারে যাদবকুলকে নিপীড়িত করতে লাগলেন। লাঞ্ছিত যাদবদের আকুল প্রার্থনায় পরিত্রাতা ভগবান দুর্বৃত্তের কারাগারে জন্ম গ্রহণ করলেন অধর্ম প্লাবিত পৃথিবীতে ধর্ম স্থাপনের জন্যে দানব কংসকে ধ্বংস করে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্যে। আখ্যান বস্তু এইটুকুই। 'কারাগার' নাটকটির প্রসঙ্গে স্বয়ং নাট্যকার নিজে মন্তব্য করেছেন, "যে কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল সেই কারাগারেই আজও উদিত হবে আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাধীনতা সূর্য। চল সব সেই মহাতীর্থে—এইভাব থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল আমার এই কারাগার নাটক।" ('বাংলা সাধারণ মঞ্চ ও আমি' অমৃত / বিনোদন সংখ্যা ১৯৭২)। গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ নীতিতে লক্ষ মানুষ প্রাণের বিশ্বাসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে ও ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে। তাই কারাগার নাটকে তার

প্রতিফলন দেখে মানুষ তাকে অভিনন্দিত না করে পারেনি। পরাধীন ভার' মুক্তিদূত রূপে গান্ধীজীর এই ভূমিকা সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানালেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বললেন--গান্ধীজী হলেন সেই মানুষ যিনি "যে সব মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নিজেদের শিরে অপমানের বোঝাকে নিত্যকালের বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে সেই সব মানুষের হৃদয়ে তিনি সাহস ও আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন।"--'টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ'--শশীভূষণ দাশগুপ্ত)। গান্ধীজীর এই মহান ভূমিকা, দুঃসাহসী দুঃখবরণের কঠিন তপস্যা, জাতিকে অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত করার দুর্জয় শক্তি নাট্যকার মন্মথ রায়কে অভিভূত করেছিল। তাই তিনি 'কারাগার'-এ বৃটিশ শাসনের শোষণ নিপীড়ন, লাঞ্ছনা বঞ্চনার বিকৃত জীবন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দেশের মানুষকে যে বিদ্রোহী ও বিক্ষোভী হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে, অত্যাচারীর অত্যাচার প্রতিরোধ করতে হবে--এই বিশ্বাসের শক্ত জমি তৈরি করলেন। গান্ধীজীর মহান ব্যক্তিত্বকে মনে রেখে তারই আদলে গড়ে তুললেন 'বসুদেব'কে--যিনি পরাধীন জাতির মধ্যে মুক্তির আবেগ সঞ্চারিত করলেন। মানবতার বেদীতে প্রতিষ্ঠা করলেন সর্বজাতিক সংগ্রাম। এর ফলে পৌরাণিক নাটক হয়ে উঠল সাধারণ মানুষের কঠিন জীবন সংগ্রামের আলেখ্য।

১৯৩০-এর ২৪শে ডিসেম্বর মনোমোহন থিয়েটারে 'কারাগার' মঞ্চস্থ হয়। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের (দানীবাবু) পরিচালনায়, হেমেন্দ্রকুমার ও নজরুলের গানে ও সুরে, বিখ্যাত অভিনেতৃদের অভিনয়ে, সেযুগের বহু পত্রপত্রিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় এ নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। নাটকটি মঞ্চস্থ হবার আগে শহরের অলিতে গলিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয় প্রচারপত্র। এ সম্বন্ধে 'দিপালী' লেখে : "নতুন নাটকের ঘোষণা দিয়ে শহরের চারিদিকে যেসব প্রাচীরপত্র এঁটে দেওয়া হয় কারাগারের প্রাচীরপত্রগুলি তার মধ্যে বেশ একটা শিল্পবৈচিত্র্য নিয়ে দেখা দিয়েছিল।......যারা কখনোই থিয়েটারের কোন খবরই রাখেন না 'কারাগার' তাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং কৌতূহলও জাগিয়ে তুলতে পেরেছে।"

প্রযোজনাটির জনপ্রিয়তা সেযুগের পত্রপত্রিকাতেও পাওয়া যায়। নবশক্তি (১৭ই পৌষ ১৩৩৭) লেখে : ".....মন্মথ রায় কুশলী শিল্পীর মতো কংসের কারাগারকে কেন্দ্র করে নিপীড়িত মানুষের মর্মভেদী আর্তনাদ ফুটিয়ে তুলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অভয়ঙ্করের যে আগমনী তিনি গেয়েছেন তা যুগপৎ আশা ও আনন্দের বাণী বহন করে এনেছে।......কংস চরিত্রে নূতন আলোকপাত...অপূর্ব বর্ণবৈচিত্র্য...সূক্ষ্ম রসবোধ। Convention-কে অতিক্রম করে যে শিল্পী নিজের সৃষ্টিতে প্রাণ দিতে পারেন তিনি যথার্থ শক্তিমান।......কারাগার সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সংযোজন করতে পারবে।"

'ভগ্নদূত' (৩.১.৩১) লেখে : "নাটকখানি পৌরাণিক হইলেও বর্তমান আবহাওয়ার সহিত বেশ খাপ খাওয়ানো হইয়াছে।"

'দিপালী'তে (১লা মাঘ ১৩৩৭) নরেন্দ্র দেব লেখেন : "কাহিনী পুরাতন হলেও

শক্তিমান নাট্যকারের হাতে পড়ে সে আখ্যায়িকা যেন সম্পূর্ণ নতুন হয়ে উঠেছে। কোন বিশেষ দেশকাল পাত্রের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, কারাগারের যে ছবিটি মন্মথবাবু এঁকেছেন তা বিশ্বজনীন হয়ে দেখা দিয়েছে।"

'ভোটরঙ্গ' (১৮.১.৩১) লেখে : "দেশের দিকপাল নায়কগণ এবং অসংখ্য নরনারী যখন কারাবরণ করে নিয়েছেন সেই সময় মনোমোহন থিয়েটারে কারাগার নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করেছেন।......এর মধ্যে ফুটে উঠেছে বিশ্বের অত্যাচারে প্রপীড়িত নরনারীর চিরন্তন বেদনার অভিব্যক্তি......যা পুরাণ হলেও পুরাতন নয়।......এই নতুন নাট্যকারের কল্পনা, তাঁর গতানুগতিক সংস্কারের বাধামুক্ত গভীর অন্তর্দৃষ্টি কংসকে নতুন করে সৃষ্টি করেছে।"

সেকারণেই ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ অষ্টাদশ অভিনয়ের পর ব্রিটিশ সরকারের নিষেধাজ্ঞায় বন্ধ করে দেওয়া হয় 'কারাগার'-এর অভিনয়।

'কারাগার' যেমন পৌরাণিক নাটক তেমনই বিস্তারিত অর্থে এটিকে রূপক নাটকও বলা চলে। আর সেকারণেই রূপকের সেই বাতাবরণ ভেঙে বারবার দর্শকের কাছে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছিল—কংসের কারাগার নয়—অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের কারাগার। সে কারণেই ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ অষ্টাদশ অভিনয়ের পর বৃটিশ সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে 'কারাগার'-এর অভিনয় বন্ধ করে দিলেন। শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির অভিযোগে বাজেয়াপ্ত হল নাটকটি। ১৯৩১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি এক ফরমানে ঘোষণা করা হল :

The Government of Bengal
Political Department
Political Branch
No 1695 P.
ORDER

Calcutta, the 4th Feb. 1931

Whereas it appears to the Governor-in-council that the play entitled 'Karagar' by Manmatha Ray, M.A printed by him at the Sree Gouranga Press at no. 71/1, Mirzapur Street, Calcutta, and published at Barada Bhaban, Balurghat, (Dinajpur), which has been performed at Monomohon Theatre, Calcutta, is likely to excite feelings of disaffection towards the Government established by law in British India. Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Dramatic Performances Act, 1876 - (XII of 1876), The Governor-in-Council hereby prohibits the performance of the said play in any public place.

By order of the Governor-in-Council.
Sd/- R. N. Reid.
Offg Chief Secretary to the Government of Bengal.

বিদেশী শাসকের এই স্বেচ্ছাচার—নিষেধাজ্ঞা দেশবাসী সেদিন নীরবে মানেনি। নাট্যশালার কণ্ঠরোধ, স্বাধীন শিল্প সৃষ্টির প্রতিবন্ধকতায় চারিদিকে ওঠে প্রতিবাদের ঝড়—পত্রপত্রিকায়, প্রাদেশিক আইন সভায় ও আরো নানা স্তরে। প্রতিবাদ আসে মঞ্চ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও। নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে শক্তিশালী জনমত। ফলে ব্রিটিশ সরকার তার পূর্ব আদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। সম্পূর্ণ অক্ষত ও অপরিবর্তিত রূপে নাটকটি পুনরায় মঞ্চস্থ হয় নাট্যনিকেতনে (৮ই আগস্ট ১৯৩৯)। নাটকটির জনপ্রিয়তা ও আকর্ষণ সাধারণ মানুষের কাছে বহুলাংশে বেড়ে যায়। জাতীয় বেদনাকে সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরার জন্য নাটকের চেয়ে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ মাধ্যম সেদিনও ছিল না, আজও নেই। 'কারাগার' নাটকটি সেযুগে সকলের মধ্যে কী প্রবল উন্মাদনার সৃষ্টি করে তা সেযুগের বিখ্যাত অভিনেত্রী (যিনি কংকার ভূমিকায় ছিলেন) সরযূদেবীর কাছ থেকেই জানা যায়। "...কারাগার অভিনয় হবে।...এটা আমাদের কাছে তখন আর অভিনয় নয়, রীতিমত মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম।...প্রথম অভিনয় রজনীতে লোকজন ভেঙ্গে পড়েছে। সে কী উন্মাদনা।...অভিনয়ের মধ্যেই জনারণ্য থেকে শ্লোগান উঠেছে—'বন্দে মাতরম্'। ...এই জাগরণ দেখে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছি। তখন আমরা আর কেউ অভিনেতা 'অভিনেত্রী নই, প্রত্যেকেই স্বাধীনতার সৈনিক।" (২৯.১২.৯১ / আজকাল)

সংবাদমাধ্যমগুলিও সেদিন চুপ করে থাকেনি। সেখানেও উচ্চকিত হয়েছে প্রতিবাদী কণ্ঠ। বিক্ষুব্ধ হয়েছেন বাংলার কলারসিক দর্শক।

The Bengali (13.2.31) লিখলো : "BAN ON KARAGAR" শিরোনাম দিয়ে ".......The ground for the prohibition is that the play is likely to excite feelings of disaffection towards Government established by law in British India."

আনন্দবাজার (৯.২.৩১) লিখলো : "....এই হতভাগ্য পরশাসিত দেশে সবই সম্ভবপর। 'কারাগার' একখানি পৌরাণিক নাটক, দ্বাপরের অত্যাচারী মথুরার রাজা কংসের কাহিনী অবলম্বন করিয়া লিখিত। বাঙ্গালার গভর্নমেন্টের কর্তারা ইহার অভিনয়ে এমন কি আপত্তির কারণ দেখিতে পাইলেন? অথবা দ্বাপর যুগের 'কারাগারে'র সঙ্গে এই কলিযুগের 'কারাগারে'র সাদৃশ্য অনুভব করিয়াই কি তাহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন?"

'Amrita Bazar Patrika' (12.2.31) লিখলো : "If germs of sedition can be discovered in this book then we believe very little in the ancient epics and Puranas of the Hindus can be considered safe by the authorities. ....Is it then the belief of the consorting authorities in Bengal that loyalty can be endangered in the mind of a people in this twentieth century by excluding from it all that is great and noble?"

বড়দিনে জাতীয় মঞ্চে অপরূপ ডালি

কারাগার

মনোমোহন থিয়েটার

শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় এম. এ. প্রণীত নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক

কারাগার

কারাগার

কারাগার

কারাগার

সেই অপরূপ চিত্র

—কারাগারের—

কারাগার

সঙ্গীত ও সুর সংযোজিত

'কারাগার' নাটকের প্রচার পত্র

'বঙ্গবাণী' (৭.৩.৩১) লিখলো : "....১৮ রজনী অভিনয়ের পর হঠাৎ বাঙ্গালা সরকার এক ফতোয়াবলে অভিনয় বন্ধ করিয়া দিয়া একদিকে যেমন থিয়েটার কর্তৃপক্ষের ক্ষতি করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি নাট্যকলার উপর অযথা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।"

'কারাগার' প্রথম রজনীর অভিনয় হয় মনোমোহন থিয়েটার ২৪শে ডিসেম্বর ৩০। পুনরাভিনয় নাট্যনিকেতন ৮ই আগস্ট ১৯৩১।

অধ্যক্ষ	:	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)
সঙ্গীত : কথা ও সুর	:	হেমেন্দ্রকুমার, নজরুল ইসলাম
রূপকার	:	চারু রায়, অখিল নিয়োগী
নৃত্যশিল্পী	:	ব্রজবল্লভ পাল, শ্রীমতী নীহারবালা

অভিনেতৃবৃন্দ :

উগ্রাসন	:	রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ললিত মিত্র
কংস	:	নির্মলেন্দু লাহিড়ী
বসুদেব	:	সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)
কীর্তিমান	:	শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী, মতিবালা।
বিদুরথ	:	সন্তোষ কুমার দাস
কংকন	:	ভূমেন রায়, বঙ্কিম দত্ত
রঞ্জন	:	মতিবালা, সাগরবালা
নরক	:	মণীন্দ্রনাথ ঘোষ
দেবকী	:	শ্রীমতী সুশীলাবালা, নিভাননী
কংকা	:	সরযূবালা, নিরুপমা
চন্দনা	:	নীহারবালা
অঞ্জনা	:	হরিমতী, (ব্ল্যাকী), নীরদাসুন্দরী
ধরিত্রী	:	রাজলক্ষ্মী, নীহারবালা
যোগমায়া	:	রাধারাণী
মদিরা	:	শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)।

[illegible]

নাটকে পঞ্চাঙ্ক বিভাগ আছে, অঙ্কগত দৃশ্য বিভাগ আছে, আছে সঙ্গীত ও নৃত্যের বহুল প্রয়োগ। এমনকি অলৌকিক দৃশ্যের ব্যবহারও আছে। ধরিত্রীর গানগুলি ঠিক মূল নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নয়, তবু একথা সত্য ঐ গানগুলির মধ্যে কংসপীড়িত ধরিত্রীর কাতর কান্না আর আকুল কামনাই ফুটে উঠেছে। এ নাটকে নিছক প্রমোদ রসের গানও আছে ; রসবৈচিত্র্যের জন্যে আছে ছড়ার গান, স্বপ্নদৃশ্যের ব্যবহার আছে। এসব কিছু থাকা সত্ত্বেও 'কারাগার' তীব্র গতিবেগের নাটক। নাট্য সমালোচক ড. অজিতকুমার ঘোষের মতে, "পরস্পর বিরোধী শক্তির প্রবল দ্বন্দ্ব, চরিত্রের আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব,

পরিস্থিতিগত আকস্মিক বৈপরীত্য ও ঘনীভূত নাট্যোৎকণ্ঠা, সংলাপের আবেগকম্প্র ধাবমান গতি প্রভৃতির ফলে নাটকের মধ্যে তীব্র নাট্যাবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে।" (বাংলা নাটকের ইতিহাস)। নাট্যনিকেতনে অভিনয়ের পর পঞ্চাঙ্ক এই পৌরাণিক নাটকটি আবার জমে উঠল। পৌরাণিক নাটকের দাবি পূরণ করেও এ নাটক পরাধীন ভারতের যে পটভূমির আভাস দিয়েছে, একটি শৃঙ্খলিত জাতির যে মুক্তির আবেগ সঞ্চারিত করেছে তাতেই এ নাটকের সার্থকতা তীক্ষ্ণতর হয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। এই নাটকটির পৌরাণিক পরিবেশটি আমাদের বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে এত সাদৃশ্যযুক্ত, চরিত্রগুলির আবেগ এত জোরালো ও জীবন্ত, সংলাপ এত আবেগ-দীপ্ত এবং জাতীয় ভাবোচ্ছ্বসিত যে সমসাময়িক স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে একে সহজেই সমন্বিত করে নেওয়া গেছে।

এ নাটকের সংলাপ, ছোট ছোট বাক্যাংশগুলি তীক্ষ্ণ বিদ্যুতের অনুরণন তৈরি করেছে :

চন্দনা ঃ "কি হবে সহস্র দীপে? আজ সহস্র চাঁদ আমার চোখে লাগবে না....লক্ষ সূর্যও না। কেউ কি কখনো দেখেছে আকাশের বুক চিরে রূপ ঠিকরে বের হয়ে আসে? ...আমি দেখে এলাম.......রূপ নয়, রূপের আগুন.....।"

কোথাও বা তা ঝলসানো আগুনের মত তীব্র দহনের সৃষ্টি করেছে :

কংকন ঃ "...আর হে শয়তান, ভাবছ কেমন করে আমি বাঁচলাম? শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠবে। তোমার এই নরকে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমার ভগবতী মাতা মুমূর্ষু দুধের শিশু ঐ রঞ্জনকে তার স্তন্য হতে বঞ্চিত করে, সেই স্তন্যের শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত আমায় পান করিয়ে ঐ শিশু দধীচি রঞ্জনকে দিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। আজ আমি শুধু বেঁচে নাই, আজ আমি পাহাড় চূর্ণ করতে পারি।"

কখনও বা উচ্ছ্বসিত ঝর্নার স্রোতধারা :

কংকন ঃ "....ব্যর্থ হবে তোমার এই অত্যাচার...হে নিষ্ঠুর নির্মম দানব তোমার অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে আমরা আজ পাষাণ হয়েছি। এই পাষাণে যত ইচ্ছা আঘাত কর আমরা নীরব নিথর রইব।"

কোথাও তা আবার সৌন্দর্যে মাধুর্যের স্নিগ্ধ দীপশিখা :

কীর্তিমান ঃ "ছুটতে আমার লাগে ভালো - কচি রোদের কাঁচা সোনায় নদীর ধারে বালুর চরে......যখন দেখি নদীর বাঁকে রাজহাঁসের মতো পাল তুলে পান্সী ছোটে। আমিও ছুটি তার সাথে।"

এ সংলাপ যেন হয়েছে কবিতা, বোধ করি গদ্যকবিতা নামেই হবে এর সঠিক পরিচয়।

বাহ্যত পৌরাণিক এই নাটকটির রূপকের মোড়ক খুললে যা পাওয়া যায় সেটিই সেযুগের দর্শকদের ভালো লাগার কারণ হয়েছিল। কংস যেন দুর্ধর্ষ অত্যাচারী ইংরাজ শক্তির প্রতিভূ। কিন্তু নাট্যকার কংস চরিত্রটিকে কোথাও সাধারণ 'ভিলেন'-এর শ্রেণীতে ফেলেননি। তার মানবতা ও দানবতার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে তার অপরিসীম শক্তি

সত্তাই ফুটে উঠেছে। দুর্বল মানুষের অক্ষম কাকুতির মধ্যে সার্থক হয়েছে কংসের গর্বোক্তি—"নিদ্রিত নারায়ণ কে জাগিয়েছে কে? ...অশ্রু সম্বল নিপীড়িতের দল? না না, আমি, বিশ্বত্রাস কংস ....আমারই রুদ্র স্পর্শে ভগবান জেগেছেন।" বসুদেব সংগ্রামী জনতার নায়ক। কংকন ও কংকা লাঞ্ছিত নিপীড়িত সংগ্রামী যুবশক্তির প্রতীক। বিদুরথ ইত্যাদিরা প্রভুভক্ত রাজকর্মচারী, যারা বিদেশী শাসনকে কায়েম রাখবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। চন্দনা চরিত্রটিও অপূর্ব। দেশের ও দশের জন্য সে বিক্রয় করল নারীদেহ। ভগবানে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের কি অসাধারণ ঘাত-প্রতিঘাত মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে তার চরিত্রে—"কে ও? কী ও? শুধু মাটি, শুধু পাথর? কিন্তু, কিন্তু তবু কি সুন্দর।" যদুবংশীয় মানুষেরা যেন পরাধীন ভারতেরই প্রজা। কংসের নির্মম অত্যাচারে তারা ভয়কাতর। এই মনুষ্যত্বহীন ভয়কাতরতার প্রতি প্রবল ধিক্কারই এ নাটকের প্রধান বিশেষত্ব। নাট্যকার এই বিদ্রোহ ও বিক্ষোভকে মাথা তুলে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। দেশাত্মবোধের আবেগকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বিপ্লবের জমি তৈরি করেছেন। পরাধীন জাতির স্বাধীনতা স্পৃহাকে উদ্দীপিত করতে গিয়ে তিনি পরাধীন দেশবাসীর দুঃখ, দুর্দশা, পীড়ন, শোষণ, ভীরুতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা, অসহায়তা, ধর্মান্ধতার জীবন্ত আলেখ্য রচনা করেছেন। কী প্রযোজনায়, কী পাঠ্য নাটকরূপে 'কারাগার' তাই বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক উজ্জ্বল স্মরণীয় ব্যতিক্রম।

মঞ্চে 'কারাগার'-এর জনপ্রিয়তা দেখে সেযুগের পত্রপত্রিকা যে মন্তব্য করেছিল তা উদ্ধৃত করা হলো :

'নবশক্তি' (১৭ই পৌষ ১৩৩৭) লিখলো : "শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় কুশলী শিল্পীর মতো কংসের কারাগারকে কেন্দ্র করে নিপীড়িত মানুষের মর্মভেদী আর্তনাদ ফুটিয়ে তুলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অভয়ঙ্করের যে আগমনী তিনি গেয়েছেন, তা যুগপৎ আশা ও আনন্দের বাণী বহন করে এনেছে, ...কংস চরিত্রে....নূতন আলোকপাত ...অপূর্ব বর্ণবৈচিত্র্য সূক্ষ্ম রসবোধ। Convention-কে অতিক্রম করে যে শিল্পী নিজের সৃষ্টিতে প্রাণ দিতে পারেন তিনি যথার্থ শক্তিমান। 'কারাগার'-এর অনেক জায়গাতেই তাঁর এই শক্তির পরিচয় পেয়েছি। ...কারাগার সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সংযোজন করতে পারবে।"

'নাচঘর' (১৭ই পৌষ ১৩৩৭) লিখলো : "কারাগার কেবল নাটকের দিক দিয়েই অপূর্ব হয়নি। রঙ্গালয়ের জীবন উৎসবকেই 'কারাগার' দিয়েছে একটা শ্রী, যার সাধনাই হচ্ছে রঙ্গালয়ের সত্যিকারের সাধন।"

'দীপালী'তে (১লা মাঘ ১৩৩৭) নরেন্দ্র দেব লিখলেন : "কাহিনী পুরাতন হলেও শক্তিমান নাট্যকারের হাতে পড়ে সে আখ্যায়িকা যেন সম্পূর্ণ নূতন হয়ে উঠেছে। কোন বিশেষ দেশ কাল পাত্রের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, কারাগারের যে ছবিটি মন্মথবাবু এঁকেছেন তা বিশ্বজনীন হয়ে দেখা দিয়েছে। এর চেয়ে ভালো একখানি পৌরাণিক নাটক বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত রচিত হয়নি।"

'ভগ্নদূত' (৩.১.৩১) লিখলো : "নাটকখানি পৌরাণিক হইলেও বর্তমান আবহাওয়ার

সহিত বেশ খাপ খাওয়ানো হইয়াছে। ভাব ও ভাষা বেশ সংযত এবং মনোজ্ঞ। ......দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা মনোজ্ঞ।"

'শিশির' (১৮ই পৌষ ১৩৩৭) লিখলো : "কংসের নৃত্যশালা, নয়নাভিরাম পুষ্পবটিকা, ভয়ঙ্কর কাবা প্রাকার প্রভৃতি দৃশ্যগুলি শিল্পী চারু রায় ও যামিনী রায়ের চারু ও কারু শিল্পাভিব্যক্তিব ফল। স্বপ্ন দর্শন, শূন্যে যোগমায়ার আবির্ভাব, বসুদেবের নন্দালয়ে যাত্রা প্রভৃতি দৃশ্যগুলি সাধারণ দর্শকের চিত্তে চমক দেবার পক্ষে যথেষ্ট।"

'ভোটরঙ্গ' (১৮.১.৩১) লিখলো : "দেশের দিকপাল নায়কগণ এবং অসংখ্য নরনারী যখন কারাবরণ করে নিয়েছেন সেই সময় মনোমোহন থিয়েটারে 'কারাগার' নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করেছেন। কংস কর্তৃক কারারুদ্ধ দেবকী ও বসুদেবের পৌরাণিক ঘটনা নিয়ে এ নাটকখানি রচিত হলেও এর মধ্যে ফুটে উঠেছে বিশ্বের অত্যাচারে প্রপীড়িত নরনারীর চিরন্তন বেদনার অভিব্যক্তি। ......মন্মথ রায় এমন একখানি নাটক রচনা করেছেন যা পুরাণ হলেও পুরাতন নয়। চিরনবীনতার প্রাণশক্তি এই নাটকখানিকে নিত্যকালের উপভোগ্য করে তুলেছে। এই নতুন নাট্যকারের কল্পনা তার গতানুগতিক সংস্কারের বাধামুক্ত গভীর অন্তর্দৃষ্টি কংসকে নতুন করে সৃষ্টি করেছেন।"

সাবিত্রী

নাট্যনিকেতনের অধিকারী শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ মন্মথ রায়-এর কাছে অনুরোধ করলেন, 'সাবিত্রী'-কে বিষয় করে সাত দিনের মধ্যে একটি নাটক লিখে দিতে হবে। 'সাবিত্রী' উপাখ্যানে নাটকত্বের প্রাচুর্য নেই ভেবে মন্মথ রায় প্রথমে এ নাটক লিখতে রাজী হননি। কিন্তু পরে রাজী হলেন এবং ৪ঠা বৈশাখ থেকে ৭ই বৈশাখ এবং ২৬শে বৈশাখ থেকে ৫ই জ্যৈষ্ঠ মোট চোদ্দ দিনে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে 'সাবিত্রী' শেষ হল বাংলা ১৩৩৮ সালে।

বিধিলিপি অগ্রাহ্য করে যমের কাছ থেকে মৃত স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার সেই পরিচিত কাহিনী। ভারতীয় নারীর উজ্জ্বল সতীত্বের সেই কাহিনীর মর্মগত সত্য অক্ষুণ্ণ রেখে, তিনি আধুনিক চিন্তাধারাকে প্রবাহিত করে দিলেন 'সাবিত্রী'র মধ্যে। প্রত্যেকটি দৃশ্যে কৌতূহল ও কারুণ্যের মধ্যে দিয়ে 'সাবিত্রী' অনাড়ম্বরে স্তরে স্তরে বিকশিত হয়ে এক আনন্দময় পরিণতি লাভ করলো। 'সাবিত্রী' চরিত্রে যমের সঙ্গে সংগ্রামের যে ছবি আমরা পাই তা অতি আধুনিক সমাজের নারীচরিত্রের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধেরই পরিচায়ক। সংগ্রামের দুঃসাহসিক ক্ষমতায়. দৃপ্ত ব্যক্তিত্বের প্রকাশে 'সাবিত্রী' যেন একালের জীবন সংগ্রামী মানুষের কাহিনী হয়ে উঠেছে। পৌরাণিক হয়েও তাই এ কাহিনী যুগোপযোগী।

'সাবিত্রী' নাটকে বাৎসল্যের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের পরিবেশ রচিত হয়েছে। অশ্বপতির সন্তান বাৎসল্য, পিতৃহৃদয়ের উদ্বেগ, ব্যাকুলতা, অশান্ত আত্মক্ষয়কারী অন্তর্দ্বন্দ্ব—এ নাটকের সম্পদ। অশ্বপতির চরিত্র পরিকল্পনায় নাট্যকারের একালের আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসা সমন্বিত মননধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। অশ্বপতি তাই অগাধ

ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমর্থক, তাই তিনি সহজেই বলতে পেরেছেন, "আজ সে অজ্ঞান নয় হিতাহিতজ্ঞান তার সম্যক বিকশিত, মন তার পরিপূর্ণ জাগ্রত। পতি নির্বাচন এখন তার স্বধর্ম।" এ ঠিক কণ্বের পক্ষে শকুন্তলার গান্ধর্ব বিবাহ মেনে নেওয়া নয়। এ মনোভাব প্রগতিশীল বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রত্যক্ষ দান। একালের মানুষ যে অর্থে একে জীবনের অবিচ্ছিন্ন মৌলিক অধিকার বলে মনে করে এ সেই অধিকার বোধেরই কথা।

এ নাটকে পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে ও নাট্যকারের সমাজ সচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। ধনী ও দরিদ্রের চিরন্তন বৈষম্য একালের প্রেক্ষাপটে পৌরাণিক কাহিনীর আধারে পরিবেশিত হয়েছে। নাট্যকারের মনে সাম্য ও মৈত্রী সম্পর্কে যে চিন্তা তা যেন এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মহাভারতের অশ্বপতি চরিত্রের সঙ্গে এ নাটকের অশ্বপতির মূল তফাৎ ঘটে গেছে এখানেই। মহাভারতের রাজা অশ্বপতির রাজকীয় সম্ভ্রম, মর্যাদা, আভিজাত্য সত্যবানকে জামাতৃপদে বরণ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু এ নাটকে অশ্বপতি একজন বনবাসী ভিক্ষুককে জামাতৃপদে বরণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত। কারণ "এতে যে আমার রাজমহিমা কলঙ্কিত হবে। আমার উচ্চশির ধূলায় লুণ্ঠিত হবে।"—এই ছিল তার যুক্তি। শ্রেণীদ্বন্দ্বের কী স্পষ্ট রূপায়ণ। পিতা হিসেবেও অশ্বপতি বাস্তব ও জীবন্ত। সাবিত্রী অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রামের দৃঢ়তায় পৌরাণিক হয়েও সমসাময়িকতার দেশকাল গত অর্থে তাৎপর্যময়।

১৯৩১ খৃস্টাব্দের মে মাসে, বাংলার ১৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার 'সাবিত্রী' নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ হয়। এ নাটকটি লেখার ব্যাপারে নাট্যকার প্রবোধচন্দ্র ও অখিল নিয়োগীর সাহায্যের কথা স্বীকার করেছেন। নির্মলেন্দু লাহিড়ীর পরিচালনায় নজরুল ইসলামের লেখা গান ও সুর-সংযোজনায় 'সাবিত্রী' সেযুগের একটি উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনা হিসেবে চিহ্নিত হল।

সাবিত্রী নাটকে যারা অভিনয় করেছিলেন

যমরাজ	:	সন্তোষকুমার দাস
নারদ	:	জয়মঙ্গল শর্মা
অশ্বপতি	:	নির্মলেন্দু লাহিড়ী
দ্যুমৎসেন	:	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
সত্যবান	:	কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়
কৌশিক	:	পশুপতি সামন্ত
মন্ত্রী	:	বনবিহারী পান
বিক্রমদেব	:	সুশীল মুখোপাধ্যায়
মালবী	:	নীরদাসুন্দরী
শৈব্যা	:	নিভাননী
সাবিত্রী	:	নীহারবালা
শাশ্বতী	:	নিরুপমা
অদৃষ্ট সঙ্গিনী	:	গিরিবালা

নাট্যনিকেতনে 'সাবিত্রী' নাটকটির প্রযোজিত রূপ দেখে সেযুগের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নাটক, নাট্যকার ও প্রযোজনাটি সম্বন্ধে বিস্তর লেখালেখি হয়।

'বঙ্গবাণী' (৩য় খণ্ড, ২৬শে সংখ্যায় ৩০শে আষাঢ় ১৩৩৮) লেখে :—"মন্মথবাবুর এই নূতন গ্রন্থখানি অতি অল্প সময়ের মধ্যে অর্ডার মাফিক রচিত হইলেও ইহার সৌন্দর্য কোথাও নষ্ট হয় নাই। ঘটনা সন্নিবেশ ও রচনার কৌশলে মন্মথবাবু বেশ দক্ষ হইয়াছেন।"

'দুন্দুভি' (১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ৪.৭.৩১) লেখে : "এমন একদিন ছিল যখন বীরবলের প্রশংসাপত্রে মন্মথ রায়কে জেনেছিলাম। কিন্তু এখন আর তার ক্ষমতাশালী লেখনীকে কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না। ....সাবিত্রীর মত এত প্রাচীন প্রচলিত কাহিনী ভারতে কমই আছে। তিনি যে অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে এই অতি প্রাচীন কাহিনীকে নবরূপ দান করেছেন তা শুধু চোখ মেলে দেখবার প্রাণভরে উপলব্ধি করবার। ......একটি সত্যি রাজহাঁস যে এমন অপূর্ব অভিনয় করতে পারে নাট্যনিকেতনে অভিনয় দেখবার পূর্বে তা কল্পনা করতে পারিনি।"

'Advance' (31.6.31) লেখে : "In Savitri Manmatha Roy has achieved author's success. It is a powerfur five act drama with real histrionic touches from start to finish."

'খেয়ালী' (২৩.২.১৩৩৮) মন্তব্য করে : ".....তাঁর (মন্মথ রায়) ভাষাও সরল সুন্দর। নাটকে সাবিত্রী উপাখ্যানের করুণ সুরটি বিশেষভাবে ফুটেছে।"

'দীপালী' (জুলাই ১৯৩১) লেখে : "সাবিত্রী নাটকখানিতে গ্রন্থকার ভাষা ও চরিত্র সৃষ্টির কল্পনার বৈভবে অপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছেন। নাট্যকার পৌরাণিক মূলতত্ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাতে অনেক রসসম্ভার সংযোজন করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার কল্পনা সঞ্জাত দু-একটি চরিত্র পৌরাণিক চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় নাই। বিশেষত অশ্বপতি চরিত্রের নাটকীয় রূপ পৌরাণিক রূপ হইতে বিশেষরূপে বিভিন্ন।"

'আনন্দবাজার' (২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮) লেখে : ".....ইহা (সাবিত্রী) পুরাতনকে নতুন করিয়াছে, আধুনিককে সনাতন সত্যের অচল প্রতিষ্ঠ বেদী দেখাইয়াছে। ......নাটকখানির রচনা সুসংবদ্ধ অনাবশ্যক বাহুল্য ও আড়ম্বরহীন।"

'নাচঘর' লিখলো : "নাট্যনিকেতনে অভিনীত শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় রচিত 'সাবিত্রী' নাটকখানি দেখে আমাদের এই কথাই বারবার মনে হচ্ছে যে কোন নাটকের উৎপত্তি-ও নয়, তার টেকনিক-ও নয় তার নাটকত্বই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিষ। ...'সাবিত্রী' নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে তিনি কিন্তু Sentimentalism দ্বারা নিজেকে চালিত ও তাড়িত হতে দেননি। উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য দিয়ে তিনি 'সাবিত্রী' নাটক জমিয়ে তোলেননি, অন্তরের গভীরতম প্রদেশকে তিনি নাড়া দেবার চেষ্টা করেছেন। ....ইমোশনের সর্বগ্রাসী দাবীকেও খাটো করে রাখবার শক্তি ও সংযমের পরিচয় দিয়ে (তিনি) হয়ে উঠেছেন পুরোদস্তুর Intellectual". মন্মথর চেয়ে বয়সে প্রবীণ নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'সাবিত্রী'

প্রযোজনাটি দেখে খুশি হয়ে লিখেছিলেন : "সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জিত সহজ সরল এবং বর্ণাঢ্য ভাষায় রচিত এই নাটকখানি বাংলা নাট্য সাহিত্যে একটি বিশেষ সম্পদ রূপে গৃহীত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।" বয়সে বড় হলেও শচীন্দ্রনাথ বাংলা নাটক রচনার জগতে মন্মথের পরে পা রাখেন। কারণ দেশকর্মী, সাংবাদিকতার কাজের মধ্যে থেকেই নাট্যকাররূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। আর্ট থিয়েটার পরিচালিত সান্ধ্য দৈনিক 'বৈকাল' পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁর নাট্যকার সত্তাকে বিকশিত করতে সাহায্য করে। তাই এক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্যও খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

'সাবিত্রী'তে নাট্যকার মন্মথ আধুনিক মননের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন চরিত্রগুলিকে সহজ, স্বাভাবিক, সরল ও দৃঢ় রেখে। এ নাটকের ভাষা সতেজ ভাবাবেগে ভরপুর, স্নিগ্ধ অথচ স্বচ্ছন্দগতি। দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে ভাববৈচিত্র্যে নাটককে কী করে দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়—কী করে হাসি ও অশ্রু, প্রতীক্ষা ও উৎকণ্ঠাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শক মনকে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায়—এ প্রক্রিয়াটি মন্মথ'র সহজাত অধিকারের মধ্যেই ছিল।

খনা

দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থেকে মন্মথ রায় একধরনের পৌরাণিক নাটক রচনা করেছেন, যেখানে ঐতিহাসিক যুগের পূর্ববর্তী কালের কিছু ঘটনা, কিছু বিশ্বাস, কিংবদন্তী, পৌরাণিক কাহিনী প্রবাদ হিতোপদেশ, রূপকথা প্রভৃতি বিষয়ের অঙ্গীভূত হয়েছে। 'খনা' তাঁর সেই ধরনের নাটক। লেখকের 'কথা' অংশে এ নাটকটির রচনা সম্বন্ধীয় যে তথ্য আমরা পাই তাহল—"খনা লিখিয়াছিলাম নিজের প্রেরণায় ১৯৩২ সালে, পূজার ছুটিতে। খনার মতই এ নাটকখানির ভাগ্য বিচিত্র। আর্ট থিয়েটার লিমিটেড পরিচালিত 'স্টার' থিয়েটারে ইহা প্রথম পঠিত ও গঠিত হয়। দিনাজপুর নাট্য সমিতি কর্তৃক ইহা প্রথম অভিনীত হয়, অধুনালুপ্ত নাট্যকুঞ্জ (কলিকাতা) কর্তৃক ইহা প্রথম বিজ্ঞাপিত হয়। 'বাঙলার বাণী' সাপ্তাহিক পত্রে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়, অবশেষে বর্তমানরূপে রূপান্তরিত হইয়া রাজধানীর নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়, 'নাট্যনিকেতনে' গত ১১ই জুলাই বৃহস্পতিবার ১৯৩৫ সাড়ে সাতটায়। ....'খনা'র কোন ইতিহাস পাই নাই। এই নাটকের বার আনা আমার কল্পনা এবং চারি আনা কিংবদন্তী।"

'খনা'র কাহিনী এইরকম : বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন জ্যোতির্ষার্ণব বরাহ। তাঁর পুত্র মিহিরের জন্মের পর তিনি পুত্রের ভুল আয়ু গণনার ফলে শতায়ু পুত্রকে মাত্র দশ বছরের পরমায়ু মনে করে তাকে একটি তাম্রপত্রে নদীতে ভাসিয়ে দেন। মিহিরের জন্মলগ্নে জাত ক্রীতদাস ভৈরবের কন্যা মদনিকাকে অচেতন পত্নী ধরনার কোলে তুলে দেন। এদিকে জলে ভাসতে ভাসতে শিশু মিহির এসে সিংহলে পৌঁছয়। সিংহল রাজার পালিত পুত্ররূপে সে বড় হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে পরম বিদুষী সিংহল রাজকন্যা খনার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। খনার গণনায় মিহির তার পিতৃপরিচয়

লাভ করে। দুজনেই ভারতবর্ষে ফিরে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় এসে জ্যোতিষ বিচারে বরাহকে পরাস্ত করেন। বিক্রমাদিত্য খনার স্বর্ণমূর্তি নির্মাণ করে তাঁর নবরত্ন সভায় বরাহের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। মিহির পিতার অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে খনাকে ভর্ৎসনা করেন। খনা বরাহের অপমান ও লাঞ্ছনা মিহিরের ভর্ৎসনা সহ্য করতে না পেরে নিজের জিহ্বা কেটে প্রাণ বিসর্জন করেন।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মন্মথ রায় 'খনা'র কাহিনীকে নবরূপ দেন। বিশ শতকের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যময়ী একটি উজ্জ্বল চরিত্ররূপে তাকে চিত্রিত করে তোলেন। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর ব্যক্তিসত্তা যেখানে লাঞ্ছনায় বঞ্চনায় অপমানে পদদলিত হয় সেই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় 'খনা'র আত্মহননের মধ্যে দিয়ে। নাট্যকারের কাছে প্রেম এক পারস্পরিক ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা মানবিক অনুভূতি। প্রেমের কাছে তাই কোন জাতি নেই, ধর্ম নেই। প্রেমের জন্যে প্রয়োজন হয় না কৌলিন্যের বিচার। প্রেম সম্পর্কে নাট্যকারের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখতে পাই 'খনা'-য়। খনা সিংহলের রাজকন্যা হয়েও তাই ভালবাসে গোত্রহীন, গৃহহীন, অজ্ঞাতকুলশীল যুবক মিহিরকে।

এ সপ্তাহের আকর্ষণ—

নাট্য-নিকেতন

মন্মথ রায় প্রণীত
পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক

খনা

নাট্য-পরিচালক
শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

'খনা'র বিজ্ঞাপন

ক্যালকাটা থিয়েটার্সের প্রযোজনায় অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় নাট্যনিকেতনে 'খনা' মহাসমারোহে চলেছিল। সঙ্গীত রচনা করেছিলেন অখিল নিয়োগী। সুরকার ছিলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। নৃত্য পরিকল্পনায় ছিলেন নীহারবালা। দৃশ্যপট এঁকেছিলেন নরেন দত্ত। নয়ে ছিলেন—

বিক্রমাদিত্য		শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
ধর্মাধিকার		আশুতোষ ভট্টাচার্য
মিহির	:	জীবন গাঙ্গুলি
বিভাবসু	:	ব্রজেন্দ্র সরকার
বরাহ	:	অহীন্দ্র চৌধুরী
কামন্দক	:	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
ভৈরব	:	মনি ঘোষ
বিশালাক্ষ	:	খগেন্দ্রনাথ দাস
তিলক	:	বেচু সিংহ
সিংহলের মন্ত্রীত্রয়	:	ভবানী ভট্টাচার্য, গিরিজা মিত্র, বিমল ভট্টাচার্য
জনৈক লোক	:	অমূল্য হালদার
খনা	:	সরযূবালা
ধরনী	:	চারুশীলা
উন্মাদিনী	:	হেনাবালা
মহাকাল	:	ননীগোপাল মল্লিক
রাহুল	:	আদিত্য ঘোষ
রক্ষ সৈনগণ	:	ভবানী ভট্টাচার্য ও অন্যান্যরা
চাষা	:	সন্তোষ দাস
পথিক	:	গোকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মর্দনিকা	:	নিরুপমা
তরলিকা	:	তারকবালা
চাষী বৌ	:	কোহিনুর বালা
ছাত্রছাত্রীগণ ও পুরনারীগণ	:	পুষ্পরানী, মুকুলমালা, রাধারানী ও অন্যান্যরা।

মঞ্চ প্রযোজনা কেমন হয়েছিল সে সময়ের পত্র-পত্রিকার সমালোচনার কিছু অংশ তুলে দিলেই বোঝা যাবে।

'দেশ' (২০.৭.৩৫) লিখেছিল : "......মন্মথবাবু অতি দক্ষতার সহিত এই খনা চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় ক্যালকাটা থিয়েটার্স ইহার রূপ দিয়াছেন। ....দীর্ঘ চারি ঘণ্টা ধরিয়া এইরূপ বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়,

দর্শকচিত্ত যাহাতে ভারাক্রান্ত না হইয়া ওঠে তজ্জন্য লেখক অতি নিপুণতার সহিত এই কামন্দক চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ক্রীতদাস চরিত্র মন্মথবাবুর আর একটি স্মরণীয় সৃষ্টি।"

'Dipali' (19.7.35) Voll VII No. 29 লিখলো : "Khana from the pen of Manmatha Roy is perhaps God's answer to the theatre owner's prayer for a play that will please all classes of audiences without calling forth the best in the artistes....... The author has closed the play with Khana's supreme sacrifice with her life at the alter of this devine love.......The author has blended the different episodes in an admirable manner and the result has been the creation of a strong story interest that never lets the attention of the audience flag till the very final curtain."

Advance (1935) বলেছিল : " The story has been well developed and beautifully presented against the well conceived spectacular scenes which give it an authentic atmosphere."

সতী

'সতী' নাটকে 'লেখকের কথা' অংশে পাই নাট্যকার মন্মথ রায় "ক্যালকাটা থিয়েটার্স কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুরুদ্ধ" হয়ে ১৯৩৭ ২৬শে মার্চ থেকে ১০ই এপ্রিল—এই ষোল দিনে 'সতী' রচনা করেন। নাট্যকার বলেছেন "রায়বাহাদুর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডি লিট্, প্রণীত 'সতী' আমাদের পাঠ্য পুস্তক ছিল। এই নাটক রচনায় ডঃ সেনের ঐ আখ্যায়িকা হইতে প্রভূত সাহায্য লাভ করিয়াছি।"

'সতী' পঞ্চাঙ্ক নাটকটি দক্ষের কন্যা, শিবের পত্নী সতীকে নিয়ে প্রাচীন কাহিনীর একটি উজ্জ্বল নাট্যরূপ। একদিকে পিতা অন্যদিকে স্বামীর আকর্ষণকে কেন্দ্র করে এ নাটকে গড়ে উঠেছে নাট্য সংঘর্ষ।

নারদকে সাক্ষী রেখে শাঁখারী বেশে এসে শিব সতীকে শাঁখা পরিয়ে দিলেন। ধুতরা ফুলের মালা দিয়ে সতী শিবকে বরণ করলেন। পিতা দক্ষের অমতে স্বয়ংবর সভা ডেকে তিনি সর্বসমক্ষে শিবকে স্বামীরূপে বরণ করলেন। দক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে শিবহীন যজ্ঞ করতে মনস্থ করলেন। ত্রিভুবনের সকলে নিমন্ত্রিত হল কেবল শিব ছাড়া। ঐশ্বর্যের আজ এত স্পর্দ্ধা যে সে স্বেচ্ছাবৃত বৈরাগ্যকে এমনি করে অপমান করে?—তাই তাপসী বেশে সতী এলেন পিতৃগৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। শিবহীন দক্ষযজ্ঞে দেখা দিল নানা বিঘ্ন। দক্ষ শিবনিন্দা করলেন সর্বসমক্ষে এবং সতীকে যজ্ঞশালা ত্যাগ করতে বললেন। পতিনিন্দা সইতে না পেরে সতী ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে শিব মহিমা ঘোষণা করে দেহত্যাগ করলেন। ত্রিভুবনে শুরু হল তাণ্ডব। ঝড়, বজ্র, তাণ্ডবের মধ্যে দিয়ে প্রলয় মূর্তিতে এলেন শিব, সতীদেহ কাঁধে নিলেন—আকাশ বাতাস কেঁদে উঠল।

পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে সতী-মাহাত্ম্যের এ নাটক সেযুগে দর্শকের মনোরঞ্জন করেছিল খুব। এ নাটকের গান লিখে দিয়েছিলেন নজরুল। সুরকারও তিনি ছিলেন। ১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্যে সতীর সখীরা বিবাহের মাঙ্গলিক গান গেয়েছে—"দেব আশীর্বাদ লহ সতী পুণ্যবতী।" বিজয়া সতীকে উদ্দেশ্য করে গেয়েছে—"বিরূপ আঁখির কি রূপই তুই আঁকলি হৃদয়পটে।" ১ম অঙ্ক ২য় দৃশ্যে সতী শিবের বিবাহে খুশী হয়ে ভূত, প্রেত, নন্দী, ভৃঙ্গী নৃত্যসহ গেয়েছে—"বাবার হল বিয়ে, ষাঁড়ের পিঠে চড়ে।" ৩য় অঙ্ক ১ম দৃশ্যে দক্ষালয়ের অলিন্দে সহচরীরা গেয়েছে—"বাজো বাঁশরী বাজো।" সতীর পতিগৃহে বিদায়ের সময় ২য় দৃশ্যে গাওয়া হয়েছে :—"পাষাণীর মেয়ে আয় বুকে আয়, জগৎ জননী হয়ে কি মাগো জননীরে কাঁদায়।" সেযুগের পৌরাণিক নাটকে নৃত্যগীতের বহুল প্রয়োগ দর্শক চাহিদার ফলেই ঘটত। তাই কথায় ও সুরে গানগুলিকে আকর্ষণীয় করার একটা প্রবণতা সবসময়ই ছিল। গান রচনায় মন্মথ রায় খুব একটা পারঙ্গম ছিলেন না। একথা তিনি নিজে বলেছেন। সেযুগের বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিকেরা তাঁর নাটকের প্রয়োজনে গান রচনা করে দিয়েছেন—সে যুগে সেগুলির জনপ্রিয়তা ও নাটকের পক্ষে সেগুলির প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

'সতী' নাটকটি ক্যালকাটা থিয়েটার্স নাট্যনিকেতনে ২৮.৪.৩৭-এ সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় প্রথম মঞ্চস্থ করেন। এ নাটকের দৃশ্য পরিকল্পনা করেছিলেন চারু রায়। নৃত্য পরিকল্পনা করেছিলেন নীহারবালা। পরিচালক ছিলেন নরেশ মিত্র।

প্রথম রজনীর অভিনেতৃবর্গ

ব্রহ্মা	:	আনলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যা	নারদ	সন্তোষ দাস
বিষ্ণু	:	গিরিজা মিত্র	পিঙ্গলাক্ষ	পবিত্র ভট্টাচার্য
মহাদেব	:	ভূমেন রায়	তাল	অমূল্য হালদার
অগ্নি	:	দেবেন ভৌমিক	বেতাল	খগেন দাস
নন্দী	:	মণি ঘোষ	প্রমথ	বিল্বমঙ্গল দাস
ভৃঙ্গী	:	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	বীরভদ্র	পূর্ণ দাস
দক্ষ	:	শৈলেন চৌধুরী	কথক	রাধারমণ ভট্টাচার্য
ভৃগু	:	জীবন চট্টোপাধ্যায়	দেবগণ	সুবল ঘোষ ও অন্যান্য
প্রসূতি	:	মনোরমা	রোহিণী	সরস্বতী
সতী	:	রানীবালা	জবা	রানী
জয়া	:	নিরুপমা	জয়ন্তী	বীণা দাস
বিজয়া	:	দুর্গারানী	পদ্মা	লক্ষ্মী প্রিয়া
স্বাহা	:	সুবাসিনী	ছোট মেয়ে	আঙ্গুরবালা
অশ্লেষা	:	স্নেহলতা	পুরবাসীগণ	সুবাসিনী, কমলা প্রভৃতি
মঘা	:	বীণা	কিরাত রমণীগণ	বীণা, আঙ্গুর প্রভৃতি।

রঘু ডাকাত

একটি কিংবদন্তীকে আশ্রয় করে 'রঘু ডাকাত'-এর বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীই 'রঘুডাকাতর' নাটকটির বিষয়। নাটকটি 'সংহতি' মাসিক পত্রিকার ১৩৫৫ (ইং ১৯৪৮) সালের পৌষ মাস সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয় ১৯৫৫। তিন অঙ্কের নাটক। দুর্বলের ওপর যখন প্রবলের অত্যাচার ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে তখন নিপীড়িত মানবাত্মার আর্তনাদের মধ্যে যুগে যুগে জন্ম নেয় রঘু ডাকাত এবং সেই দুর্ধর্ষ রঘু ডাকাত প্রেমের পরশ পাথর স্পর্শে কৃষ্ণভক্তে রূপান্তরিত হয়ে সন্ন্যাসীর জীবন বরণ করে। নারায়ণ বল্লভকে তাই বলতে শুনি : "তুমি কেমন ডাকাত - দুর্লভ মণিমাণিক্য বিসর্জন দিয়ে আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র শাণিত ছুরিকা ভূতলে নিক্ষেপ করে কৃষ্ণের বন্দনা করছ?" আনন্দবাজার পত্রিকা (২৭.২.৫৩) 'রঘুডাকাত' নাটকটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল, "মেদিনীপুর অঞ্চলের সম্ভবত একটি ইতিহাস মিশ্রিত লোকগাথার কাহিনী আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। চরিত্র চিত্রণ ভাবব্যঞ্জনা সুষ্ঠু দৃঢ়, নাট্য গ্রন্থন অপূর্ব।"

মন্মথ রায় বাল্যে ও কৈশোরে বহু পৌরাণিক নাটক দেখেছিলেন, যৌবনে মাঝে মধ্যে অভিনয়ও করেছিলেন। তাই এটি মনে করা অনুচিত হবে না যে, তাঁর মনের মধ্যে পৌরাণিক নাটক সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরিই ছিল। কিন্তু যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে অন্য সব কিছুর মত সাহিত্যের রূপরীতি প্রকরণের সংজ্ঞারও পরিবর্তন ঘটে, নতুন অর্থে দ্যোতিত হয়ে তার পরিধি ক্রমশ ব্যাপকতর হয়ে পড়ে। পুরাণে বর্ণিত বিষয়বস্তু অবলম্বন করে যে নাটক রচিত হয় তাকেই পৌরাণিক নাটক বলে—এটি পৌরাণিক নাটকের সাধারণ ও সহজ সংজ্ঞা। কিন্তু 'পুরাণ বর্ণিত' বিষয়বস্তু অর্থেই যদি শুধু এর ব্যবহার ঘটানো হয় তবে পুরাণে বর্ণিত হয়নি অথচ ঐতিহাসিক যুগের কোনো ঘটনাও নয়—এমন ঘটনা অবলম্বনে যে নাটক সৃজন তার শ্রেণী নিরূপণ করায় তখন সমস্যা দেখা দেয়। তাই 'পৌরাণিক' (নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা, সাধন কুমার ভট্টাচার্য) শব্দটি একটু ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করতে হবে।

সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ অর্থাৎ প্রলয়কালে পূর্বসৃষ্টি ধ্বংসের পর নতুন সৃষ্টির বিকাশ, বংশ অর্থাৎ দেবতা ও ঋষিগণের বংশ বর্ণনা, মন্বন্তর অর্থাৎ মনুগণের শাসনকাল বর্ণনা, বংশানুচরিত অর্থাৎ নৃপতিগণের বংশের ইতিহাস—এই পাঁচটি লক্ষণ থাকলে তবেই বলা হয় পুরাণ। তাই একথা বলা যেতে পারে যে, দেবতার মহিমা কীর্তনই পুরাণের মূল কথা।

উনবিংশ শতকে বাংলা নাটক রচনার গোড়ার যুগ থেকে পুরাণ বাংলার নাট্যকারদের কাছে বারবার আকর হিসেবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু পরিবেশ ও প্রবণতা অনুযায়ী নাট্যকাররা নিজেদের মত করে তা ব্যবহার করেছেন। মধুসূদন পুরাণ থেকে উপাদান নিয়েছেন মানসিক সম্পর্ক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রকাশের তাগিদে। ফলে তাঁর শর্মিষ্ঠা, দেবযানী, যযাতি পৌরাণিক নরনারী হলেও আসলে হয়েছে হৃদয়াবেগ তাড়িত সাধারণ মানুষ। মানবিক প্রণয়ই 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের মূল উপজীব্য। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের

আগে পুরাণকে ভক্তিরসের খাতে প্রথম প্রবাহিত করেছিলেন মনোমোহন বসু। এ পথ ধরেই এলেন গিরিশচন্দ্র। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন "হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।" (পৌরাণিক নাটক, গিরিশচন্দ্র ঘোষ / রঙ্গালয় ৩০ চৈত্র ১৩৭০) এই আদর্শে প্রাণিত হয়ে তিনি লিখলেন পৌরাণিক নাটক যার মূল কথা হল ভক্তিরস। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে বাঙালীর প্রাণরসের সহজ স্পন্দন লাভ করিতে পারা যায়। বাংলার পুরাণ বাঙালীর নিজস্ব সৃষ্টি'...বাঙালী তাহার নিজস্ব সুখ দুঃখানুভূতির দ্বারা তাহার পুরাণ চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে, গিরিশচন্দ্রও এই সংস্কৃতির ধারাই তাহার নাটকের মধ্যে অনুসরণ করিয়াছেন।" (বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস) পৌরাণিক নাটকের প্রকৃত সূচনা হল 'গিরিশ যুগ' থেকেই। গিরিশচন্দ্র ও তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারগণ যেমন রাজকৃষ্ণ রায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অপরেশ মুখোপাধ্যায়—এঁদের দ্বারাই পৌরাণিক নাটকের স্বর্ণযুগ স্থাপিত হয়েছিল। নব্য হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তখন পৌরাণিক আদর্শের প্রতি যে নবজাগ্রত অনুরাগ দেখা গিয়েছিল তার পরিচয়ই পরিস্ফুট হয়েছিল তখনকার পৌরাণিক নাটকে। গিরিশচন্দ্রের সময় থেকেই সংস্কৃতানুসারী এই পৌরাণিক চিন্তার সঙ্গে মিলন ঘটল শেক্সপীয়রীয় রীতির পঞ্চাঙ্ক নাটকের গঠনশৈলীর। ফলে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখরা অত্যন্ত প্রিয় করে তুলেছিলেন এই পৌরাণিক নাটককে। তা ছিল আমাদের নিজস্ব সম্পদ। নব্য হিন্দু ধর্মের উত্থান বিকাশ আর সমৃদ্ধির সঙ্গেই পৌরাণিক নাটকের বিপুল চাহিদা বেড়েছিল।

মন্মথ রায় পৌরাণিক নাটক লিখেছিলেন সাধারণ রঙ্গালয়ের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেই, কিন্তু তার মধ্যেই তিনি তৈরি করে নিয়েছিলেন নিজস্ব স্বতন্ত্র ধারা। সাধারণ রঙ্গালয়ের সমান্তরালে এ সময় প্রবাহিত ছিল রবীন্দ্র নাট্যধারা। রবীন্দ্রনাথও পুরাণকে আশ্রয় করে নাটক লিখেছেন, কিন্তু ভক্তিরস তার অন্বিষ্ট ছিল না। তাই দেখি মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'চিত্রাঙ্গদা' হয়েছে নব পুরাণ সৃষ্টি। পৌরাণিক নাটকের প্রশ্নহীন ভক্তি বিশ্বাস তাঁর ভাল লাগেনি—যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠার দিকেই তাঁর মনোযোগ ছিল বেশি। পুরাণ থেকে তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন উপেক্ষিত চরিত্র সমূহ অথবা পৌরাণিক কোন ঘাত প্রতিঘাত মুখর ঘটনাকে। চরিত্রগুলির আত্মায় সিঞ্চিত করলেন মানবীয় সুখ দুঃখ। স্থাপন করলেন যুক্তিবাদ। 'চিত্রাঙ্গদা' প্রসঙ্গে সমালোচকের এই মন্তব্যটি উদ্ধৃত করলেই এটি আরো স্পষ্ট হবে। "দেহী প্রেমের ...... যন্ত্রণা সম্পর্কে কবি যেমন নিঃসংশয়, তেমনি দেহহীন প্রেমের সম্পূর্ণতায় সুস্থির বিশ্বাসী, সেই অসংশয়িত বিশ্বাস অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার মহাভারতীয় গল্পকে আশ্রয় করে সার্থক রূপ পেয়েছে।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ভূদেব চৌধুরী)

পৌরাণিক নাটক রচনার সুবর্ণ যুগে বসেই রবীন্দ্রনাথ পুরাণ নির্ভর নাটক লিখেছেন এবং বুঝেছেন, সিদ্ধরসের নিখুঁত অনুসরণে পৌরাণিক নাটক রচনার দিন শেষ হয়ে আসছে। তাঁর চিন্তা ভাবনা যে কত স্বচ্ছ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় দ্বিজেন্দ্রলাল

থেকে শুরু করে মন্মথ রায় পর্যন্ত নাট্যকারদের পৌরাণিক নাটক থেকে। ক্রমশ পুরাণ নির্ভর নাটক এবং পৌরাণিক নাটকে নীতি আদর্শ ও ভক্তির উচ্ছ্বাস কমে নাটকে রোমান্টিকতার সুর লেগেছে। বিশ শতকের গোড়াতেই পুরাণের 'ভক্তিরস'-এর আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কিন্তু যুক্তি ও ভক্তির সংঘর্ষে নিজস্ব পথ তিনি কতটা খুঁজে পেয়েছিলেন তা নিয়ে সংশয় জাগে। মন্মথ রায়-এর আত্মপ্রকাশের ('চাঁদ সদাগর' ১৯২৭) একবছর আগে ১৯২৬ খৃঃ প্রবীণ নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'নরনারায়ণ' লিখেছিলেন। তিনি এ নাটকে ভক্তিরসকে নেপথ্যে রেখে দেখাতে চেয়েছিলেন আধুনিক দ্বন্দ্বদীর্ণ ব্যক্তিসত্তাকে। কর্ণ চরিত্রের মধ্যে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল ঐতিহ্য বাহিত ভক্তিরসের কাছেই, হয়ত সাধারণ রঙ্গালয়ের দায় মেনেই।

কিন্তু মন্মথ রায় প্রায় শুরু থেকেই পৌরাণিক নাটকে প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছিলেন আধুনিক মানসিকতাকে। কাজেই প্রচলিত ভক্তিবাদের কাছে কখনই তিনি আত্মসমর্পণ করেননি বরং সমকালকে বিভিন্নভাবে তিনি ছুঁতে চেয়েছেন পুরাণ কাহিনী দিয়ে। পৌরাণিক নাটকের অধ্যাত্মবাদী ধর্মোন্মাদনায় পুরুষকারকে অস্বীকার করে, অলৌকিক দৈবের অমোঘত্ব প্রতিষ্ঠা করে, গিরিশচন্দ্র নাট্যক্ষেত্রে যে অধ্যাত্মবাদী ঐতিহ্যের পত্তন করেছিলেন, মন্মথ রায় তাঁর 'কারাগার' দিয়ে তার গতিপথ বদলে দিলেন। কারাগারের কাহিনী পৌরাণিক—সারবস্তু কিন্তু ভক্তিরস নয়, আধুনিক মুক্তি সংগ্রাম। গিরিশচন্দ্র চেয়েছিলেন পৌরাণিক নাটকের মাধ্যমে সামন্তবাদী সমাজের সংস্কার ও মূল্যবোধগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। আর মন্মথ রায় চেয়েছিলেন পৌরাণিক নাটকের মাধ্যমে আধুনিক জীবনবোধের অভিব্যক্তি ঘটাতে। তাই 'কারাগারে' দেখি পৌরাণিক মূল্যবোধ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

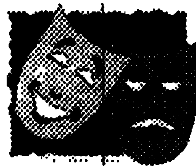
মন্মথ রায় তাঁর পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরসের সঙ্গে মিশিয়েছেন যুক্তিবাদ এবং শুধু পুরাণ থেকে নয়—যা কিছু প্রাচীন, অনৈতিহাসিক সব জায়গা থেকেই তিনি তাঁর নাটকের কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে পরিবেশন করেছেন বাস্তব রস, গেয়েছেন মানব ধর্মের জয়গান। 'চাঁদ সদাগরে' পুরাণ আছে। মনসার কাহিনী মূলত পুরাণের, তা সত্ত্বেও তিনি সুর বদলেছেন। প্রচলিত রীতিতে ভক্তিরসের আধিক্যে আবেগ সৃষ্টি না করে এঁকেছেন চাঁদ সদাগরের বিদ্রোহী রূপ। 'দেবাসুর'-এ তিনি সমাজবোধের পরিচয় দিয়েছেন ঐ কাঠামোর মধ্যেই। মানবিক সম্মান ও অধিকারের দাবি নিয়ে বৃত্রাসুর দেবতাদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছে। 'সাবিত্রী' নাটকে সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন নারী চরিত্রের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কথা। অশ্বপতি চরিত্রে দেখিয়েছেন বাৎসল্যের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বময় সংঘাত। এমনকি পৌরাণিক বাতাবরণে তিনি আধুনিক শ্রেণীদ্বন্দ্ব মূলক সমাজ সমস্যার কথাও এনেছেন 'কারাগার'-এ। 'খনা'-র মধ্যে প্রকাশ করেছেন সমকালীন নারীর মর্মবেদনাকে। জীবন ও ঐতিহ্যের এক সুনিবিড় সমন্বয় ঘটিয়েছেন 'মহুয়া'র মধ্যে।

আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও তিনি বৈচিত্র্য আনয়নের চেষ্টা করেছেন। নাট্যকাহিনীকে পঞ্চাঙ্ক বিভাগ এবং অঙ্ক ও দৃশ্যের অনিবার্য পরিণতি থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। তাঁর প্রথম নাটক চাঁদ সদাগর তিন অঙ্ক সমন্বিত নাটক। কখনো বা অঙ্কের মধ্যে, কোন কোন নাটকে দৃশ্যভাগ করেননি। যেমন 'দেবাসুর' ও 'মহুয়া'। এ দুটি পঞ্চাঙ্ক নাটক হলেও প্রত্যেকটি অঙ্কই এক একটি দৃশ্যরূপে পরিকল্পিত হয়েছে। নাটকীয় কাহিনী, কখনো গতিবেগ হারায়নি, নাট্য কৌতূহল শিথিল হয়নি। নাট্যকার অনায়াস দক্ষতায় বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নানান জটিল ঘটনাকে কত সহজে ফুটিয়ে তুলেছেন। এর জন্য আলাদা দৃশ্য বিভাগ দরকার হয়নি। 'মহুয়া'য় নাটকীয় ঘটনা প্রচণ্ড দ্রুত গতিবেগ সম্পন্ন হয়ে নাটকটির মধ্যে অফুরন্ত প্রাণ প্রবাহের সাবলীলতা এনেছে। 'কারাগার'-এ পরাধীন জাতির সামনে তিনি তুলে ধরেছেন সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের আলেখ্য। পৌরাণিক নাটকের দাবি মেনেও এ নাটক হয়ে উঠেছে শৃঙ্খলিত ভারতবাসীর উদ্দীপক মুক্তিমন্ত্র।

চরিত্র সৃষ্টিতেও মন্মথ রায় তাঁর পৌরাণিক নাটকে প্রথা ভেঙেছেন—দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি শেক্সপীয়রীয় ট্রাজিক চরিত্রের অন্তর্বেদনা ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সঞ্চারিত করেছেন বৃত্রাসুর, বরাহ, কংস, অশ্বপতি, খনা, সাবিত্রী প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্রগুলির মধ্যে।

শুধু চরিত্র সৃষ্টিতেই নয় সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে নতুন ভাবনাচিন্তা করেছেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও তাঁর ওপর দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা স্বতঃই এসে পড়ে। পদ্য সংলাপ ব্যবহার না করে সংকেত গূঢ় রহস্য ব্যঞ্জনাময় গদ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন—উপমায় অলংকারে সজ্জিত চিত্রধর্মী সে ভাষা হয়েছে সজীব গতিবেগ সম্পন্ন।

মন্মথ রায়ই প্রথম নাট্যকার যিনি সাধারণ রঙ্গালয়ে আত্মপ্রকাশ করে ভাঙতে চেয়েছিলেন উনিশ শতকের পৌরাণিক নাটক রচনার ঐতিহ্য বাহিত ধারাটি। সূচনা থেকেই তাঁর এ শ্রেণীর নাটকে মূল রস ভক্তি ছিল না—ছিল মানবিক। তার ফলে তিনি ঘটনা ও চরিত্রের অলৌকিকতার উপর আস্থা না রেখে সমকালীন বিবিধ সমস্যার প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছিলেন এ শ্রেণীর নাটকগুলিতে।



সৃজন : পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক

মন্মথ রায়ের ঐতিহাসিক নাটক প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত করতে গিয়ে ঐতিহাসিক নাটক প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এ সম্পর্কে ধারণার কথা। তাঁর মতে, 'ইতিহাস' শব্দটির একটি ব্যাপক অর্থ আছে। অতীত কালের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সামগ্রিক পরিচয়ের নাম ইতিহাস। ঐতিহাসিক নাটক প্রসঙ্গেও এ কথাটির মূল্য অসীম। নামেই প্রকাশ ঐতিহাসিক নাটক একদিকে ইতিহাস, অন্যদিকে নাটক। নাটকীয়তার পথে রসের সৃষ্টি করা যেমন ঐতিহাসিক নাটকের লক্ষ্য তেমনি তা ইতিহাসের উপাদানকে আশ্রয় করেই করা হয়ে থাকে। ইতিহাসের তথ্য ঘটনা ও চরিত্রকে আশ্রয় করতে হয় কিন্তু আবার তার অতিরিক্ত জীবনের রসরূপকে ফুটিয়ে তুলতে হয় এবং তা করতে হয় কল্পনার সাহায্য নিয়েই। কিন্তু ঐতিহাসিকের তথ্য রাজার নীতি বা যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে যে সংকেত দান করবেন তাকে মেনে নিয়েই নাট্যকার নাটক রচনা করবেন এমনটা নাও হতে পারে, কেননা নাট্যকারের অভীষ্ট লক্ষ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সৃজনশীলতা, কল্পনা যেহেতু তাঁর মূলধন তাই একথা বলা যেতে পারে ঐতিহাসিক যেখানে তাঁর যাত্রা শেষ করেন নাট্যকার সেখান থেকেই তাঁর যাত্রা শুরু করেন।

ইতিহাসের তথ্যকে পুরোপুরি অন্ধভাবে অনুসরণ করলে তা যেমন শুধু ইতিহাসই হবে, নাটক হবে না, আবার তেমনি প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকে পদে পদে লঙঘন করলে তা নাটক হয়ত হলেও হতে পারে কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে তার কোনো যোগ থাকবে না। ঐতিহাসিক নাট্যকারের দায়িত্ব প্রসঙ্গে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে : "His task is not to paint a copy of some contemporary or historical personage ; but to conceive a particular kind of man, acting under the operation of particular circumstances. This conception growing and modifying itself with the progress of the action also invented by the dramatist will determine the totality of the character which he creates."

অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায়, নাট্যকাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যেটি বিকশিত ও অভিব্যক্ত হয় সেই ধারণাটি (conception) থেকে আবার অনেক স্বাধীন কল্পনা রশ্মির মত ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে ক'টি সূত্র উল্লেখ করা যেতে পারে :

১) মূল কাহিনী ও প্রধান চরিত্র হবে ঐতিহাসিক।

২) নাট্যকার স্বাধীন সৃজনশীল কল্পনায় ঐতিহাসিক চরিত্রের বিশ্বাস্য মানবিক রূপ দেবেন। অনৈতিহাসিক দু-একটি চরিত্র ও ঘটনা এর জন্য যুক্ত করা যেতে পারে।

৩) বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলিকে একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করতে হবে।
৪) ইতিহাসের বাস্তবতা ও কল্পনার সম্ভাব্যতা যেন সুসমঞ্জস হয়। প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস বিরোধী যেন না হয়।
৫) ইতিহাসের যুগ ও কালটি যেন রীতি, আচার, সংস্কার ও জীবনাদর্শে বাস্তব হয়।
৬) ঐতিহাসিক নাটকের পাত্র পাত্রীরা সাধারণ স্তরের ওপরে থাকেন, ভাষায় ও আচরণে সেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে হবে।

সূত্রগুলি ধরে আলোচনা করলেই বোঝা যাবে মন্মথ রায়ের 'অশোক' ও 'মীরকাশিম'কে ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে কিনা। 'অশোক'-এ ধর্মীয় তত্ত্ব বা তথ্য থাকলেও তার দ্বারা নাটক ভারাক্রান্ত হয়নি। 'মীরকাশিম'-এর মধ্যে দিয়ে নাট্যকার যুগোচিত দেশপ্রেমের সুরকে ধ্বনিত করে তুলেছেন। দেশ ও জাতির পরাধীনতার মূলে যে বিশ্বাসঘাতকতা রয়েছে নাট্যকার, সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাকে বিশ্লেষণ করেছেন।

ঐতিহাসিক নাট্যরচনাতেও তাঁর বৈশিষ্ট্য কম নেই। তিনি ৫।৬ ঘণ্টার পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনার বদলে আড়াই তিন ঘণ্টার পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনা করেছেন, সুললিত, সরল গদ্যে। বিস্ময়, সংশয় এবং আবেগমণ্ডিত নাট্যক্রিয়াকে প্রচণ্ড গতিশীল করেছেন নাটকে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রচিত ঐতিহাসিক নাটকগুলির ভাবাদর্শ তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের প্রকৃত পুরোধা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনিই প্রথম ঐতিহাসিক নাটকে দেশপ্রেমের আবেগ সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। কিন্তু কল্পনা ও ইতিহাস মিশ্রিত রোমান্স রসের আধিক্য তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে শৈল্পিক সার্থকতা এনে দিতে পারেনি। গিরিশচন্দ্র এক্ষেত্রে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসকে অনেক বেশি সচেতনতা ও যত্ন নিয়ে অনুসরণ করলেও ইতিহাসকে নাটকীয় সত্যে মণ্ডিত করতে পারেননি—অনেক সময় তা সুদীর্ঘ বিবৃতিতে পরিণত হয়েছে মাত্র। পৌরাণিক নাটকের ভক্তি বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে অথবা মধ্যবিত্ত বাঙালীর পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে তাঁর নাট্যশক্তি যেমন সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে, ঘাতপ্রতিঘাত মুখর ইতিহাসের মধ্যে তা তেমন শৈল্পিক হয়ে উঠতে পারেনি। ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ দ্বিজেন্দ্রলালের সমকালে স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় ঐতিহাসিক নাটক রচনায় খ্যাতিমান হলেও রোমান্সের আতিশয্যে, দ্বন্দ্ব সংঘাতময় নাটকীয় কলা কৌশলের অভাবে, জটিলতাহীন চরিত্রবিন্যাসে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের যাথার্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

এদিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর পূর্ববর্তী ও সমকালীন নাট্যকারদের মধ্যে অনেক বেশি অগ্রবর্তী। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে কল্পনা প্রাধান্য পেলেও ইতিহাসের তুলনায় বেশি প্রাধান্য লাভ করেনি। তাঁর রচিত ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্রগুলি

অন্তর্দ্বন্দ্বময়। ঘটনায় নাটকীয় গতিবেগ, ট্র্যাজিক রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর মন পাশ্চাত্য ভাবানুসারী। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের জনপ্রিয়তার মূলে পরোক্ষভাবে কাজ করেছিল তাঁর যুগজীবন। স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনাকে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে রূপ দিতে গিয়ে অতীত ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়গুলি থেকে জাতীয় ভাবোদ্দীপ্ত মহৎ চেতনাকে তাঁর নাটকে সঞ্চারিত করেছেন। "অতীতকে তিনি যুগ জীবনের সমস্যার সঙ্গে সমন্বিত করে নতুন ধরনের ঐতিহাসিক নাটক পরিবেশন করেছেন।" (দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার ঃ রথীন্দ্রনাথ রায়)

দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে যে নতুনত্বের সঞ্চার করেছিলেন তা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এবং সেই পথ বেয়েই অগ্রসর হয়েছিলেন পরবর্তী কালের নাট্যকারেরা। মন্মথ রায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের আলোচনাতেই আমরা এই তথ্য পাই যে সাধারণ রঙ্গালয়ের তাগিদেই তিনি যুগোপযোগী ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ঐতিহাসিক চরিত্র—যাঁরা সে যুগে উদ্দীপনা সঞ্চারে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিলেন। আসলে রঙ্গমঞ্চের মধ্যে দিয়ে দেশের জনগণের মধ্যে একটা অদম্য স্বদেশ মুক্তি কামনা জাগ্রত করে তোলাই তখন প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নাট্যকার গিরিশ-দ্বিজেন্দ্র-এর ইতিহাস বোধকে তিনি যেমন সার্থকভাবে অনুসরণ করেছেন তেমনই ঐতিহাসিক চরিত্রকে মানবিক রসে মণ্ডিত করে তাৎপর্যবহ করে তুলেছেন। তাঁর পরবর্তী নাটক 'মীরকাশিম' সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রয়োজনে লেখা হলেও পরাধীন ভারতবাসীর মনে দেশাত্মবোধের চেতনা জাগ্রত করার সাথে সাথে হিন্দু মুসলমান ঐক্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ঐতিহাসিক তথ্যকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে মন্মথ রায় এ নাটকের কাহিনী এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যাতে দেশ ও জাতি তাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়।

অশোক

'লেখকের কথা' অংশে মন্মথ রায় স্বীকার করেছেন 'রঙমহল'-এর প্রযোজক সতু সেনের আগ্রহে ও উৎসাহে তিনি 'অশোক' রচনায় উৎসাহী হন। ১৯৩৩ সালের ১৮ই মে তিনি সতু সেনের 'তার' পেয়ে বালুরঘাট থেকে কলকাতায় আসেন ও ২২শে জুনের মধ্যে 'অশোক' নাটকটি লেখা শেষ করেন। 'ইতিহাস' নিয়ে নাটক লেখার এটিই তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা। সর্বদা নতুন পাত্রে রস পরিবেশনের ইচ্ছাই তাঁকে একাজে নিয়োজিত করেছে বলে মনে হয়। ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে তাঁর ইতিহাস চেতনা অধিক কাজ করেছে বলে মনে হয় না। মূলত রঙ্গমঞ্চের প্রযোজকের চাহিদাই তাঁকে এই ধরনের নাটক লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। পৌরাণিক নাটকগুলিতে যেমন নাট্যরস সৃষ্টি করে তিনি যথেষ্ট সফল হয়েছিলেন, তেমনই নাটকীয় দ্বন্দ্ব মুখর

ঐতিহাসিক নাটক সৃজনের ক্ষেত্রেও তিনি সে ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন থাকলেন।

চণ্ডাশোকের ধীরে ধীরে ধর্মাশোকে পরিবর্তিত হবার সেই পরিচিত ঐতিহাসিক কাহিনীই এ নাটকের বিষয়বস্তু। ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে এর সার্থকতার কথাও অকুণ্ঠভাবেই উল্লেখ করতে হয়। এ নাটকে বীরত্বব্যঞ্জক পরিবেশ সৃষ্টি, ঘটনার ঘনঘটা, তীব্র ঘাত-প্রতিঘাতে গড়ে ওঠা, চরিত্র ও তাদের শক্তিদীপ্ত রূপ সবই আছে। ধর্মপ্রকৃতি আর চণ্ডপ্রবৃত্তির মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্লান্ত পৃথিবীর অন্যতম সম্রাট অশোকের জীবন এ নাটকে চমৎকার ভাবে বিধৃত হয়েছে। পরিশেষে সম্রাট অশোকের মগ্নচৈতন্যের আত্মবিকাশে অপূর্ব এক রসের সৃষ্টি হয়েছে।

ইতিপূর্বে গিরিশচন্দ্রও অশোকের জীবন বৃত্তান্ত অবলম্বন করে নাটক রচনা করেছিলেন। সে নাটক মঞ্চে অভিনীত হবার গৌরবও লাভ করেছিল। কিন্তু তাতে অলৌকিকতার ভাব ছিল বেশি, তত্ত্বকথাও ভারী করেছিল নাট্য বক্তব্যকে। কিন্তু মন্মথ রায় ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যানুসরণের সাথে সাথে অশোকের মানবিক পরিচয় দেবার ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে সার্থক হয়েছিলেন। এইখানেই তিনি বিশিষ্ট। এ নাটকের পরিসমাপ্তি কোনো বিয়োগান্তক দুঃখের অনুভূতি জাগায় না, বরং করুণায়, ক্ষমায় মনকে স্নিগ্ধ করে রাখে। বিংশোত্তর কালের আধুনিকতায় মন্মথ রায়ের অশোক একটু জটিল। সে জটিলতা চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের মনস্তাত্ত্বিক আবর্ত ঘিরে। তাই দেখি, এ নাটকে পরিস্ফুট হয়েছে প্রেম আর প্রতাপের সঙ্গে জীবনের বিরোধ। দেবী চরিত্রটি নাট্যকারের সম্পূর্ণ মনগড়া। দেবীর প্রতি অশোকের প্রেম, তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা সমস্তই নাট্যকারের কাল্পনিক সৃষ্টি। তিষ্যরক্ষিতার চরিত্রটিও চমৎকার।

১৯৩৩ সালের ২রা ডিসেম্বর 'রঙমহলে' 'অশোক' প্রথম মঞ্চস্থ হয়। গ্রন্থটি পুস্তাকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ৯ই জানুয়ারি ১৯৩৪। 'অশোক'-এর গান রচনা করেছিলেন অখিল নিয়োগী। সুরকার ছিলেন নিতাই মতিলাল। পরিচ্ছদ-পরিকল্পনায় ছিলেন চারু রায়। কারু-চিত্র-পরিকল্পনায় ছিলেন সিদ্ধেশ্বর মিত্র। নৃত্য পরিকল্পক ব্রজবল্লভ পাল। প্রযোজনায় রবি রায় ও পরিচালনায় ছিলেন নরেশ মিত্র।

প্রথম অভিনয় রজনীর কুশীলবগণ

অশোক	:	রবীন্দ্রমোহন রায়
বীতশোক	:	ভূমেন রায়
খল্লাতক	:	নরেশ মিত্র
রাধা গুপ্ত	:	বিজয় কার্তিক দাস
ব্রহ্ম দত্ত	:	হীরালাল চট্টোপাধ্যায়
মহেন্দ্র	:	ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়
কুনাল	:	রতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
দিমেকাস	:	অমর বসু
উপগুপ্ত	:	যোগেশ চৌধুরী

ধর্মকীর্তি	:	সনৎ মুখোপাধ্যায়
মিশর দূত	:	গণেশ মজুমদার
মহাপ্রতিহার	:	স্বরাজ বর্মা
চণ্ডগিরিক	:	রাধাবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রতিহার	:	সুহাস ঘোষ
তিষ্যরক্ষিতা	:	শান্তি গুপ্তা
কাঞ্চন	:	রেণুবালা (সুখ)
দেবী	:	সুহাসিনী
মিত্রা	:	জ্যোতির্ময়ী
যবনী	:	বীণাপানি

ও অন্যান্যরা

'তিষ্যরক্ষিতা'র ভূমিকাভিনেত্রী শান্তি গুপ্তাই প্রথম চলচ্চিত্রাভিনেত্রী যিনি মঞ্চে এসেছিলেন অভিনয় করতে।

'রঙমহলে' 'অশোক' দেখে সেসময়ের বেশ কিছু পত্র পত্রিকা প্রযোজনাটির নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছিল। সেগুলির কয়েকটি উদ্ধৃত করলেই পরিষ্কার হবে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রযোজনার গুরুত্ব ও সে বিষয়ে মন্মথ রায়ের অবদানের বিষয়টি।

'ভগ্নদূত' (৪৭ সংখ্যা ষষ্ঠবর্ষ, ২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৪০) লেখে : "ইতিহাস নিয়ে নাটক রচনায় মন্মথবাবুর এই প্রথম প্রচেষ্টা। মন্মথবাবু এই নাটকখানির ঘটনাগুলিকে সরল ও সুশোভন করে তুলতে যতটা চেষ্টা করেছেন, ইতিহাসোপযোগী আবহাওয়া ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা তার চাইতে কম করেননি। ইতিহাসের বাস্তবক্ষেত্রে তাঁর নাটক কিরকম জমে ওঠে সেইটেই ছিল দেখবার বিষয়।"

'নাচঘর' (নবম বর্ষ ৪৫ সংখ্যক, ২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৪০) লেখে : "মন্মথবাবু যে জনপ্রিয়তার দিকে এক চক্ষু রেখে আর এক চক্ষু ব্যবহার করেছেন নাটক রচনার জন্য 'অশোক' দেখলে একথা বুঝতে দেরি লাগে না। মন্মথবাবুর ভাষা আছে, ঘটনাসৃষ্টির শক্তি আছে, গল্প বলার কায়দাও আছে।"

'আমোদ' (৩য় বর্ষ ১৬শ সংখ্যা, ২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৪০) মন্তব্য করে : "অশোক নাটকখানি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে বিশেষিত হলেও এতে Mythology-র ছোঁয়াও আছে যথেষ্ট। তাহলেও Mythological উপাদান নাট্যকারকে যেরূপ স্বাধীনতা দিয়ে থাকে সে স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ না করেও নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় 'অশোক' নাটকে ইতিহাসের সম্মানই রক্ষা করেছেন সর্বত্র.....কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের আমল থেকে ঐতিহাসিক নাটক রচনার যে রীতি চলে আসছে সে গতানুগতিক ইতিহাস বিরোধী পন্থার অনুসরণে তিনি এদিক দিয়ে একটা দুঃসাহস ও গৌরবের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর নাটক হয়ে উঠেছে ঘটনা প্রধান নয়, চরিত্র প্রধান।"

'শিশির' (১৩শ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ১লা পৌষ ১৩৪০) লেখে : "অননুকরণীয়

কথোপকথনের ভেতর দিয়ে নাটকের ঘাত-প্রতিঘাতকে প্রাণবন্ত করে তুলে, প্রত্যেকটি চরিত্রকে অপরূপভাবে বিকাশ করে তিনি যেভাবে নাটকের চরম পরিণতিতে গিয়ে উপনীত হয়েছেন তাতে তাঁর সূক্ষ্ম কলাজ্ঞানেব প্রশংসা না করে উপায় নেই।'

'দীপালী' (৫ম বর্ষ ৩৭ সংখ্যা, ২১ অগ্রহায়ণ ১৩৪০) লেখে : "তাঁর মুন্সিয়ানা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। অশোকের জীবনে যে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ চলেছে এবং পশু শক্তির প্রভাব মুক্ত হয়ে পরিশেষে যেভাবে অশোকের মগ্নচৈতন্যের আত্মবিকাশ ঘটেছে তা সম্পূর্ণভাবে উচ্চাঙ্গ ড্রামার বিষয়বস্তু। নাটকে ব্যবহৃত 'দেবী' চরিত্রটিও সম্পূর্ণ নাট্যকারের মনগড়া।"

'দেবী' চরিত্রটি কেমন হয়েছিল তা জানা যায় Amrita Bazar Patrika-র (14.12.1933) মন্তব্য পড়লেই। "......The development of the third act, second scene and the climax reached at Devi's death at the unconscious hands of Ashoke do credit to the dramatists conception and excecution." "

Advance (28.1.34)-এ বলে : "...In his recent drama 'Asoke' he has a maturity of style......There is nofaulty lines."

সম্রাট অশোক শুধুমাত্র ভারতেরই নয়, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট—একথা ঐতিহাসিকরাই বলে থাকেন। সেই মহান ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিগত জীবনের এমন আশ্চর্য উত্থান পতনের ছবিকে নাটকের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করার সাহস অভিনন্দন পাবার যোগ্য। মন্মথ সেই কাজটি খুব অনায়াসে করেছিলেন। ঘটনার সমাবেশে, বিভিন্ন চরিত্রের সংযোজনায় সর্বোপরি মাগধীয় ভারতের পটভূমি সৃজনে মন্মথ প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আর অশোক চরিত্রটি—যাকে ঘিরে নাটকীয় ইতিবৃত্তের আবর্তন তাঁর সম্পর্কে মনে হয় যেন অকস্মাৎ জানালা খুলে এক মহান ব্যক্তিত্বকে চকিতে দেখা—পুরোপুরি বোঝার আগেই যেন সে চরিত্রের মিলিয়ে যাওয়া।

মীরকাশিম

পঞ্চাঙ্ক এই ঐতিহাসিক নাটকটির রচনাকাল ১৯৩৮-এর ১৮ই নভেম্বর থেকে ৭ই ডিসেম্বর। তখন তিনি ৩০নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ৮নং ফ্ল্যাটে থাকতেন। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন প্রবোধচন্দ্র গুহকে। 'মীরকাশিম' লিখতে গিয়ে 'লেখকের কথা'য় তিনি বলেছেন, "এ নাটকে ইতিহাস বিকৃত হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।" এ নাটক রচনার সময় তিনি বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে মীরকাশিম-এর ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করেছেন। যেমন— Long's Selections from unpublished records of British India, History of Bengal Army, Torren's Empire in Asia, Wheeler's Early Records of British India, Rise of the Christian power in British India (Major B.D. Bose), Akshoy Kumar Maitra Mirkashim, Seir-ul-Mutakher in Duttas Economic History of British India, Brojendra

Bandopadhyay's paper on Mirkashim.

দেশাত্মবোধ জাগ্রত করবার লক্ষ্য নিয়ে তিনি 'মীরকাশিম' রচনা করেন।: 'মীরকাশিম'-এ তাঁর গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতকের দুরভিসন্ধি ও চতুরতায় ভারতবর্ষের যে ভাগ্য রচিত হয়েছিল শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাশিম-এর হৃদয়ে তা কতটা দ্বন্দ্বে ও বিক্ষোভে আলোড়িত হয়েছিল--এ নাটকে সেই আলোড়নের রক্তরাঙা অধ্যায় করুণ অথচ বীর্যদীপ্ত ভঙ্গিতে বিবৃত হয়েছে। পরাধীন ভারতবাসীর মনে এ নাটক দেশাত্মবোধের চেতনা জাগ্রত করেছিল।

এই নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র, ঘটনা ইতিহাসানুগ হলেও অনেক সময় নাট্যকারের অতিমাত্রায় ইতিহাস-প্রবণতার কারণে বহির্জগতের ঘটনার প্রাচুর্য ও বিচিত্র চরিত্র সমাবেশের মধ্যে অন্তর্জগতের মানবিক আবেগ অনুভূতির প্রকাশ যেন অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই এ নাটকের পরিণতি-দৃশ্য আকস্মিক ও অতিনাটকীয় হয়ে ওঠে। রণকোলাহল মুখর ইতিহাসের বাস্তব ছবি থাকলেও শাশ্বত হৃদয়ের আনন্দ বেদনা মিশ্রিত মানুষগুলির পরিচয় মেলে না। অবশ্য মন্মথ ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রকে অনুসরণ করেছেন এবং দেশপ্রেমের যুগোচিত সুরটিকে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনাময় পরিবেশে তাঁর নাটকে সংবেদনশীল করে তুলতেও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এ নাটক হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মীরকাশিম-এর উৎকণ্ঠা এই ঐতিহাসিক সত্যকেই প্রকাশ করেছে। মন্মথ রায় তার বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিনির্ভর মন নিয়ে সমালোচকের দৃষ্টিকোণ থেকে এ নাটকের মধ্যে দিয়ে দেশ ও জাতিকে তাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর মীরকাশিমকে বলতে শুনি, "সাহসের অভাব ছিল না, অর্থের অভাব ছিল না, অস্ত্রের অভাব ছিল না, কিছুরই অভাব ছিল না, অভাব ছিল দেশাত্মবোধের—অভাব ছিল মনুষ্যত্বের।" মীরকাশিমের আত্মানুশোচনার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে সেই উপলব্ধির স্বরূপ। যে দেশের মানুষ "নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা হলেই......সুখী, তারা দেশ বোঝে না—দেশ চায় না। বেইমান স্বার্থপর"—নাট্যকার আত্মবিশ্লেষকের ভূমিকা থেকে বেইমানীর ইতিহাস উদঘাটন করে একজন দেশপ্রেমিক নাট্যকারের সঠিক ভূমিকা পালন করেছেন। দেশবাসীকে সঠিক পথটি নির্দেশ করেছেন।

১৯৩৮ সালে নাট্যনিকেতনে 'মীরকাশিম' মঞ্চস্থ হয়। সুরকার ছিলেন অমর বসু। নৃত্যপরিকল্পনায় ছিলেন নীহারবালা। নামভূমিকায় ছিলেন ছবি বিশ্বাস। এ নাটকও সেন্সারের ছুরিতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। নাট্যকার নিজে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—"আমার অন্য দেশাত্মবোধক নাটক মীরকাশিম সেন্সারের ছুরিতে ক্ষতবিক্ষত হলেও, নট সম্রাট ছবি বিশ্বাসের সুঅভিনয়ে জাতীয় উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়নি।" (বাংলার সাধারণ মঞ্চ ও আমি ঃ মন্মথ রায়)

মীরকাশিম-এর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস-এর এ সংলাপ প্রচণ্ড উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল

: "কে আছ শহীদ, কে আজ গাজী, কে আজ খোদার নফর, বিদেশী অত্যাচার অবসানের এই পুণ্য জেহাদে যোগ দিয়ে পলাশীর পাপ প্রক্ষালণের জন্য প্রস্তুত হও। পাটনায়, মুঙ্গের, বাংলায়, বিহারে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত সব কুঠি অবরোধ কর। সমগ্র ইংরেজ ব্যবসায়ীকে বন্দী করে শাঠ্যের সমুচিত শাস্তি দিয়ে পলাশীতে অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।"

'খোজা পিদ্রুস'-এর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নরেশ মিত্র। তাঁর অপূর্ব চরিত্র চিত্রণ এ প্রযোজনায় স্মরণীয় হয়ে আছে। যদিও 'নাট্যনিকেতনে' এ নাটকটি খুব বেশি দিন চলেনি, তবুও সামগ্রিক প্রযোজনায় উন্নত মানের গুণে এ নাটক দর্শকদের মনে দাগ ফেলেছিল। এ নাটক দেখে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার আশা পোষণ করেছিলেন, "বর্ত্তমান যুগে এই নাটকখানি বিশেষ আদর পাইবে আশা করি।"

সে সময়ের পত্রপত্রিকাতেও 'মীরকাশিম'-এর প্রশংসা হয়েছিল। 'দেশ' (১৯৩৮) লিখেছিল : "আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি নাটকখানি দেশপ্রাণ বাঙালী নরনারীর চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হইবে।"

'যুগান্তর' (১৯৩৮) লিখেছিল : "প্রত্যেকটি বাঙালীর এই মীরকাশিম দেখা অবশ্য কর্তব্য। 'মীরকাশিম' নাটকে মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র রহিয়াছে।"

আনন্দবাজার (১৯৩৮) লিখেছিল : "ঐতিহাসিক সত্য অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় অনবদ্য নাটক সৃষ্টি করিয়াছেন।"

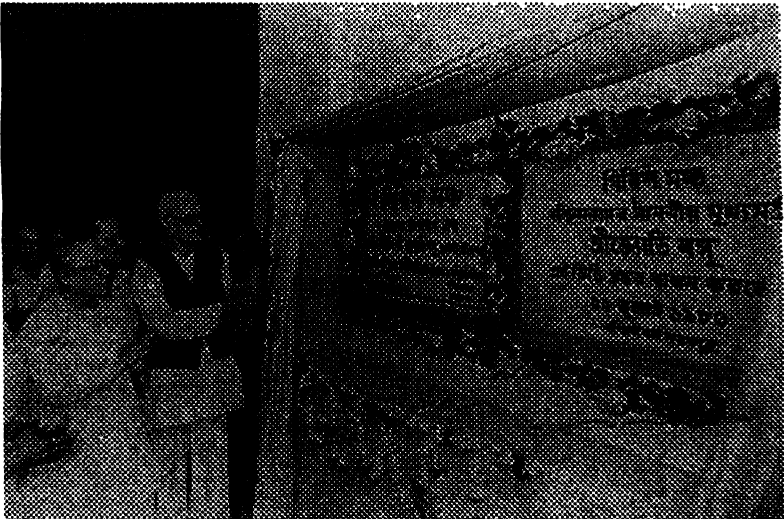
Amrita Bazar (1938) বলেছে : "History tells us that it was Mirkasim who actually captured Siraj at Bhagawangola. Mr. Manmatha Roy has convinced us that inspite of his past misdeeds Mirkasim was the last great Nawab of Bengal who really deserves our sympathy and respect. He was the last independent Nawab of Bengal who made the supreme sacrifice to save Indian marchants from imminent ruin ."

১৯০৬ সালে গিরিশচন্দ্র 'মীরকাশিম' নাটকটি রচনা করেন। অভিনীত হয় ১৯০৬ খৃঃ ১৬ই জুন মির্নাভা রঙ্গমঞ্চে সন্ধ্যা ছ'টায়। 'মীরকাশিম' সেযুগে জনপ্রিয়তা পায় এবং এই জনপ্রিয়তার ফলেই তৎকালীন বৃটিশ সরকার এর অভিনয় বন্ধ করে দেন ও নাটক বাজেয়াপ্ত হয়। বঙ্গভঙ্গের প্রশ্নে উদ্বেলিত বাঙালীর জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধ প্রকাশিত হয়েছিল এ নাটকে। বাজেয়াপ্ত হবার পর 'মীরকাশিম'কে নিয়ে দীর্ঘদিন কোনো নাটক লেখা হয়নি। কিন্তু দীর্ঘদিন পর ১৯৩৮-এ যখন শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' যখন জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে পৌঁছে গেল ইংরেজ সরকার তার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করল না—তখন নাট্যনিকেতনের স্বত্বাধিকারী প্রবোধচন্দ্র গুহের অনুরোধে মন্মথ রায় লিখলেন 'মীরকাশিম'। বিভিন্ন বই থেকে তিনি এ ব্যাপারে সাহায্য নিয়েছিলেন। যেসব বই পড়ে মন্মথ রায় মীরকাশিম নাটক রচনায় সাহায্য পেয়েছিলেন তার কোনটিতেই মীরকাশিমকে দেশপ্রেমী বা শহীদ বলে উল্লেখ করা হয়নি। তবুও

গিরিশচন্দ্রের মীরকাশিম-এর তুলনায় মন্মথ রায়ের মীরকাশিম-এর স্বাতন্ত্র্য উল্লেখযোগ্য।

গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে বহু ঘটনার সমাবেশ করেছেন, কিন্তু মন্মথ রায় মাত্র কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে মীরকাশিমের জীবন দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন। দুটি নাটকের রচনা শৈলীতেও যথেষ্ট পার্থক্য। গিরিশচন্দ্রের নাটকে ছোট ছোট নানা ঘটনায় মীরকাশিমের জীবনের ঘটনা প্রকাশিত। মন্মথ রায়ের এই পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটকে দৃশ্য সংখ্যা মাত্র সাতটি। মূল নাটককে মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার।

ত্রিশ-এর দশক থেকে বাঙালীর জীবনে সংকটের সূচনা হয়েছিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতিতে দেখা গিয়েছিল অস্থিরতা। স্বাধীনতাহীন মানুষ কোন পথটি সঠিক পথ এটি স্পষ্টভাবে বুঝে উঠতে পারছিল না। এই পরিস্থিতিতেই নাট্যকার দায়িত্বশীল সমাজ সচেতন একজন নাট্যকারের সঠিক ভূমিকাই পালন করেছিলেন। এমন দুটি ঐতিহাসিক চরিত্রকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন যারা নিজের তাগিদে মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। প্রথমজন অশোক, দ্বিতীয়জন মীরকাশিম—একজন হিন্দু, অন্যজন মুসলমান। ত্রিশ-এর দশকের টালমাটাল পরিস্থিতির নিরিখেই নাট্যকাররা সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাই মন্মথ রায় এমন দুটি চরিত্রকে বেছে নিয়েছিলেন যাঁরা মানবতাকে স্বাধীনতাকে বড় মনে করেছেন—যা অসাম্প্রদায়িক মনোভাবেরই পরিচায়ক।



গিরিশমঞ্চের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও মন্মথ (১২.৭.৮০)

নাট্য নিকেতন

পরিচালক—নাট্যনিকেতন লিমিটেড

—ঃ বাংলার শ্রেষ্ঠ জাতীয় রঙ্গালয় ঃ—

মীরকাশিম

পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত

"...সাহিদ, কে আছ গাজী, কে আছ খোদার নফর, অত্যাচার-অবসানের এই পুণ্য ...জেহাদে যোগ দিয়ে পলাশীর পাপ প্রক্ষালন করবার জন্য প্রস্তুত হও।"

প্রযোজক—সুধীর গুহ

পরিচালক—...

Amrita Bazar :—

The Natyaniketan Theatre opened its [illegible] season on Saturday last the 15th instant with "Mirkashim" a five-Act Historical Drama written by the well-known dramatist Mr. Manmatha Roy.

History tells us that it was Mirkasim who actually captured Siraj at Bhagawangola and brought him back to Murshidabad before he was beheaded but Mr. Manmatha Roy has convinced us that in spite of his past misdeeds Mirkasim was the last great Nawab of Bengal who really deserves our sympathy and respect. Because, it was this unfortunate man who kept the standard of independence [illegible] against tremendous odds. He was the last [illegible] Nawab of Bengal who made the supreme sacrifice to save Indian Merchants from [illegible] ruin. The East India Company found a very uncomfortable ally in the new Nawab of their own creation. To combat the deliberate abuse of the Badshahi Firman that granted the East India Company the monopoly of inland trade without payment of duty in this country, Mirkasim abolished duty on inland trade altogether. This inflicted a death blow to the East India Company [illegible]

... applauded from all corners of the house. Messrs Kunja Lal Sen, Dhirendra Nath Chatterjee, Jiban Chatterjee, Jiten Chatterjee, Jiten Ganguli, Fani Ganguli, Panchupati [illegible] did full justice to their roles. The decorous settings, the gorgeous costumes, the illusive display of perfect light and shade according to the varying demand of the situations all have maintained the traditional good name of Natya Niketan.

আনন্দবাজার :—

সৃজন : পূর্ণাঙ্গ সামাজিক

'সামাজিক' শব্দটির ব্যাপকতা খুব বেশি। মানুষ সম্পর্কে যখন বলা হয় সমাজবদ্ধতা তার জীবনযাপনের অঙ্গ তখন তার সামাজিক পরিচয়টি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। নাটক প্রসঙ্গেও 'সামাজিক' শব্দটির প্রাসঙ্গিকতা একেবারেই ক্ষীণ নয়। নাটকের বিষয় যদি মানুষের জীবন হয়, তাহলে সে জীবন সম্পূর্ণরূপে সমাজ নিরপেক্ষ হতে পারে না। কারণ মানুষ তো সমাজকে উপেক্ষা করে জীবনযাপন করতে পারে না। তাই ইতিহাসের আর পুরাণ-রাজ্যের প্রভাবের বাইরে সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবন, তাদের সুখদুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, নানান সমস্যা, সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক সূত্রে তার নানা প্রতিক্রিয়া, পরিবারের সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে রচিত হয় যে নাটক, তাকে আমরা 'সামাজিক নাটক' বলতে পারি। কোন নাটকে সমাজের রূপটি ব্যক্তিকে আশ্রয় করে ব্যক্তির সঙ্গে বোঝাপড়ায় প্রকাশিত, কোথাও বা একটা গোটা পরিবারকে আশ্রয় করে তার মধ্যে দিয়ে বিকশিত, আবার কোথাও তা নানান স্তরের বা কোন একটি স্তরের মানুষের জীবনচিত্র উপস্থাপনে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকে বা পৌরাণিক নাটকে সমাজ সমস্যাকে তেমন বড় করে দেখা হয় না। প্রথমটিতে ঐতিহাসিক রস ও দ্বিতীয়টিতে ভক্তিরসকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রবণতা অনুযায়ী সামাজিক নাটককে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : যেমন সমস্যামূলক, পারিবারিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

মানুষ তার সমাজের মধ্যেই বেড়ে ওঠে, তাই তাকে সমাজের কিছু রীতিনীতি বা মূল্যবোধের সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলতে হয়। কিন্তু যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যক্তির মানসিক পরিবর্তন ঘটার ফলে সে অনেক সময় পূর্ব প্রচলিত সমাজবিধিকে মেনে নিতে পারে না। তখনই ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। মন্মথ রায়ের আগেও এই ধরনের সমাজ-সমস্যামূলক নাটক লেখা হয়েছিল। যেমন—রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (কৌলীন্য প্রথার সমস্যা), 'নবনাটক' (বহু বিবাহ সমস্যা), 'চক্ষুদান' (লাম্পট্য সমস্যা), 'উভয় সংকট' (সপত্নী সমস্যা), মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা', উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' (বিধবা-বিবাহ সমস্যা)।

মানুষ যেহেতু তার পরিবারের মধ্যেই বাস করে তাই কখনো ব্যক্তির নিজের সমস্যার চেয়ে পরিবারের সমস্যা নাটকে বড় হয়ে উঠতে পারে। সমাজের সামান্য বা প্রবল চাপে পরিবারের সমস্যাই কখনো মুখ্য হয়ে ওঠে। পরিবারের কর্তা এবং অন্যান্য সকল চরিত্রই হয়তো একই পরিবারের অন্তর্গত তবু তাদের আচরণ এই সমাজের মৃদু বা প্রবল চাপেই যখন আন্দোলিত হয় তখন তাকেই আমরা পারিবারিক সামাজিক নাটক বলতে পারি। এই ধরনের নাটক হিসেবে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর', 'বিশ বছর আগে' ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

আধুনিককালে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি মানুষ নানা চিন্তা, নানা সমস্যা ও মতবাদে জর্জরিত, সংক্ষুব্ধ। নিরবচ্ছিন্ন সুখ নয়—জীবন জিজ্ঞাসা, তর্ক, সংশয়,

সন্দেহ তার জীবনে অবিরাম আছড়ে পড়ছে। সেই সংক্ষুব্ধ জীবনের মনোবিশ্লেষণ যে নাটকে দেখা যায় তাকেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক সামাজিক নাটক আখ্যা দেওয়া যায়। এই শ্রেণীর বাংলা নাটকের সংখ্যা কম হলেও এই ধরনের রচনা ক্রমশই বাড়ছে।

মন্মথ রায়ের সামাজিক নাটকগুলি স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রচিত। ১৯৩৮-এর পর থেকে দীর্ঘ চোদ্দ বছর জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে মন্মথ পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন নি। কিন্তু এই চোদ্দ বছরে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। পরিবর্তিত হয়েছে মন্মথ'র মনেরও। অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ মন হয়েছে অনেক স্থির, ধীর। যৌবনের আবেগময়তার বদলে তীক্ষ্ণ তীব্র যুক্তিবাদকে আশ্রয় করেছে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত অর্থাৎ স্বাধীনতা পরবর্তী কালে তিনি রচনা করেন চোদ্দটি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ। এর মধ্যে মমতাময়ী হাসপাতাল (১৯৫২), পথে বিপথে (১৯৫২) ছাড়া সবকটিই সাধারণ রঙ্গালয়ে ও নাট্যদলের দ্বারা অভিনীত হয়েছে। এই পর্বের নাটক সম্পর্কে নাট্যকারের অভিমত—"আমার পরবর্তী নাটকগুলি রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবধারার সঙ্গে অধিকতর সংযুক্ত না হয়ে পারেনি। কারণ যুগমানসকে উপেক্ষা করা নাট্যকারের ধর্ম নয়।" লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই সময়কার নাট্যরচনা অন্য কারো বা রঙ্গালয়ের অনুরোধে হয়নি—নিজের তাগিদ এবং স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনী ভাবনা থেকে এগুলির জন্ম। এই সময়ের নাটকগুলি তাই নাট্যকারের নিজস্ব মতবাদের বাহন হয়ে উঠেছে। এই সময়কালে রচিত নাটকগুলি সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়নি। সেজন্য এগুলি তেমন প্রচারও পায়নি। কল্পনার ঐশ্বর্য, ভাষার ইন্দ্রজাল, উদ্বেল হৃদয়াবেগ, বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব মন্মথর প্রথম পর্বের নাটক সৃজনে যে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল স্বাধীনতার পরবর্তী কালে সামাজিক অভিপ্রায়ে রচিত নাটকগুলির ক্ষেত্রে তা দেখা গেল না। এই পর্বের নাটকে বহির্জীবনের সমস্যাকেই মন্মথ প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি। নাট্যকারের দৃষ্টি এখানে ভাবমুগ্ধ নয়—তীক্ষ্ণ ও তির্যক। ভাষার গভীরতা কমে এসেছে। সংলাপ অনেকক্ষেত্রে হয়ে পড়েছে লঘু ও তরল। ফলে নাটকে অনেকক্ষেত্রে কমে গেছে ঘটনাবৃত্ত। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার পরিবর্তন ঘটেছে। নাটকে তার প্রতিফলিত হয়েছে। বৃহত্তর জাতীয় সমস্যা রূপান্তরিত হয়েছে ব্যক্তি সমস্যায়। ফলে কোনো গভীর কথা—সঠিক পথনির্দেশ—গভীর শপথ এই সময়কালের সৃজনের মধ্যে থেকে উঠে আসেনি। আভাসিত হয়নি বিশ্বজনীন আবেদনের দুর্লভ মুহূর্ত—যা রবীন্দ্র-নাটকের মহার্ঘ্য সম্পদ। শেষ পর্বে মন্মথ অনেকগুলি নাটক লিখেছেন মহাজীবনকে কেন্দ্রে রেখে বা দেশকালের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করে। নাটকগুলি তথ্যনিষ্ঠ ও সুসংবদ্ধ হয়েছে। এরই মধ্যে ঘটে গেছে যুদ্ধ, দেশবিভাগ, মন্বন্তর। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা এসেছে সামাজিক ও জাতীয় জীবনে নানা বিপর্যয়কে নিয়ে। দেশবাসীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে দেখা গেছে ভাঙন, বিপর্যয়। দলে দলে পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিমবাংলায় চলে এসেছে মানুষ। সমাজের অর্থনৈতিক ভিত গেছে ধসে। জামিদারি ব্যবস্থা বিলুপ্তির পাশাপাশি মধ্যস্বত্বভোগী মানুষ নানা বৃত্তি অবলম্বন করে বাঁচতে চাইছে। দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণ ঘটছে। কলকারখানা স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে

পুঁজিবাদী মালিকের শোষণ শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে। শ্রমিকরা সংগঠিত হচ্ছে। শ্রমিক আন্দোলনের প্রসার ও সাম্যবাদী নীতির প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে। সমাজ সম্পর্কে, জীবনযাপন সম্পর্কে, মূল্যবোধ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে শুরু করেছে। ফলে তার প্রভাব পড়ছে সাহিত্যকর্মে। নাট্যকাররা নাটকের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট করে তুলেছেন দেশের অর্থনীতি, অসাম্য, ধনবণ্টনের বৈষম্য, পুঁজিবাদী শোষণ কায়েমী স্বার্থের স্বরূপকে। চেয়েছেন মূর্খতা, অজ্ঞতা কুসংস্কারের অবসান ঘটাতে। এসময়কালে মন্মথ তাঁর সামাজিক সচেতনার দায়টি পালন করতে ভোলেননি। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত জীবিকার তাগিদে পত্রিকা সম্পাদনার কাজে যুক্ত থেকে জীবন সম্পর্কে আহরণ করেছেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, মুনাফালোভীদের অবাধ কালোবাজার, মানুষের অর্থনৈতিক দুর্গতি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, সমাজ রাষ্ট্র ও ব্যক্তিজীবনের অসংখ্য ভাঙাগড়া, প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন মন্মথর নাটক নির্মাণের ক্ষেত্রে এক নতুন আবিষ্কারের চমক জাগায়। এই পর্বে তাঁর যাবতীয় বিদ্রোহের লক্ষ্যবিন্দু ক্ষমতামত্ত ধনী শাসক শ্রেণী। নির্মোহ দৃষ্টিতে তিনি এই শ্রেণীর বিকৃত, অমানবিক কাজের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন তাঁর সৃজনের মাধ্যমে। স্বাধীন ভারতকে পুনর্গঠিত করার স্বপ্নে তাঁর সমাজতান্ত্রিক মননের প্রতিফলন ঘটেছে এ পর্বের নাটকে। অর্থনীতির ছাত্র উপলব্ধি করেছেন অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়া দেশ ও জাতি প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী হয় না। ফলে দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে সম-সময়ের প্রেক্ষাপটে গোটা দেশ ও জাতিকে রেখে তাঁকে চুলচেরা বিশ্লেষণে বসতে হয় বাস্তবজীবনবোধ সম্পন্ন এক সমালোচকের ভূমিকায়। অবশ্যই এক্ষেত্রে সবার ওপরে স্থান পায় মানুষ ও মানবতাবাদ। তাই এই পর্বের বেশ কিছু নাটকে পাই সমকালীন যুগের নতুন চেতনা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যা প্রচিলত জীবনের রূপান্তরের ইঙ্গিত দেয়—সংস্কারমুক্ত আধুনিক মননের নিরিখে। সবক্ষেত্রেই মন্মথ সেই বিশিষ্ট সামাজিক অভিপ্রায়ে চালিত।

মমতাময়ী হাসপাতাল

১৯৪৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'যোগাযোগ' চিত্রের কাহিনী অবলম্বনে ভারতবর্ষ পত্রিকায় ১৩৫৯- '৬০ বঙ্গাব্দে এ নাটকটি প্রকাশিত হয়। নাট্যকার এই নাটকের নামকরণ করেন 'মমতাময়ী হাসপাতাল'। ডাক্তার দীনদয়াল চৌধুরী মৃতা স্ত্রীর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে তাঁর নামে একটি হাসপাতাল তৈরি করেন—'মমতাময়ী হাসপাতাল'। দীনদয়ালের একমাত্র পুত্র কলকাতায় ডাক্তারী পড়ে। সে হঠাৎ পিতাকে জানায় সে বিবাহ করেছে, তার কিছু অর্থের প্রয়োজন। পিতা বধূ দেখতে আসতে পারেন ভেবে সে অর্থের বিনিময়ে একজন সম্ভাবনাময় চিত্রাভিনেত্রীকে একরাত্রির জন্য তার স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ করে। দীনদয়াল কলকাতায় এলেন। বধূরূপী জয়া মিত্রকে তার যেমন ভাল লাগল তেমনি জয়া মিত্রেরও এই আত্মভোলা বৃদ্ধটিকে ভালো লেগে গেল। সে বৃদ্ধ শ্বশুরের অনুরোধে তার সঙ্গে মদনপুর চলে এল। তারপর জুনিয়ার ডাক্তারের দুর্নিবার ক্ষমতা ও অর্থের

লোভ, দীনদয়ালকে উন্মাদে পরিণত করা থেকে নাটকে শুরু হয় জটিল পরিস্থিতি। কিন্তু নাটকের শেষে জটিল পরিস্থিতি মিলনান্ত পরিসমাপ্তি পায়। করুণ রসঘন অথচ মিলন মধুর কাহিনী বিন্যাসে, স্বচ্ছন্দ সংলাপে নাটকটির প্রথম অঙ্কের কৌতুককর ঘটনা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে আর দেখা যায় না। আত্মভোলা বৃদ্ধ দীনদয়ালের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল সৃষ্টি ও তাকে হেনস্থা করার দুঃখজনক নাটকীয় ঘটনা, ভূজঙ্গর হীনচক্রান্ত ও দীনদয়ালের অসহায়ত্ব বাস্তব বলে মনে হয় না। কিন্তু নাটকে অতি নাটকীয়তার প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও একথা মনে হয় যে নাট্যকার মানব জীবনের নষ্ট হয়ে যাওয়া মূল্যবোধগুলিকে ফিরিয়ে আনতে চান। সে কারণেই দেখি সামাজিক জীবনে মানুষের উপেক্ষা, বঞ্চনা, দুঃখ অভাবই যে মানুষকে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত করে এটি তিনি উপলব্ধি করেছেন ডাক্তার দীনদয়ালের মধ্যে দিয়ে। দীনদয়াল বলে : "যখনই খারাপ হয় তখন বুঝতে হবে লোকটির কোন ব্যাধি হয়েছে। ব্যাধিগ্রস্ত হলেই লোকে পাপকার্য করে, অসৎ হয়, হিংসুক হয়, কারো প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে, খারাপ কাজ করে। ব্যাধিটি সমূলে বিদূরিত হলেই লোক তার স্বাভাবিক সুন্দর মনোবৃত্তি ফিরে পায়। চোর অথবা খুনী কোন ব্যাধির প্রকোপেই চোর বা খুনী হয়েছে নতুবা হতো না।"

'মমতাময়ী হাসপাতাল' নাট্যকারের মৌলিক সৃষ্টি। প্রেম ও রোমান্সে গঠিত এক অপরূপ গল্পের নাট্যায়ন।

পথে বিপথে

মধ্যবিত্ত সমাজের পটভূমিতে বর্তমান সমাজের ভয়ঙ্কর বাস্তবরূপের নাটকীয় চিত্রায়ন। নাটকটি রচিত হয় ১২.৮.৫২ থেকে ১৭.৮.৫২'র মধ্যে। এ নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৬০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় সংখ্যার ' প্রবাসী'তে। নাটকটি তিন অঙ্কের। জীবন সমালোচক নাট্যকার এ নাটকে অবক্ষয়ী সমাজের অপসৃত মূল্যবোধ ও তার বিকৃতিব দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অর্থমোহ যে পৃথিবীর সব অনর্থের মূল—তা যে মানুষের স্নেহ ভালবাসা, মনুষ্যত্ব বিবেকের কণ্ঠরোধ করে, জীবন থেকে কেড়ে নেয় আনন্দ, মাধুর্য — রূঢ় বাস্তবের কঠিন ভূমিতে দাঁড়িয়ে কোনরকম ভাবালুতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে নাট্যকার এ সত্যটিকে নাটকের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন।

সংস্থার নাম 'আনন্দম' অথচ এই সংস্থার সভ্যরা নির্মমভাবে মানুষের আনন্দ হরণ করে। সংস্থার সভ্যরা ছাড়াও এ নাটকে অসাধু কারবারী মহিম ও জুয়াচোর প্রজাপতি আছে। এ নাটকের সবচেয়ে নৃশংস চরিত্র এ নাটকের নায়ক ভানু। সে রেস্টুরেন্টের মালিককে ঠকিয়েছে, মহিমের টাকা আত্মসাৎ করেছে, প্রজাপতির জামাকাপড় চুরি করেছে, স্ত্রীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে দুটি পতিপরায়ণা স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ হয়েছে। নাটকটিতে ঘটনার ঘনঘটা একটু বেশি বটে, তবু বিচিত্র কর্মকাণ্ডগুলি আদ্যন্ত চাপা উত্তেজনা জাগিয়ে রাখে। এইখানেই নাটকটির সার্থকতা। নাটকে রমা ও ছবি চরিত্র দুটি

তাদের নীরব সহিষ্ণুতা দিয়ে এবং ছবি চরিত্রটি বোবা হওয়া সত্ত্বেও তার নির্বাক প্রেমের আন্তরিক নিষ্ঠা দিয়ে আমাদের সহানুভূতি আদায় করে নেয়।

'পথে বিপথে' নাটকের মধ্যে দিয়ে বর্তমান সমাজের ভেঙে পড়া অর্থনৈতিক কাঠামো এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ মনুষ্যত্বের অবলুপ্তি নানান বিচিত্র ঘটনার মধ্যে দিয়ে একটি মানুষকে টেনে নিয়ে বর্তমান মধ্যবিত্ত মানবগোষ্ঠীর সমাজ-বন্ধনের অসারতা এবং ব্যর্থতার বেদনার যে চিত্র এঁকেছেন তা বাস্তব।

জীবনটাই নাটক

অভিনেতা অভিনেত্রীর জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাত পূর্ণ জীবন সমস্যার তীব্র সংকটময় রূপায়ণ 'জীবনটাই নাটক'। এ নাটকের রচনাকাল ১২.৯.১৯৫২ থেকে ২০.৯.৫২। এ নাটকে অভিনব এক আঙ্গিকের মাধ্যমে নাট্যকার মঞ্চশিল্পীদের জীবনবেদ আনন্দ ও বেদনার সংমিশ্রণে এঁকেছেন। শেক্সপীয়ারের সেই বিখ্যাত উক্তি—'জীবনটাই নাটক'কে মনে রেখে মঞ্চ ও জীবনের নাটকের মধ্যে আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়েছেন নাট্যকার। অভিনয় শিল্পীর জীবনের আনন্দ বেদনাকে অনবদ্যভাবে তুলে ধরেন দর্শকের সামনে। দর্শকের ঘনঘন মুগ্ধ করতালির নেপথ্যে ঢাকা পড়ে যায় তাদের বাস্তব জীবনের দুঃসহ বেদনা। শিল্পীদের কষ্টসাধ্য প্রাণান্তকর সাধনার খবর মানুষ রাখে না। রঙ্গমঞ্চের বাইরে যে তাদের একটা জীবন আছে, তারাও যে রক্তমাংসের মানুষ, তাদেরও যে হাসিকান্নায় মেশানো একটা জীবন আছে – নাট্যকার এ নাটকে সে জীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করতে চেয়েছেন। এ নাটকে শিল্পীদের বাস্তব জীবনের বিপর্যয় আর তাদের অভিনয় জীবনের কারণে ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষয়ক্ষতির বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণা এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার সমস্যাই এ নাটকের কেন্দ্রীয় সমস্যা। মঞ্চে শিল্পীদের চরম আর্থিক দুর্গতির দিনে নৈরাশ্যে ভেঙে পড়েনি কৃষ্ণা। সে এসেছে কলাবতী থিয়েটারে, যদিও তার স্বামী মণিমোহন পছন্দ করে না কৃষ্ণার থিয়েটারে যোগদান করাটা। অথচ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উদ্বুদ্ধ কৃষ্ণা চায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, নারীত্বের সম্মান ও মর্যাদা। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রাচীন সংস্কার ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে বলেই কৃষ্ণাকে বলতে শুনেছি : "বিনে মাইনেতে বাড়ীর দাসী করে রেখেছিলে আমাকে। সুখদুঃখের ভাগ দাওনি কোনদিন......আমার মন কি চায়, জিজ্ঞাসা করনি কোনদিন। ঘরের বাইরে বড় যে জগৎ, সে ছিল একা তোমার, আমার তাতে কোন ভাগ ছিল না।...... ঘর যাকে বলে তা তুমি কোনদিন করনি আমার সঙ্গে।" আত্মসম্মান নিয়ে, স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক যৌথ সহযোগিতার বিনিময়ে সে সুন্দর সুখী জীবন চায়—এই সুগভীর প্রত্যয় নাটকে উচ্চারিত। তবে অভিনয় জীবনের পৌরাণিক অংশটুকু এ নাটকে অতিরিক্ত প্রাধান্য না পেলেই ভাল হত বলে মনে হয়।

'জীবনটাই নাটক' ২৯শে জানুয়ারি ১৯৫৩-তে ছবি বিশ্বাসের পরিচালনায় মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল। প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক দেবকী বসু বলেছিলেন, "নাটকটি

রচনায় মন্মথবাবু যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন তা সম্পূর্ণ সার্থক।"

ঔপন্যাসিক মনোজ বসু বলেছেন, "বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রায় শতাব্দীব্যাপী অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে—এটা হল নবীনতম। আমার তো মনে হয়, এই নাটক থেকে মঞ্চের নতুন চেহারা ফুটবার সম্ভাবনা হল।" (নাট্যকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত)

লেখক প্রবোধ কুমার সান্যাল বলেছেন, "আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি আধুনিক কালে এ নাটকের তুলনা নেই।" (নাট্যকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে)

আজব দেশ

স্বাধীনতা পাবার পর ভারতের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসামঞ্জস্যের বিরুদ্ধে যে তীব্র ক্ষোভ নাট্যকারের মনে দানা বেঁধেছিল—তারই ফলশ্রুতি 'আজব দেশ'। নাটকটির রচনাকাল ১৯৫৩ সালের ১১ই এপ্রিল থেকে ১লা মে। 'দীপায়ন' পত্রিকায় নাটকটি প্রথম মুদ্রিত হয় পরে 'স্বদেশ' শারদীয়া সংখ্যা ১৯৫৪-তে পুণর্মুদ্রিত হয়। ১৯৮৫ সালের ১৮ই অক্টোবর আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে নাটকটির বেতার রূপও প্রচারিত হয়। ১৯৮৫ সালে এ নাটকের সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশিত হয় 'আলো চাই আরো আলো' নাম দিয়ে। এ নাটকের কাহিনী এক আজব দেশের কাহিনী। সে দেশের রাজা হবুচন্দ্র, মন্ত্রী গবুচন্দ্র। দেশবাসী পরমানন্দে দিন কাটায়। কিন্তু হঠাৎ এক ব্যক্তিকে নিয়ে বাঁধলো গণ্ডগোল – সে বাড়ি বাড়ি ঘুরে শুধু বলে 'আলো চাই'। নির্বোধ রাজার বুদ্ধিমান মন্ত্রীও পড়েন বিপদে। তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হল, কিন্তু সে কই? তাকে খুঁজতে গিয়ে ধরা পড়ল মন্ত্রীর নিপুণ হাতে সাজানো রাজ্যের দুর্নীতির ব্যাপারগুলো। আলো এসে অন্ধকার অপসৃত করল।

গণতন্ত্রের মুখোশ পরা ছদ্মবেশী ধনতন্ত্রের চেহারা, অযোগ্য নেতৃত্বে অপদার্থ শাসন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক বৈষম্যের বাস্তব ছবি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আর শাণিত শ্লেষের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। এ নাটকের কিষাণচাঁদ শোষিত মানব সমাজের প্রতিনিধি, যে বলে—"যারা সবার পিছনে থেকে, সবার নীচে দাঁড়িয়ে কুশিক্ষা, দারিদ্র্য আর অর্ধাশনে তিল তিল করে মরণের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে, যাদের শোষণ করে রাজ্যের মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীরা ক্রমশ ফেঁপে উঠছে......চাটুকার আর চক্রান্তবাজদের বেড়াজাল ডিঙিয়ে যাদের অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী মহারাজের কাছে পৌঁছতে পারে না আমি সেই শোষিত প্রজাকুলেরই একজন মহারাজ।" নাটকের পরিসমাপ্তিতে দেখি নাট্যকার মহান সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে হবুর রাজ্য ও সিংহাসন তুলে দিয়েছেন একজন সৎ দেশকর্মীর হাতে যথার্থ গণতন্ত্র ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কামনায়।

এ নাটকটি সম্পর্কে উৎপল দত্ত মন্তব্য করেছেন : "আজব দেশ তথাকথিত নব্য লেখকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় প্রগতিশীল নাটক কাকে বলে।"

নাটকটির শ্লেষ, অন্তর্নিহিত বেদনা, সংলাপ, নাটকের সাবলীল গতি, বলিষ্ঠ ইঙ্গিত –

সব মিলিয়ে বাংলা নাট্য সাহিত্যের এ এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।
এ নাটকটি ক্যাসুয়াল আর্টিস্ট ক্যালকাটা কর্তৃক অভিনীত হয়।

চাষীর প্রেম

কৃষক জীবনের পটভূমিতে লেখা হয়েছে 'চাষীর প্রেম' নাটকটি। এ নাটকের রচনাকাল ১৯৫৩ সালের ২২শে মে থেকে ২৩শে জুন। 'রঙ্গালয়' শারদীয়া সংখ্যায় ১৩৬০ বঙ্গাব্দে এ নাটক প্রথম প্রকাশিত হয়। পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় 'উত্তরায়' ১৩৬০ সালেই।

দরিদ্র চাষী অর্জুনের জীবনের করুণ কাহিনী নিয়ে এ নাটকের আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে। অর্থের প্রয়োজন অর্জুনকে এক বাঈজীর বাজনদারে পরিণত হতে বাধ্য করে। ক্রমে সে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং নিজের স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে ত্যাগ করে কলকাতায় চলে যায়। অর্জুনের পরিত্যক্তা স্ত্রী দুর্গা শিশুপুত্র লক্ষ্মণকে নিয়ে অত্যন্ত কষ্টে জীবন যাপন করতে থাকে। পরে অর্জুন বুঝতে পারে যে সে ভুল করেছে—প্রবঞ্চিত হয়েছে, তার আর ফেরবার পথ নেই। তাই সে প্রতিহিংসায় বাঈজীকে হত্যা করে।

পল্লীবাংলার সুখ দুঃখ হাসি কান্না, অভাব অভিযোগে ভরা কৃষক জীবনের ছবি নিপুণ বাস্তবতায় এ নাটকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, জমিদারের অত্যাচার, মহাজনের শোষণের ছবিও এঁকেছেন। নাট্যকারের রোমাণ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রামের কৃষকদের সম্পর্কে কিন্তু নতুন কৌতূহল সঞ্চার করতে পারেনি। নাটকের অর্জুন ও রচনাবাঈ-এর অংশে কিছুটা বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব দেখা যায়। কারণ মান-অভিমান, প্রণয়-ঈর্ষার যে জটিল সম্পর্ক তা দুটি চরিত্রকে ঘিরে যথার্থ শৈল্পিকরূপ পায়নি। ফলে রতনবাঈ-এর সামান্য অপমান সূচক কথাতেই অর্জুনের তাকে গলা টিপে মেরে ফেলা—ঘটনাটি অতিনাটকীয় মনে হয়। তবে সমাজ ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আসছে, সমাজের কাঠামো যে বদলাতে চলেছে এ নাটকে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন নাট্যকার। গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ার ফলে যে গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, চাষীকে বিকল্প কর্মসংস্থানের কথা ভাবতে হচ্ছে, চাষীর ছেলে চাষ না করে লেখাপড়া শিখছে—কৃষকের ভাঙা অন্ধকার ঘরে ঢুকছে শিক্ষার আলো—শিক্ষা চাষীকে নতুন মর্যাদাবোধ এনে দিচ্ছে—এসব কথা এ নাটকে বলা হলেও কিন্তু তা নাট্যকাহিনীর সঙ্গে সমন্বিত হতে পারেনি। শুধু কথার কথা হয়েই থেকে গেছে। এর অতিরিক্ত কোন আধুনিক জীবনবোধ এ নাটকে প্রকাশ পায়নি।

ধর্মঘট

শ্রমিক জীবনের পটভূমিতে লেখা নাটক 'ধর্মঘট'। রচনাকাল ১৯৫৩ সালের ৭ই আগস্ট থেকে ২১শে আগস্ট। শ্রমিক মালিকের সংঘাত এই নাটকের বিষয়। শ্রমিকদের শ্রমে দীনবন্ধু চৌধুরীর ছাতার কারখানা লাভের অঙ্কে ফুলে ফেঁপে বিরাট হয়েছে। কিন্তু

দীনবন্ধু চৌধুরী হীন ষড়যন্ত্র করে ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংঘবদ্ধ ধর্মঘট সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে কিভাবে ভেঙে দিতে গিয়েছিল এবং বেপরোয়া শ্রমিক মানুষগুলি কিভাবে সেই হীন ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল সেই সংঘাতপূর্ণ কাহিনীই এ নাটকের উপজীব্য। কিন্তু শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য শোষিত নিপীড়িত মানুষ যে কিভাবে মোকাবিলা করে এ সম্বন্ধে নাট্যকার সুস্পষ্ট সচেতনতা দেখাতে পারেননি। শ্রমিক নেতা ইব্রাহিম ও জনার্দনের চরিত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার মত ধৈর্য, সংযম, বুদ্ধি, কর্তব্যবোধ, দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বলিষ্ঠ মানসিকতা নাট্যকার সফলভাবে চিত্রিত করতে পারেননি। কিন্তু একটি অতি আধুনিক সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাতের জন্যে অবশ্য নাট্যকার সাধুবাদ পাবেন। তবু একথা বলতেই হবে এ নাটক রচনার পূর্বে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পাঁচটা বছর কেটে গেছে, কেটে গেছে বহু মানুষের 'স্বাধীনতা' নামক বস্তুটির প্রতি মোহ।

মালিক দীনবন্ধু, দালাল হারাণ তাদের শ্রেণীবৈশিষ্ট্য নিয়ে এ নাটকে সুন্দরভাবে হাজির। জনার্দন যখন বলে তার কন্যা মায়া তার আবাল্য সঙ্গী লালমিঞাকে বিয়ে করতে পারে কারণ সে এখন সাবালিকা—এই উদার ঘোষণা বাংলা নাটকে নতুন দিক উন্মোচন করে। জনার্দন বিশ্বাস করে শ্রমিকের কোন জাত নেই। মন্মথ রায় নাট্যকার হিসেবে সব সময়ই সমকালীন থাকার চেষ্টা করেছেন। মন্মথ গভীরভাবে বিচিত্র কর্মসূত্রে জীবনকে দেখেছেন ; দেখেছেন বিচিত্র মানুষ—একক ও দলবদ্ধ। সেই মানুষগুলি তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, মুগ্ধ করেছে এবং ক্ষুব্ধও করেছে। তাঁর বিশ্বাসকে, উপলব্ধিকে তিনি প্রতিফলিত করেছেন নাটকে। ঐক্যবদ্ধ না হলে জোরদার প্রতিরোধ গড়ে ওঠে না—এটা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। এ নাটকেও তিনি সে প্রমাণও রেখেছেন।

৯.১২.৫৩ সালে 'বহুরূপী' নাট্য সম্প্রদায় 'রঙমহলে' 'ধর্মঘট' নাটকটি অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু তার আগে কলকাতা ট্রাম শ্রমিক প্রগতি সংঘের প্রযোজনায় অমর গঙ্গোপাধ্যায়-এর নির্দেশনায় এ নাটকটি অভিনীত হয়েছিল।

আনন্দবাজার (১৯৫৭) পত্রিকা লিখেছিল : "ধর্মঘট শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বিধায়ক একটি অপূর্ব নাট্য সৃষ্টি। চরিত্র, ঘটনা সংস্থাপন এবং সংলাপই শুধু নয়—'Mob Play' বলতে যা আমরা বুঝি এ নাটক তারই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।"

সাঁওতাল বিদ্রোহ

কোম্পানি রাজত্বের অঙ্গ হিসাবে যখন এদেশে দেখা দিল একদল রক্তচোষা জমিদার, নীলকুঠির সাহেব, দালাল, মহাজন, সরকারি আমলা, দারোগা এবং এদের সকলকে নিয়ে কোম্পানির আমলে যে অভিনব নির্যাতন ব্যবস্থা সৃষ্টি হল তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবেই সাঁওতাল বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক সত্যই নাটকটির অনুপ্রেরণা। নাট্যকার সাঁওতাল বিদ্রোহের পেছনে যে রাজনৈতিক কারণ তাকে

এড়িয়ে গিয়ে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাটিকে বিচার করেছেন। যুগযুগান্ত ধরে ধনিক, বণিক, মালিক, মহাজন শ্রেণী--সাঁওতাল শ্রমিক, মজুরদের শোষণ করে, ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে। তাদের জীবন থাকে ক্ষুধা, অভাব, নৈরাশ্য নিপীড়নের অন্ধকারে ঢাকা। পাঁচটি দৃশ্যের এই নাটকের মধ্যে দিয়ে তিনি সেই শোষিত শ্রেণীর ঘর্মাক্ত জীবনের ছবি এঁকেছেন অনুসন্ধানী মন নিয়ে। তাদের বঞ্চনার ইতিহাসকে, তাদের ওপর অত্যাচারের স্বরূপকে ক্ষোভের আগুনে তাতিয়ে নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে মহাবিপ্লবের ডাক দিয়েছেন। কিন্তু গান্ধীবাদ বনাম মার্কসবাদের দ্বন্দ্বে নাট্যকার তখনও নিশ্চিত কোন চরম পথের সন্ধান পাননি। অথচ নাটকের প্রতিটি ঘটনা, বিদ্রোহের সংগ্রামপূর্ণ ছবি, মুক্তিলাভের জন্য সাহসী সাঁওতালদের অদ্ভুত আত্মত্যাগ সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। শোষিত সর্বহারা শ্রেণীর প্রতি তাঁর একান্ত সহানুভূতি না থাকলে, জন্মে নয় -- কর্মেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার--এ বোধ তাঁকে নাড়া না দিলে তিনি এ নাটক লিখতে পারতেন না। কোনও মানুষই হীন নয়, অবহেলিত সাঁওতালদেরও রয়েছে মনুষ্যত্বের উপলব্ধি আর এই উপলব্ধিই এক নতুন শক্তি সঞ্চার করেছে এই নাটকে। তাঁর নাটকে সিধো কান্‌হ হয়ে গেছে সিধু, কানু। কিন্তু তারা যে ভাষায় নাটকে কথা বলেছে, "সর্দার হামারা সাঁওতাল, হামারা ছোট না আছে। বড়দের সাথে হোক লড়াই হামরা জিতব।" --তা জীবনানুগ যথাযথ হয়নি। চরিত্র চিত্রণও সবক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়। ভৈরব সম্পর্কে রাধার মনোভাবও স্পষ্ট নয়। মানিকের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবার জন্য ভৈরবের প্রতি তার ভালবাসা না ভালবাসার অভিনয় তা ঠিক বোঝা যায় না। নাট্যকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারেননি। ইতিহাসের সিধো কান্‌হ তাদের সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে এক জ্বলন্ত বিদ্রোহ। কিন্তু বিপ্লব ও সংগঠনের কোন ধারণাই তাদের চরিত্রে নাট্যকার ফুটিয়ে তোলেন নি। অথচ তাদেরই হাতে তুলে দিয়েছেন একটি গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব। বাস্তবতাবর্জিত এই পরিকল্পনা আবেগমিশ্রিত দেশপ্রেমের ফলশ্রুতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে গণ-অভ্যুত্থানের ব্যাপারটি নাটকে গুরুত্ব হারিয়েছে।

বঙ্কিম ঘোষের পরিচালনায় রঙমহলে 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' অভিনীত হয়।

অমৃত অতীত

অষ্টম শতাব্দীর গৌড়বঙ্গের পটভূমিতে এই নাট্যকাহিনীর বিস্তার। ১৯৫৯-এ গর্দ্ধব নাট্যগোষ্ঠীর অনুরোধে মন্মথ রায় নাটকটি রচনা করেন। নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে 'বহুরূপী' পত্রিকার নবম সংখ্যায়। নাটকটি অতিরিক্ত দৃশ্য সমন্বিত হয়ে ১৯৬৪ সালে আবার প্রকাশিত হয়। নাটকের ভূমিকা অংশে নাট্যকার বলেছেন, "শতবর্ষব্যাপী অরাজকতায় অতিষ্ট হইয়া গৌড়বঙ্গের প্রজাপুঞ্জ অষ্টম শতাব্দীতে গোপালদেবকে পরিত্রাতা মনে করিয়া তাঁহাকে গৌড়বঙ্গের রাজা নির্বাচন করে--এই ঐতিহাসিক ভিত্তিতে নাটকটি পরিকল্পিত হইয়াছে। অবশ্য একমাত্র গোপালদেব ভিন্ন

অন্য চরিত্রগুলি আমার কল্পনা প্রসূত।" মন্মথ নাটকের ভূমিকা অংশে বলেছেন, এই নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর গৌড়বঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈ বহু তথ্য নিয়েছেন দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎবঙ্গ', রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলার ইতিহাস' এবং নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থ তিনটি থেকে। নাটকটির নামকরণের ব্যাপারে তিনি তরুণ নাট্যকার গিরিশঙ্করের ঋণও স্বীকার করেছেন।

মাৎস্যন্যায়ে ক্লিষ্ট অরাজক দুর্নীতিগ্রস্ত রাজা গোপালদেব জনগণের সাহায্যে কিভাবে প্রজা শোষণের সমাপ্তি ঘটিয়ে একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রের সূচনা করলেন--সেই কাহিনী নিয়েই গড়ে উঠেছে এ নাটক। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এ নাটকটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, যে উপন্যাস বা নাটক কোন সুপরিচিত ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে রচিত এবং যার মধ্যে এমন কোন কাল্পনিক দৃশ্য নেই যা ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধী, সেটিই ঐতিহাসিক নাটক বা উপন্যাস বলে গৃহীত হবার যোগ্য। অথচ এ নাটকে অষ্টম শতাব্দীর ঐতিহাসিক পটভূমির মধ্যেই এসেছে ধর্মঘট, সহ-অবস্থান নীতি, খাদ্য ও ঔষধে ভেজাল প্রভৃতি আধুনিক প্রসঙ্গ--যা নাটকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি। তাছাড়া এ নাটকে ব্যবহৃত বিদ্রূপাত্মক লঘু সংলাপ নাটকের ঐতিহাসিক আবহ সৃষ্টিতেও ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। ড. অজিতকুমার ঘোষ তাই এ নাটকে 'কালানৌচিত্যদোষ' ঘটতে দেখেছেন, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এ নাটকে "রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকের আঙ্গিকের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু এ নাটক ঐতিহাসিক ও রূপক নাটকের সীমারেখা ঘুচিয়ে কোন বৃহত্তর রূপ পরিগ্রহ করেনি। নাটকের নামকরণ প্রসঙ্গে ড. অজিত কুমার ঘোষ বলেন, "নাটকের প্রকৃত নাম বোধহয় 'অ-মৃত অতীত'--যে অতীত মরে নাই, যাহার মাৎস্যন্যায় বর্তমান সমাজের মধ্যেও সর্ব্বব্যাপী আকারে দেখা দিয়াছে।" (বাংলা নাটকের ইতিহাস) বাংলার মধ্যযুগের প্রথম গণ-বিদ্রোহের নেতা গোপালদেবের উত্থান কাহিনী ও সুশাসনে তার উদ্যোগ তারই কাহিনী 'অমৃত অতীত'।

বর্তমান সমাজের পটভূমিতে ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষিতকে নাট্যকার যদি রূপকের আঙ্গিকে দেখেন, তাতে নাট্যকারের পরীক্ষা প্রবণতাই ফুটে ওঠে। এ নাটকে ইতিহাসের উপাদান সামান্য। প্লটের বাঁধুনি দৃঢ়। রানীকে কেন্দ্র করে কৃতান্তক ও গোপালদেবের মধ্যে দ্বন্দ্ব অত্যন্ত বাস্তব। তা ঐতিহাসিক পরিণামকে সঠিক অবস্থানে পৌঁছে দেয়। এ নাটকের প্রধান চরিত্র রানী। তিনি গোপালদেবের কাছে ইন্দিরা আর কৃতান্তকের কাছে মক্ষিরাণী। এ চরিত্র নাট্যকারের কল্পনা প্রসূত। রানী চরিত্রটির জটিল আচরণ শেষ পর্যন্ত নাটকের ঔৎসুক্য রক্ষা করেছে। নাটকের প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম সর্গের স্থান জীর্ণ অট্টালিকায় গুপ্তগুহা প্রকোষ্ঠে। দ্বিতীয় সর্গ ভাস্কর শ্রীমানের শিল্পকক্ষ। চতুর্থ সর্গ জীর্ণ পরিত্যক্ত অট্টালিকার সভাকক্ষ। মানুষের ইতিহাস বোধজনিত চিরন্তন যে কৌতূহল, তথ্যজ্ঞানের সঙ্গে উচ্চকল্পনা শক্তির সংমিশ্রণ, কাহিনীর দৃঢ় সংবদ্ধতায় এবং শক্তিশালী সংলাপের সাহায্যে নাট্যকার 'অমৃত অতীতে'র কাহিনীকে সুবিন্যস্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন।

১৯৬০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি 'রঙমহলে' 'গন্ধর্ব' নাট্যসংস্থা এ নাটকের অভিনয় করেন। পরবর্তী কালে নাটকটির সংক্ষিপ্ত রূপের পরিবর্ধন ঘটিয়ে নাট্যকার যখন এ নাটকের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সর্গে অতিরিক্ত দুটি দৃশ্য সংযোজন করেন তখন সেটি ১৯৬৪ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি ক্রান্তি শিল্পী সংঘের শিল্পীদের দ্বারা 'মিনার্ভা'য় অভিনীত হয়।

বন্দিতা

১৯৫৯ সালে মন্মথ নাটকটি লেখেন এবং বিশ্বরূপা নাট্য পরিকল্পনা মুখপত্র মার্কারিতে ৫.৫.৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কুমারী মাতৃত্বের চিরন্তন সমস্যাকে 'বন্দিতা'য় তুলে ধরেছেন নাট্যকার। নাটকের ঘটনাকাল ১৯৪১। কাশীধামের বাঙালী টোলায় গান্ধীপন্থী মধ্যবয়সী এক অধ্যাপক থাকেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত সমবায় আন্দোলনের প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেছেন। অধ্যাপকের নাম সত্যশরণ রায়। লোকশিক্ষা দানে তাঁর আগ্রহ প্রবল। তাঁর স্ত্রী কৃপাময়ী কলহপরায়ণা। 'বন্দিতা' তাঁদের একমাত্র কন্যা — অষ্টাদশী, সুন্দরী। বাবার কলেজেরই ছাত্রী। সেই কলেজেরই কোন এক ছাত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে বন্দিতা কুমারী অবস্থাতেই সন্তান সম্ভবা হয়। কিন্তু বেকারত্বের জন্য সেই ছেলেটি অর্থাৎ রমেশ এই দায়িত্ব স্বীকারে অপারগ হয়ে দূরে চলে যায়। 'বন্দিতা' নারীত্ব ও মাতৃত্বের দ্বন্দ্বে যখন সমস্যার অথৈ সাগরে তখন তার পাশে একরাশ ভালবাসা নিয়ে এসে দাঁড়ায় সুরেশ। সে সমস্ত জেনেও বন্দিতাকে ভালবাসে। বন্দিতা কুমারী অবস্থাতেই সেই মাতৃত্বকে স্বীকার করে নেবার মত মানসিক দৃঢ়তা লাভ করে। অধ্যাপক পরিবার দার্জিলিং চলে আসার পর 'বন্দিতা'র কন্যা সন্তান জন্মায়। প্রায় আঠারো বছর পর অধ্যাপক বন্দিতা, বন্দিতার কন্যা নন্দিতাকে নিয়ে বারাসাত চলে এলেন। সেখানে সতেরো বছরের নন্দিতার সঙ্গে জটিল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে বিবাহ হল পার্থর—মহাজন কুবের সরকারের ছেলের। নাটকীয় ঘটনার মধ্যে দিয়ে অধ্যাপকের মৃত্যু হয় ; হঠাৎই নন্দিতার পিতা রমেশের আবির্ভাব ঘটে। কাহিনী একটা তৈরি করা সমাধানে পৌঁছয়। রবীন্দ্রনাথের সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে মতাদর্শ ও বন্দিতার জীবনের জটিল সমস্যাকে নাট্যকার একসঙ্গে মিলিয়েছেন — যেটা খুব বাস্তব হয়ে ওঠেনি।

পাঁচটি দৃশ্যে নাটকটি বিধৃত। কাশীতে সত্যশরণ রায়ের উপবেশন কক্ষ প্রথম দৃশ্য ; দ্বিতীয় দৃশ্য দার্জিলিং ; তৃতীয় দৃশ্য বারাসত ; চতুর্থ দৃশ্য কুবের সরকারের বাড়ী ; পঞ্চম দৃশ্য বারাসাত। প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যটি প্রথম বছরের ঘটনা এবং অন্য দৃশ্যগুলি সতেরো বছর পরের ঘটনাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে।

গান্ধী ও রবীন্দ্র প্রভাবে সৃষ্ট সত্যশরণ চরিত্রটি চমৎকার ফুটেছে। নাটকের পঞ্চম দৃশ্যে বন্দিতার গোটা জীবনের ভুলটাকে সংশোধন করে দেবার জন্য নাট্যকার একটি মিলন দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। অবশ্য নন্দিতা এবং বন্দিতা—উভয়ের জীবনের সংকটকে সামাজিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার ফলে শেষ পর্যন্ত নাটকীয় ঘটনায় ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ হয়েছে।

বন্যা

নাটকটির রচনাকাল ১৯৬১, দামোদরের বন্যা এসে যখন গ্রামের ঘরবাড়ি, গবাদি পশু সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল তখন দিগন্তবিস্তারী জলের মাঝখানে দ্বীপের মত জেগে থাকা একটি স্কুলবাড়িতে আশ্রিত বন্যার কবলে পড়া অনেক অসহায় মানুষের বিচিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহ, দ্বন্দ্ব-স্নেহ ভালবাসার টুকরো টুকরো ছবি এ নাটকের বিষয় হয়েছে। সমাজের নানা অংশ থেকে আসা এই মানুষগুলি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু এই বিপর্যয় তাদের ভেতরকার প্রবৃত্তিগুলিকে পালটাতে পারেনি। নাট্যকার নিপুণভাবে সেই গল্প আমাদের বলেছেন এবং নাটকীয়তায় বাস্তবকে তুলে ধরেছেন। মানুষের জীবনের পাপ, পুণ্য, আলো ও অন্ধকার যে অদ্ভুত সহাবস্থান করে সেই ছবি এঁকেছেন। নাটকের পটভূমিটি চমৎকার। সুন্দর ও অসুন্দরকে পাশাপাশি রেখে সুন্দরতর দিকের দিকে যাবার ঝোঁকটি নাট্যকারের রয়েছে। তাই দেখি, এ নাটকে দারোগা ও ডাকাতের মত নীচ ও ভয়ঙ্কর চরিত্র যেমন আছে, তেমনি আছে পরহিতব্রতী হেডমাস্টার মশাই ও করুণাময়ী মা-লক্ষ্মীর মত চরিত্র। এছাড়া জজ-সাহেব, মহাজন, গায়েন, গায়েন বৌ-এর মত জটিল রহস্যাবৃত চরিত্রগুলো কাহিনীর নাটকীয়তা বাড়িয়েছে। ছোট ছোট ঘটনার আবর্তে গাঁথা এ নাটকের মূলধারার অনিবার্য পরিণতি গড়ে ওঠেনি। নাটকের সংলাপের মাধ্যমে প্রকৃতির ভয়াল বিপর্যয়ের ছবিটি সঠিক প্রতিফলিত হতে না পারলেও নাট্যকারের মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যখন দ্বিতীয় যুবক বলে, "মরতে বসে আমরা সবাই সমান" অথবা "আগেকার সমাজ এখানে নেই। আগেকার সমাজ এইখানে এই বানে ডুবে গেছে। সেই প্রলয় থেকে নতুন করে বেঁচে উঠেছি আমরা। গড়ে তুলেছি সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে একটা নতুন সমাজ, স্কুলবাড়ীর এই দ্বীপটিতে।"

১৯৬৩ সালে অভিনেতৃ সংঘ রবীন্দ্র সদনে এটি প্রথম অভিনয় করে।

দুর্গেশনন্দিনীর জন্ম

১৯৬৩ সালে রচিত এই নাটকটি মন্মথ রায় 'বনফুল'কে উৎসর্গ করেন। ১৮৬২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চব্বিশ বছর বয়সে খুলনায় থাকাকালীন 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা করেন। ১৮৬৫ সালে এটি প্রকাশিত হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখার কিছু আগে ও কিছু পরের ঘটনা এই নাটকটিতে দুটি অঙ্কে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম অঙ্কে দেখি ১৮৬২ সালে খুলনা শহরে হাকিম বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় এক সন্ধ্যা। দ্বিতীয় অঙ্ক ১৮৬৪ সালের সেপ্টেম্বরের এক সন্ধ্যা। 'সংবাদ প্রভাকর'-এ তখন 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রশস্তি প্রকাশিত হয়ে গেছে। এ নাটকের চরিত্র হলেন বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী রাজলক্ষ্মী, ভাই পূর্ণচন্দ্র এবং বন্ধু নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র—মূলত এঁরাই নাটকের প্রধান চরিত্র। জমিদার সামসুদ্দিন চৌধুরী চরিত্রটি নাটকের একমাত্র উল্লেখযোগ্য কাল্পনিক চরিত্র।

এ নাটকে নাট্যকার 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার সমসাময়িক কালটিকে চমৎকার পরিস্ফুট

করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখক ও ম্যাজিস্ট্রেট দুইরূপ এবং একই সঙ্গে ভাই বন্ধু ও স্বামী হিসেবে যথাক্রমে পূর্ণচন্দ্র, দীনবন্ধু ও রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি চমৎকার ফুটে উঠেছে। নাটকটিতে 'দুর্গেশনন্দিনী' বলতে কাকে বোঝাচ্ছে—আয়েষা না তিলোত্তমা এ প্রশ্নটিরও একটি উত্তর খোঁজার চেষ্টা আছে। অন্য তথ্যাদি সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলীর বঙ্কিম পরিচিতি থেকে নেওয়া হয়েছে। ১৯৬৩ সালে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে এ নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

তারাস শেভচেঙ্কো

১৯৬৫ সালের ১৬ই জুন থেকে ৬ই জুলাই-এর মধ্যে নাটকটি রচিত হয়। ইউক্রেনের বিপ্লবী জনকবি তারাস শেভচেঙ্কোর জীবন এ নাটকের বিষয়। তিনি সামান্য এক ভূমিদাসের ঘরে জন্মগ্রহণ করে নিজের সাধনা এবং প্রতিভায় দেশবরেণ্য চিত্রকর ও কবিরূপে জার আমলের রাশিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। অকথ্য অত্যাচার, সাইবেরিয়ায় নির্বাসন কোনও কিছুই তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। তিনি ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেন গোটা রাশিয়ায়। জার-এর শাসনে নিপীড়িত অত্যাচারিত এই জীবনশিল্পীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই রশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা বন্ধ হতে বাধ্য হয়। ১৯৬৪ সালে সমগ্র বিশ্বে, বিশেষত সোভিয়েত দেশে তাঁর দেড়শততম জন্মবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। সেখানকার উৎসবে ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার যান এবং কলকাতায় ফিরে ভারত সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির এক সভায় তিনি তাঁর আশ্চর্য জীবনী বর্ণনা করেন। এই আশ্চর্য জীবনকাহিনী শুনে নাট্যকার তাঁকে নিয়ে এই পূর্ণাঙ্গ নাটকটি লিখবেন ঠিক করেন। এই নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি যে দুটি গ্রন্থ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন সেগুলি হল — 1) Mazim Rylsky এবং Alexzander Deutsch প্রণীত TARAS SHEVCHENKO.

2) TARAS SHEVCHENCO : Selected works compiled by the Ukrainian Shevchenko Jubilee Committee. (Moscow Progressive Publishers.)

'রুশভারতী' পত্রিকার ১ম বর্ষ, ১ম ও ২য় (মে-আগস্ট ১৯৬৫) যুক্ত সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। কলকাতা প্যাভলভ ইনস্টিটিউট এবং ভারত সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির সদস্য বন্ধুদের সামনে এটি প্রথম পাঠাভিনয় হয় ৬.৭.৬৫-তে পাভলভ ইনস্টিটিউটে।

নাট্যকার নিজে এ নাটকটিকে জীবনী নাটক বলেছেন কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য আলাদা করে 'জীবনী নাটক'—এই বিভাজন-রীতিটি অনুসরণ না করে এই নাটকটিকে সামাজিক নাটকের শ্রেণীতে রাখা হল। যদিও এ নাটকে নাট্যকার তারাস শেভচেঙ্কোর সমসাময়িক কালের প্রেক্ষাপটে তাঁর জীবনকেই মুখ্যত বর্ণনা করতে চেয়েছেন নানান চরিত্র ও ঘটনার সমবায়ে এবং তাতে সফলও হয়েছেন। এর সঙ্গে এ নাটকে জারের আমলের রাশিয়ায় বিপ্লব ও সেখানকার মানুষের কথাও চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। আটটি পর্বে বিভক্ত এ নাটক। প্রথম পর্বের সূচনা ১৮৮১ সালে কেনেভ

শহরের উপকণ্ঠে তারাস শেভচেঙ্কোর সমাধিস্থলে। সেখানে পাহারারত দুই পুলিশের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার ফিরে গেছেন ১৮৩৮ সালের জারের আমলের রাশিয়ায় শেভচেঙ্কোর জীবদ্দশার সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার দিনগুলোতে। 'ফ্ল্যাশব্যাক' পদ্ধতির আশ্রয়ে নাট্যকার বিপ্লবী কবি ও চিত্রকরের জীবনকাহিনীকে মালার মত গেঁথেছেন। অষ্টম পর্বে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে প্রথমপর্বে শেভচেঙ্কোর সমাধিস্থলে। এ নাটকে ব্যবহৃত শেভচেঙ্কোর কবিতা ও গান ('রুশভারতী' পত্রিকা সংস্করণে ব্যবহৃত) ইংরাজী অনুবাদেই রাখা হয়েছে। নাট্যকাহিনীর শৈল্পিক উৎকর্ষের জন্য নাট্যকার এ নাটকে কয়েকটি কাল্পনিক চরিত্রের আমদানি করেছেন। 'দশরূপক' নাট্য সংস্থা ১৯৬৫ সালে 'মির্নাভা' থিয়েটারে এটি অভিনয় করেন। এ নাটকটি সম্পর্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'রাশিয়া ভ্রমণ' গ্রন্থে (১৫৭ পৃঃ) লিখেছেন : "ইউক্রাইনের বিখ্যাত লেখক শেভচেঙ্কোর জীবন নিয়ে একটি নাটক বাংলায় রচনা করেছেন মন্মথ রায়। কলকাতায় সেটি অভিনীতও হয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যখন কিয়েত শহরে সফরে গিয়েছিলেন সেখানে এক জনসভায় তিনি মন্মথ রায়ের ঐ নাটকটির কথা উল্লেখ করেছিলেন দুই দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধনের উদাহরণ হিসেবে। নাট্যকার মন্মথ রায় এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ঐ সুকীর্তিটির জন্য বাঙালী হিসেবে আমি বেশ খাতির পেতে লাগলুম।" ইউক্রাইন ও বাংলার সেতুবন্ধন হিসেবেও এ নাটকটি ইতিহাস হয়ে রইল। মন্মথ রায় এ নাটকটির জন্য সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহরু সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেন।

লালন ফকির

মন্মথ রায় ১৯৭০ সালে এই নাটকটি রচনা করেন। ভূমিকা অংশে নাট্যকার স্বীকার করেছেন যে এ নাটক রচনা করতে গিয়ে তাঁকে লালন ফকির সম্বন্ধীয় অনেক কিংবদন্তীর সাহায্য নিতে হয়েছে। কারণ লালনের সঠিক জীবনেতিহাস এখনও অলিখিত। তাই তিনি এ বিষয়ে স্পষ্ট বলেছেন : "আমার এই নাট্যকাহিনী কিছুটা ইতিহাস, কিছুটা কিংবদন্তী। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে নদীতে নিক্ষিপ্ত হবার পর লালনের স্মৃতি লোপের কাহিনীটি আমার কল্পিত। তিনি এও স্বীকার করেছেন যে কোনো কোনো চরিত্রের নামকরণ এবং ঘটনার বিন্যাসে তিনি কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের দুই শ্রেণীর মানুষকে কেন্দ্রে রেখে এক অঙ্কে দশটি দৃশ্যে এ নাটক লেখা হয়েছে। আবেগপ্রধান নাটক। জীবনী নাটকের ছক মেনেই লেখা। জাতপাত ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লালনের মতাদর্শ এ নাটকে পরিস্ফুট হয়েছে।

লালনের জীবন নিয়ে তিনি আরো দুটি নাটক লিখেছেন। প্রথমটির নাম 'লালনামৃত', দ্বিতীয়টির নাম 'লালন ফকির'। দুটি নাটকেরই চরিত্র ও ঘটনা প্রায় এক, তবে 'লালন ফকির' নাটকটি খানিকটা সংক্ষিপ্ত ও কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক ভাষায় লেখা। লালনের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে তাঁর গ্রামবাসী, আত্মীয়স্বজন ও শিষ্যভক্তদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যকেই এ নাটকে উপকরণ হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছে। নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া

মহকুমার ভাঁড়ারা গ্রামে ১৭৭৪ খৃঃ লালনের জন্ম এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে। তিনি ১১৬ বছর বেঁচে ছিলেন। ১৮৯০ খৃঃ তাঁর দেহান্তর ঘটে। তাঁর উপাধি ছিল কর, মতান্তরে দাস। শৈশবেই তিনি বাবাকে হারান। অতি অল্প বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। অল্প বয়সেই একবার পায়ে হেঁটে তিনি পুরীধামে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন ; রাস্তায় তাঁর বসন্ত রোগ হলে দলের লোকেরা তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। নাট্যকার এই অংশে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে কাহিনীটিকে সামান্য বদলেছেন। লালনের বসন্ত হলে আত্মীয়রা তাঁর অজ্ঞান অবস্থাকে 'মৃত' অবস্থা মনে করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। ভাসতে ভাসতে তিনি একসময় একটি নিঃসন্তান মুসলমান পরিবারে আশ্রয় পান। কিন্তু তখন তাঁর পূর্ব-স্মৃতি ও একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেই পরিবারে লালিত হয়ে সিরাজ সাঁই নামে এক মুসলমান ফকিরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং অনেকদিন পরে যখন তাঁর পূর্ব-স্মৃতি ফিরে আসে তখন তিনি যখন নিজগৃহে নদীয়ায় ফিরে আসেন তখন তাঁর মা ও স্ত্রী তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তিনি সম্পূর্ণ সংসারে মায়া কাটিয়ে গুরুর কাছে ফিরে আসেন এবং গুরুর আশ্রম কুষ্ঠিয়ায় গোরাই নদীর ধারে সেঁউরিয়ায় তিনি শেষজীবন পর্যন্ত থাকেন। দশটি দৃশ্য সমন্বিত এই নাটকটির সূচনা হয়েছে নদীয়া জেলার কুষ্ঠিয়া মহকুমার ভাঁড়ারা গ্রামে লালন করের গৃহ-প্রাঙ্গণে। দ্বিতীয় দৃশ্যে রসুলপুর গ্রামের গঙ্গার তীরবর্তী পথ, তৃতীয় দৃশ্যে মুরশিদ জোলার বাড়ি, চতুর্থ দৃশ্যে লালনের গৃহ, পঞ্চম দৃশ্যে মুরশিদের গৃহ, ষষ্ঠ দৃশ্যে নবদ্বীপের রাসের মেলা, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম দৃশ্যে সেঁউড়িয়ায় গোরাই নদীর তীরে লালনের আশ্রম প্রাঙ্গণে নাটকের ঘটনাবলীকে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন নাট্যকার। চরিত্রগুলি মোটামুটি যথাযথ। তবে এটি কুষ্ঠিয়ার আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত হওয়ায় অনেকে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ এনেছেন এবং নাট্যকারও সেই কারণে তা বদলে "বাংলার চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করে নিতে পারেন" এমনও বলেছেন। কিন্তু তাতে কি চরিত্রগুলির স্বাভাবিকতা বজায় থাকবে? এক্ষেত্রে দর্শককেই সচেতন ও আগ্রহী হতে হবে। প্রয়োজনে তো যশোহরের ভাষায় 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' বুঝতে হয়, 'বাহে' ভাষায় বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন'কে উপলব্ধি করতে হয়। অবশ্য 'লালন ফকির'— ভাষা পরিবর্তনের স্বাধীনতা সত্ত্বেও কিন্তু বহু অভিনীত হয়নি। যাঁরা এর প্রশংসা করেছেন তাঁরা কুষ্ঠিয়ার ভাষা সমেতই করেছেন।

এ নাটক কলামন্দিরে রূপকার গোষ্ঠী প্রথম অভিনয় করেন ৩রা জুন সন্ধ্যা ৭টা, ১৯৭০। 'সংহতি' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা ১৯৭১-তে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এ নাটকের মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন রেবা দেবী, গীতা দত্ত, কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃপ্তি মিত্র, সবিতাব্রত দত্ত।

আঠার-শ বাহাত্তর

১৯৭২-এর ১৫ই মে থেকে ২৪শে মে এই নাটকের রচনাকাল। রূপমঞ্চ আষাঢ় সংখ্যায় ১৯৭২-এ এটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭২-এর

ডিসেম্বরে।

১৮৭২ সালে ৭ই ডিসেম্বর কলকাতায় 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে প্রথম যে বাংলা সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারই নাটকীয় ইতিবৃত্ত নিয়ে '১৮৭২' পূর্ণাঙ্গ নাটকটি রচিত হয়। এ নাটক লেখার উৎসাহ ও প্রেরণা নাট্যকার পেয়েছেন 'রঙ্গসভা'র শিল্পীদের কাছ থেকে—'লেখকের কথা' অংশে এ স্বীকৃতি পাই।

পঞ্চম দৃশ্য সমন্বিত এ নাটকের শুরু হয়েছে পটলডাঙার মল্লিক বাড়িতে। বাসন্তী পূজা উপলক্ষে পটলডাঙা নাট্য সমিতির বিদ্যাসুন্দর অভিনয় উপলক্ষে কৌতূহলী জনতার ভীড়, প্রতিক্রিয়া ; দ্বিতীয় দৃশ্যে হাইকোর্টের কর্মচারী গোবিন্দ গাঙ্গুলীর বাড়িতে শ্যামবাজার নাট্যসমাজের নাটক মহলার আসরের ছবি, তৃতীয় দৃশ্যে বাগবাজারের বোসপাড়ায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের বসবার ঘরে অমৃতলাল, গিরিশচন্দ্র, শিশির কুমার ঘোষ, মনোমোহন, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির কথোপকথন, চতুর্থ দৃশ্যে ১৮৭২ সালের ৬ই ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারের মঞ্চে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' অভিনয়। পঞ্চম দৃশ্যে অভিনীত 'নীলদর্পণ'-এর অন্য একটি দৃশ্যের অভিনয়। অভিনয় দর্শনে বিদ্যাসাগরের প্রতিক্রিয়া, রোগ সাহেবকে চটি জুতা ছুঁড়ে মারা গিরিশচন্দ্র ঘোষের ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রত্যাবর্তন—ন্যাশনাল থিয়েটার গড়ে উঠবার নেপথ্যে যে ইতিহাস তাকে দৃশ্য পরম্পরায় সাজিয়েছেন নাট্যকার মন্মথ রায়। এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সচেতন ও তথ্যানুগ ভূমিকা পালন করেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের কিছুটা অংশ এ নাটকে নাট্যকার ব্যবহার করেছেন ১৮৭২ সালের ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা ঘটনাটিকে আরো বাস্তব করার জন্য।

১৯৭২ সালের ১৭ই নভেম্বর শুক্রবার পঞ্চাশ মিনিটের এক সংক্ষিপ্ত বেতার নাটকরূপে আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে এ নাটকটি প্রচারিত হয়। এর আগে ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে 'রঙমহল' থিয়েটারে 'রঙ্গসভা'র শিল্পীরা সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় এ নাটক অভিনয় করেন।

সমাজজীবনে ঘটে যাওয়া বিশিষ্ট ঘটনা, মহান ব্যক্তিজীবন নিয়ে মন্মথ একাধিক নাটক লিখেছেন। এগুলিকে 'সামাজিক' পর্যায়ে রেখেই আলোচনা করা হল। কারণ সমাজকে বাদ দিয়ে মানুষ এবং ঘটনা কোনওটির বাস্তব অস্তিত্বের ভূমি থাকে না।

মহাউদ্বোধন

১৯৬৩ সালে এ নাটকটি লেখা হয়। প্রথম প্রকাশ 'সংহতি' মাসিক পত্রিকার ৩০ বর্ষ / বৈশাখ সংখ্যা ১৩৭০। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের প্রথম দিককার ঘটনা এখানে নাট্য কাহিনীসূত্রে বিবৃত। যুবক নরেন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবন, রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যলাভ এবং তারপরে সমস্ত সংশয় দ্বিধার অমানিশা দূর হয়ে তাঁর শরণাগত হওয়াতেই নাটকের সমাপ্তি। চরিত্র সংখ্যা ১৮। ৬টি দৃশ্যে সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীমা

নাটকের সূচনাপর্বেই মন্মথ উল্লেখ করেছেন এটি শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ লীলা নাটক। ১৯৫৫ সালে লেখা। 'লীলা' নাটক কথাটির মধ্যেই অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে এ নাটকের ভক্তিরসাত্মক প্রেক্ষিতটি। সাতটি দৃশ্য সমন্বিত নাটক। সারদামণি জীবনকথা সুন্দর ফুটে উঠেছে এ নাটকে। কুড়িটি চরিত্র কাহিনীকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। প্রথম দৃশ্য জয়রামবাটি, কাল ১২৭৮ চৈত্র। দ্বিতীয় দৃশ্য দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গারতীরে রামকৃষ্ণের কক্ষ ; তৃতীয় দৃশ্য দক্ষিণেশ্বরের নহবতখানা ; চতুর্থ দৃশ্য রামকৃষ্ণের কক্ষ ; পঞ্চম দৃশ্য শ্যামপুকুরের বাড়ি ; ষষ্ঠ দৃশ্য কাশীপুর উদ্যান বাটিকা এবং সপ্তম দৃশ্যে কাশীপুরে রামকৃষ্ণের কক্ষে অসুস্থ রামকৃষ্ণ—দেহান্তর। 'শুধু এ ঘর থেকে ও ঘর'—সারদামণির এই উপলব্ধিতে নাটকের সমাপ্তি। প্রতিটি চরিত্র যথাযথভাবে চিত্রিত হয়েছে। এ নাটকটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩৬২ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় ছাপা হয় এবং কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়।

শরৎ বিপ্লব

২২শে জুন থেকে ৫ই জুলাই ১৯৭২ এর রচনাকাল। শরৎচন্দ্রের বাণীর উল্লেখ রয়েছে নাটকের সূচনাপত্রে।—"এই ৩১শে ভাদ্র বছরে বছরে ফিরে আসবে, কিন্তু একদিন আমি আর আসব না। সেদিন কারো বা ব্যথার সঙ্গে মনে পড়বে, কারো বা নানা কাজের ভিড়ে স্মরণ হবে না।" মন্মথ শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে তাঁর জীবনচরিত নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রচারের লক্ষ্যে এ নাটক রচনা করেন। নাটকটি ১৩৮২ শ্রাবণ সংখ্যা 'নবকল্লোলে' প্রকাশিত হয় এবং পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে রবীন্দ্র লাইব্রেরী। শরৎচন্দ্র বহু দেশবরেণ্য মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন। কিন্তু নাট্যকার শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন, সাহিত্যজীবন এবং রাজনৈতিক জীবনের প্রধান ঘটনাগুলিকে সমন্বিত করে এ নাটক লিখেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন এ নাটক লেখার সময় তিনি ড. অজিত কুমার ঘোষের 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার', ড. শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শরৎচেতনা' এবং শ্রী গোপালচন্দ্র রায়ের 'শরৎচন্দ্র' ১ম খণ্ডের সাহায্য নিয়েছেন। নাটকটিতে ২৮টি চরিত্র আছে। ৭টি দৃশ্য। নাটকটির আরম্ভ ১৯০৭ সাল থেকে। ঘটনাস্থল শরৎচন্দ্রের কর্মভূমি রেঙ্গুনে। পঞ্চম দৃশ্য থেকে ঘটনাস্থল ভারতবর্ষে (১৯১৬)—বাংলাদেশে-শিবপুরে-সামতাবেড়ের বাড়িতে। শরৎচন্দ্রের অন্তিম পরিণতিতে নাটকের সমাপ্তি।

অমরপ্রেম

নাট্য দিক্‌পাল অমরেন্দ্রনাথ দত্তের জীবন ভিত্তিক নাটক, নাট্যকার যাকে বলেছেন 'থিয়েটারের থিয়েটার'। পঞ্চদশ দৃশ্য সমন্বিত নাটক। চরিত্র সংখ্যা স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ। স্টার থিয়েটারে চন্দ্রশেখর নাটকের অভিনয় দেখে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

অভিনেতৃ জীবনে যোগ দিতে চাইলেন। সূচনা হল তাঁর অভিনয় জীবনের। তাঁর বিস্তৃত নাট্যজীবন পরিক্রমার ইতিহাস এখানে মন্মথ অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এ নাটকের যেটি বৈশিষ্ট্য তা হল অমরেন্দ্রনাথ অভিনীত বহু নাটকের অংশ এখানে সংযোজিত করেছেন মন্মথ। নাটকের শেষ হয়েছে 'সাজাহান' নাটকে ঔরংজীবের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে হঠাৎ তার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ার ঘটনার মধ্যে দিয়ে।

ডাঃ সরকার

নাটকটির রচনাকাল ১৫.১০.৮৬ থেকে ১৭.১১.৮৬। ৪টি অঙ্কের নাটক। সূচনাতে একটি 'প্রস্তাবনা' অংশ রয়েছে। চরিত্রসংখ্যা স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে ১৮টি। প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক (পরে এ্যালোপ্যাথিক) মহেন্দ্রলাল সরকারের জীবন অবলম্বনে লেখা। তিনি রামকৃষ্ণ দেবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। এ নাটকে মন্মথ মহেন্দ্রলাল সরকারকে শুধুমাত্র একজন বিখ্যাত চিকিৎসক রূপেই নয়, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বহুগুণের আধার হিসেবেই তুলে ধরেছেন। এ নাটকেরও সমাপ্তি ঘটেছে ডাঃ সরকারের প্রয়াণে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশকেই বাংলা সামাজিক নাটকের একটি রূপ চোখে পড়ে। সামাজিক নাট্যচিত্র, সামাজিক নক্‌শা নাটক, সমাজ সংস্কারমূলক বিদ্রূপাত্মক প্রসহন থেকেই এ যুগের নাট্যকারদের বিশেষ ধরনের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাম নারায়ণ তর্করত্নের সামাজিক নাট্যচিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহের সামাজিক নক্‌শা নাটক, মধুসূদনের প্রহসন দুটি, দীনবন্ধুর প্রহসন ও নাটক—এই সামাজিক নাটকের গতিপথ নির্দেশ করছে। সমসাময়িক দেশকালের পটভূমিকায় রচিত এই যুগের নাট্য প্রচেষ্টাগুলি থেকে সে যুগের সমাজ জীবনের একটি নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়। দীনবন্ধুর পর গিরিশচন্দ্রই মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরের কথাকে অনেক বেশি বাস্তবসম্মতভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু সে জীবন এত একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন যে তাতে নাটকীয় বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য গিরিশচন্দ্রকে জাল জোচ্চুরি, মারামারি, বীভৎস হত্যা, মদ্যপ চরিত্রের আমদানি, প্রতারণা, সম্পত্তি হরণ ইত্যাদি অতি নাটকীয় ব্যাপার নাটকে আমদানি করতে হয়েছিল। ফলে তাঁর অধিকাংশ সামাজিক নাটকেই নাটকের সূক্ষ্মরস নষ্ট হয়ে যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল সামাজিক নাটক লিখেছিলেন কিন্তু তাতে তিনি রোমান্টিক নাটকের কলাকৌশলই অবলম্বন করেছিলেন। ফলে সামাজিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে কোনো নতুন দিক নির্দেশ করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সামাজিক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র নির্দেশিত পথই পরবর্তী নাট্যকাররা অনুসরণ করেছিলেন। এরপর বিধায়ক ভট্টাচার্য তাঁর সামাজিক নাটকে সমাজ সমস্যাকে শুধু স্পর্শই করেননি, সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেছেন। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অয়স্কান্ত বক্সী, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, যোগেশ চৌধুরী, জলধর চট্টোপাধ্যায়, বনফুল সামাজিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম।

যুদ্ধ, মন্বন্তর দেশ বিভাগের ফলে বাঙালীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। পূর্ববঙ্গের অসহায় মানুষদের বাস্তু ত্যাগ, খোলা রাস্তায়, স্টেশনে, তাঁবুতে অভাবনীয় জীবনযাপন ভয়ঙ্কর দুর্যোগের সূচনা করল। পারিবারিক আদর্শেরও পরিবর্তন ঘটল। সমাজে নারী জীবনের সম্পর্কে ধ্যান ধারণারও পরিবর্তন ঘটল এবং নাটকের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, চরিত্রগুলিরও বদল ঘটল। নাটকে নতুন চিন্তাধারা, নতুন কথা বলতে এলেন বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্মথ রায় এঁদের অনেক আগে নাট্যরচনা শুরু করলেও সামাজিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে এঁদের বেশ কিছুটা পরবর্তী কালের। নাটকে তিনি সব সময় সমকালীন থাকবার চেষ্টা করেছেন। তাই আধুনিক নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে পরিপূর্ণ আত্মিক যোগ রেখে তিনি তাঁর নাটকে প্রগতিমূলক চিন্তা ও আর্দশের ছাপ রাখতে চেয়েছেন। প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ কেমন করে পরিবর্তিত হয়ে এক একটি নতুন সামাজিক বিপর্যয় ঘটিয়ে তুলছে, তাই-ই তাঁর নাটকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সামাজিক দুর্নীতি ও গ্লানিকে তিনি বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধি ও মননশীলতার সঙ্গে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। আধুনিক ক্ষয়িষ্ণু সমাজের নানা বৈষম্য, রূঢ় অসঙ্গতি ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিপর্যয় ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনকে কতখানি বিপর্যস্ত করে—মন্মথ তাঁর সামাজিক নাটকে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। যদিও সামাজিক একাঙ্কগুলিতে তাঁর মননসমৃদ্ধ দৃষ্টি ও মর্মভেদী ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সাহায্যে প্রচলিত সামাজিক ধারণা ও মূল্যবোধকে তীব্রভাবে আক্রমণ করার প্রচেষ্টা অনেক বেশি সার্থক হয়েছে—তবু একথা স্বীকার করতে কষ্ট হয় না যে তুলনায় সামাজিক নাটকগুলি দুর্বল হলেও তাঁর প্রয়াস একেবারে অসফল হয়নি।

নাট্যকার মন্মথ রায় শিল্পী ও স্রষ্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতায় বিশ্বাসী থেকেছেন আজীবন। দুই-এর দশক থেকে আট-এর দশক এই দীর্ঘ সময় ধরে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন দেশের অসংখ্য ওঠানামা—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বলয়ে বিচিত্র টানাপোড়েন—পটপরিবর্তন। সময়ের সঙ্গে সব সময় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। ফলে তাঁর সমাজ চিন্তা, রাজনৈতিক দর্শন বিবর্তিত হয়েছে—দেশাত্মবোধক জাতীয়তাবাদী গান্ধীনীতি পরিবর্তিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসে। তাঁর নাটক রচনার সময়কালের মধ্যে স্পষ্ট দুটি পর্যায় বিভাজন করা যায় এই পরিবর্তনের সূত্ররেখাটি ধরে। প্রথম পর্যায়ের নাটক নির্মাণের (১৯২৭-১৯৩৮) মধ্যে অভিব্যক্ত দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদী ভাবনা, স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে এই পর্বের রচনাগুলির সব কটিই সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রয়োজনের তাগিদে লেখা, যে কারণে মন্মথকে 'দর্জি নাট্যকার' অভিধাও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না কালের দাবি মেনে দেশের ব্যাপকতম অংশের মানুষের চাহিদাকে মন্মথ মর্যাদা দিয়েছেন তাঁর নাটকে—জাতীয় সংকটের মোকাবিলার জন্য, জাতির দেশাত্মবোধের উন্মাদনাকে নাটক ও নাট্যশালায় প্রতিফলিত করার লক্ষ্যে। কাজেই প্রথম পর্যায়ের রচনা প্রয়োজনের তাগিদে হলেও নাট্যকার 'কাপড় অনুযায়ীই পোশাকটি তৈরি

করেছেন'—ইংরাজি প্রবাদের বাংলা করে এমনটিই বলতে হচ্ছে। কারণ নাটকগুলির মঞ্চ-সাফল্য একইসাথে জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব উন্মাদনা সঞ্চারের পাশাপাশি দেশের তৎকালীন শাসকশ্রেণীকেও যথেষ্ট বিচলিত করে তুলেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯৪৮-১৯৭২) মন্মথ অনেক বেশি জীবনের কাছাকাছি।

এ পর্বে নাট্যকারের সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি খানিকটা প্রতিবাদী ভূমিকায় নাটকগুলিতে অভিব্যক্ত। কারণ ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশবিভাগ জনিত অসহনীয় বিপর্যয়, উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, জমিদারী ব্যবস্থার বিলুপ্তি ও মধ্যসত্বভোগী মানুষদের অন্য বৃত্তি অবলম্বন করে বাঁচতে চাওয়া, স্বাধীন দেশে দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণ, শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার, সাম্যবাদী নীতির প্রভাব বৃদ্ধি—সমস্যা হিসেবে গোটা দেশের সৃজনশীল লেখক গোষ্ঠীর সামনে যখন এল তখন দায়বদ্ধ স্রষ্টারা যথাযথ ভূমিকা পালন করলেন। নাট্যকার মন্মথ রায়ও সে অঙ্গীকার পালন করলেন তাঁর এই পর্যায়ের সৃষ্টি সম্ভারের মাধ্যমে। তিনি তাঁর সব রচনাতেই মানুষের সংগ্রামী জীবন ও জীবনযাত্রা এবং মানুষের আত্মিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থিত থেকেছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেছেন সেই যুগসন্ধিক্ষণের মূল জাতীয় লক্ষ্য যেহেতু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা, সেই লক্ষ্য সামনে রেখে নাটক রচনা হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। সে কাজটিও তিনি আজীবন করেছেন। ১৯২৭-১৯৩৮ সাধারণ রঙ্গালয়-গুলিতে অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে তাঁর রচিত পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক বাতাবরণে লেখা আধুনিক মননের নাটকগুলি। সেযুগের বিখ্যাত নট এবং নাট্য নির্দেশকের সমৃদ্ধ অভিনয়ে এবং নির্দেশনায় সেগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ১৯৫২-১৯৭২ বিভিন্ন নাট্যদল অভিনয় করেছে তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের নাটকগুলি। সবগুলির প্রযোজনা তেমন উল্লেখযোগ্যতার সীমা স্পর্শ করতে না পারলেও একটি বিষয় আমাদেরকে প্রশ্নমনস্ক করে তোলে। তাহল সে যুগের বিখ্যাত নট নির্দেশক শিশির কুমার ভাদুড়ী কেন মন্মথ রায়ের নাটক অভিনয়ের জন্য বেছে নেননি বা আগ্রহ দেখাননি? নাট্যকারের জীবিতকালে সবিনয়ে সে প্রশ্ন রেখেছি কিন্তু সদুত্তর পাইনি। সে কারণ সন্ধানের ভার তোলা থাক পরবর্তী গবেষকদের জন্য। প্রশ্ন উঠেছে অন্য ভাবেও। প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের পুরোধা, নাট্যকর্মীদের প্রেরণা, অজস্র নাট্য সম্মানের প্রাপক, অগণিত (একাঙ্ক এবং পূর্ণাঙ্গ) নাটক রচয়িতা হিসেবে সম্মানিত ঋত্বিক মন্মথ রায়ের কোনো নাটক বর্তমানে কেন অভিনীত হচ্ছে না। কেন তার মধ্যে কয়েকটি কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মনে হয় মন্মথর ক্ষেত্রে বোধকরি এটিই সত্য যে, তাঁর রচনার গভীরতর তাৎপর্য যে সময়কালকে ঘিরে অর্থবহ হয়েছে—যে সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্য নিয়ে তার নির্মাণ হয়েছে তাতে তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যপূরণ হয়ত ঘটেছে, কিন্তু সে সৃজন আবহমান কাল ধরে চিরন্তন শাশ্বতবাণীরূপের বাহক হবার আধার হয়ে উঠতে পারেনি। কিংবা সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজেকে বারবার বদলেছেন বলে হয়ত উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী ধারার নাট্যকার হিসেবে

নিজেকে চিহ্নিত করতেও পারেননি। কিন্তু তাঁর আজীবন লালিত বিশ্বাসকে তিনি প্রোথিত করেছেন তাঁর নাটক সৃজনের মধ্যে। তিনি বিশ্বাস করেছেন এই সমাজ জীবনকে কখনই অবহেলা করতে পারে না আমাদের নাটক ও নাট্যশালা। তাই তাঁর কাছে নাটক আর বিলাস নয়, আত্মরক্ষার, মর্যাদা রক্ষার হাতিয়ার। এই হাতিয়ারটিকে তিনি সর্বদা শাণিত রেখেছেন—যে কোনও কালে, যে কোনও পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার জন্য এবং তিনি যথাযথ সময়োচিত ব্যবহারেই তার স্বাক্ষর রেখেছেন।

মঞ্চস্থ পূর্ণাঙ্গ নাট্য সারণি

নাটক	রচনাকাল	শৈলী	প্রথম অভিনয়	মঞ্চ	প্রযোজনা/পরিচালনা	অভিনেতা-অভিনেত্রী
চাঁদসদাগর	১৯২৭	পৌরাণিক	১৪.৯.২৭	মনোমোহন থিয়েটার	অহীন্দ্র চৌধুরী	অহীন্দ্র চৌধুরী, সুশীলা সুন্দরী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, নিভাননী, আশ্চর্যময়ী, কুঞ্জলাল সেন প্রমুখ
দেবাসুর	১৯২৮	পৌরাণিক	২৮.৪.২৮	মনোমোহন থিয়েটার	আর্ট থিয়েটার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	অহীন্দ্র চৌধুরী, নিভাননী, নীহারবালা, সুশীলাবালা, নরেশ ঘোষ, সন্তোষ শীল, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ
	১৯২৮	পৌরাণিক	৮.৬.২৯	স্টার থিয়েটার		অহীন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী চক্রবর্তী, তারকবালা, নীহারবালা, ঊষারাণী, সুশীলাবালা প্রমুখ
মহুয়া	১৯২৯	পৌরাণিক	৩১.১২.২৯	মনোমোহন থিয়েটার	প্রবোধচন্দ্র গুহ নির্মলেন্দু লাহিড়ী	নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল ঘোষ, ইন্দুবালা, সরযূবালা, গণেশচন্দ্র গোস্বামী প্রমুখ
কারাগার	১৯৩০	পৌরাণিক	২৪.১২.৩০	মনোমোহন ও নাট্যনিকেতন	সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)	নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভূমেন রায়, সরযূবালা, নীহারবালা, শেফালিকা প্রমুখ

নাটক	রচনাকাল	শৈলী	প্রথম অভিনয়	মঞ্চ	প্রযোজনা/পরিচালনা	অভিনেতা-অভিনেত্রী
সাবিত্রী	১৯৩১	পৌরাণিক	মে, ১৯৩১	নাট্যনিকেতন	নির্মলেন্দু লাহিড়ী	সন্তোষকুমার দাস, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুশীল মুখোপাধ্যায়, নিভাননী, নীহারবালা প্রমুখ
খনা	১৯৩২	পৌরাণিক	১১.৭.৩৫	নাট্যনিকেতন	ক্যালকাটা থিয়েটার্স অহীন্দ্র চৌধুরী	শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সরযূবালা, চারুবালা প্রমুখ
অশোক	১৯৩৩	ঐতিহাসিক	২.১২.৩৩	রঙমহল	রবি রায় নরেশ মিত্র	ভূমেন রায়, রবীন্দ্রমোহন রায়, নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, শান্তি গুপ্তা, রেণুবালা প্রমুখ
সতী	১৯৩৭	পৌরাণিক	২৮.৪.৩৭	নাট্যনিকেতন	ক্যালকাটা থিয়েটার্স নরেশ মিত্র	ভূমেন রায়, সন্তোষ দাস, মণি ঘোষ, রাণীবালা, আঙুরবালা প্রমুখ
মীরকাশিম	১৯৩৮	ঐতিহাসিক	১৯৩৮	নাট্যনিকেতন	সুধীর গুহ সতু সেন	ছবি বিশ্বাস, নরেশ মিত্র, সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলি, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, অমল বন্দ্যোপাধ্যায় নীহারবালা প্রমুখ
মমতাময়ী হাসপাতাল	১৯৫২	সামাজিক	১৭.৪.৪৩	শ্রী পূরবী পূর্ণ	সুশীল মজুমদার	কাননদেবী, রবীন মজুমদার প্রমুখ
জীবনটাই নাটক	১৯৫২	সামাজিক	২১.১.৫৩	মিনার্ভা থিয়েটার	ছবি বিশ্বাস	
আজব দেশ	১৯৫৩	সামাজিক			ক্যাজুয়াল আর্টিস্ট ক্যালকাটা	
ধর্মঘট	১৯৫৩	সামাজিক	৯.১২.৫৩	রঙমহল	কলকাতা ট্রাম শ্রমিক প্রগতি সংঘ/বহুরূপী/ শম্ভু মিত্র	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মহম্মদ জ্যাকেরিয়া, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, কুমার রায়, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলি প্রমুখ

নাটক	।	শৈলী	প্রথম অভিনয়	মঞ্চ	প্রযোজনা/পরিচালনা	অভিনেতা-অভিনেত্রী
শ্যামা	১৯৫৫	জীবনী নাটক	১৯৫৫	মিনার্ভা	কানু বন্দ্যোপাধ্যায়	
সাঁওতাল বিদ্রোহ	১৯৫৮	সামাজিক		রঙমহল	বঙ্কিম ঘোষ	
অমৃত অতীত	১৯৫৯	সামাজিক	১৩.২.৫৯	রঙমহল	গন্ধর্ব	শ্যামল ঘোষ, ইন্দ্র রায়, কণিষ্ক রায়, চন্দন রায়, কাজল চৌধুরী প্রমুখ
বন্যা	১৯৬১	সামাজিক	১৯৬৩	রবীন্দ্রসদন	অভিনেতৃ সংঘ	
মহাপ্রেম	১৯৬০	সামাজিক	১৬.১২.৬২	শ্রীমঞ্চ রঙমহল		
দুর্গেশনন্দিনীর জন্ম		১৯৬৩	১৯৬৩	বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন মঞ্চ		
তারাস শেভচেঙ্কো	১৯৬৫	া নাটক	১৯৬৫	মিনার্ভা	দশরূপক	রবীন্দ্রমোহন রায়, ভূমেন রায়, নরেশ মিত্র, অমর বসু, যোগেশ চৌধুরী, শান্তি গুপ্তা, রেণুবালা প্রমুখ
লালন ফকির	১৯৭০	জীবনী নাটক	৩.৬.৭০	কলামন্দির	রূপকার সবিতাব্রত দত্ত	সবিতাব্রত দত্ত, তৃপ্তি মিত্র, গীদা দত্ত প্রমুখ
আঠারো শো বাহাত্তর	১৯৭২	নাট্য ইতিহাস	১২.৯.৭২	রঙমহল	রঙ্গসভা তুষার ভৌমিক	তুষার ভৌমিক, কমল মুখোপাধ্যায়, চন্দন রায়, তাপস সাহা, ভোলা বসু, ছবি তালুকদার প্রমুখ



ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্সের নাটক □

ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্সের নাটক

মন্মথ রায়-এর নাট্যরচনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 'ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স'-(সি.এ.পি)-এর নামটি অনিবার্যভাবে জড়িয়ে আছে। তাই এ প্রসঙ্গে আলোচনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। মন্মথ রায় সি.এ.পি-র সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার সুবাদেই পরবর্তীকালে চিত্রকাহিনী লেখক ও চিত্রনাট্যকারে পরিণত হয়েছিলেন। এই সময়কাল (১৯৩৮) থেকে প্রায় একযুগ (১৯৫১) পর্যন্ত তাঁর কোন পূর্ণাঙ্গ নাট্য রচনার খবর পাই না। কিন্তু মন্মথর সৃজনশীলতা থেমে থাকেনি। সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে শখের থিয়েটারের জন্য বিনোদন-নাটক রচনায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। এ সময়ে তিনি মধু বসুর সঙ্গে আন্তরিক সখ্যতায় আবদ্ধ হয়েছিলেন যা সৃজনের ক্ষেত্রে নতুন দিকের সূচনা করেছিল। মধু বসুর নামটি মন্মথ রায়-এর সঙ্গে কিভাবে জড়িয়ে পড়েছিল তার একটা প্রাক্ কথনের প্রয়োজন আছে। মধু বসু চিত্রপরিচালক হিসেবে সুনাম অর্জনের আগে মূলত মঞ্চাভিনয় ও মঞ্চ পরিচালনায় বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছিলেন। ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স-এর সূত্রেই তিনি দর্শক মহলে পরিচিত হন।

এই শতাব্দীর মধ্য-ত্রিশে পেশাদার সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে সি.এ.পি. এক ব্যতিক্রম। শিক্ষিত মনন দিয়ে নাট্য প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথ এক ঋত্বিক। মধু বসু সে ব্যাপারে শিক্ষা ও সংযম গ্রহণের শিক্ষা নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। কাহিনী নির্বাচনে তিনি ভারতীয় পটভূমিকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর থিয়েটার যেহেতু স্বাধীনতার পূর্বেই চৌরঙ্গী অঞ্চলের ফার্স্ট এম্পায়ারে (এখনকার রক্সি সিনেমা) অভিনীত হত তাই প্রয়োগগত কলাকৌশলে তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক মানের কাছাকাছি।

মধু বসু প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসুর পুত্র। জামশেদপুরে টাটাদের অগ্রগতির নেপথ্যে এই ভূতত্ত্ববিদের নাম সোনার অক্ষরে লেখা আছে। মধু বসুর স্ত্রী সাধনা বসু ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের কেশবচন্দ্র সেনের পৌত্রী এবং ব্যারিষ্টার সরলচন্দ্র সেনের কন্যা। স্কুল কলেজে পাঠকালে তিনি রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকে অভিনয় করেন। সি.এ.পি. প্রযোজিত প্রথম রবীন্দ্র নাটক 'দালিয়া'তে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেন। আই.সি.এস জ্ঞানাঙ্কুর দে-র কন্যা মঞ্জু দে, সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিতা বধূ সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু অভিনেত্রী জন্ম লগ্ন থেকেই সি.এ.পি-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঠাকুর পরিবারের শিক্ষিতা মহিলাদের সঙ্গে অনেক অভিজাত ঘরের মহিলারা ইতিপূর্বে মঞ্চে অভিনয় করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের দ্বারা প্রকাশ্য রঙ্গ মঞ্চে নৃত্যাভিনয় প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম করেন। এই নৃত্যাভিনয়ের প্রবর্তনের মাধ্যমে তিনি নৃত্যকলাকে পরিপূর্ণ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। নৃত্য যে শুধু উত্তেজক আনন্দের উপায় মাত্র নয়—উন্নত সৌন্দর্যসম্মত শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যম, জীবনের গভীরতম সত্যের প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত এই নৃত্যাভিনয়ের মাধ্যমে তা

জানা গেল। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য গীতিনাট্যেরই সমগোত্রীয়। নৃত্য, নাট্য ও কাব্যের অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে তার নৃত্যনাট্যগুলিতে। এই সঙ্গে এটিও স্বীকার করতে হবে যে 'ইউরোপীয় অপেরা' এ বিষয়ে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল এবং তিনি তা দেশীয় কাহিনীর পটভূমিতে রেখে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রস্ফুটিত করেছেন।

মধু বসু এ বিষয়ে রবীন্দ্র প্রভাবিত হয়েও কিন্তু সি.এ.পি-র নাটকগুলিতে শুধু নৃত্যগীত বা লিরিকমুখ্য কাহিনী নয়, ঘাত-প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ নাটকীয় কাহিনীকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ ব্যাপারে অবশ্যই নাট্যকার মন্মথ রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। মানুষ তাই সি.এ.পি-র নাটকে খুঁজে পেয়েছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স-এর প্রতিষ্ঠা লগ্নে মধু বসুর প্রতিক্রিয়া লেখার মাধ্যমেই পেয়েছি তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে। মধু বসু লিখেছেন : "আমার এতদিনের স্বপ্ন যে আমাদের নিজেদের একটা নাট্য সম্প্রদায় হবে, যেখানে প্রগতিশীল অভিজাত বংশীয় ছেলেমেয়েরা এর সঙ্গে অভিনয় করবে, সেটাই আজ সফল হতে চলেছে।" তিনি প্রথমে ঠিক করেছিলেন এই নাট্য সংস্থার নাম হবে 'ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স'। কিন্তু সকলেই তাঁকে তখন পরামর্শ দেন যে 'অ্যামেচার' কথাটির উল্লেখ না থাকলে কেউই তাঁদের কন্যাদের এখানে পাঠাতে রাজী হবেন না। তাই নাম হল—'ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার্স' (সি.এ.পি)। অবশ্য প্রায় ছ' বছর পরে সেই নাম পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় 'ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স'।

১৯২৮ সাল থেকে সি.এ.পি দালিয়া, জেরিনা, মন্দিরা, সাবিত্রী, ওমরের স্বপ্নকথা, প্রযোজনার মাধ্যমে রসপিপাসু দর্শক সমাজকে মুগ্ধ করছিলেন। 'প্রহ্লাদের' পর 'আলিবাবা'র অভূতপূর্ব সাফল্যের মধ্যে দিয়ে সি.এ.পি' তার শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছে যায়। একই সাথে 'আলিবাবা' চলচ্চিত্রেও রূপান্তরিত হয়ে দারুন সাফল্য এনে দেয় মধু বসু, সাধনা বসু এবং 'সি.এ.পি'র জীবনে। নাট্যকার মন্মথ রায়ের সঙ্গে এই সময়েই যোগাযোগ ঘটে যায় মধু বসু ও সি.এ.পি-র।

মন্মথ রায়ের চারটি নাটক সি.এ.পি প্রযোজনা করে।

নাটক	প্রথম অভিনয়ের তারিখ	অভিনয়ের স্থান
সাবিত্রী	১লা মে ১৯৩৭	ফার্স্ট এম্পায়ার
বিদ্যুৎপর্ণা	৯ই অক্টোবর ১৯৩৭	ঐ
রাজনটী	৩০শে অক্টোবর ১৯৩৭	ঐ
রূপকথা	৩রা ডিসেম্বর ১৯৩৮	ঐ

FIRST

PHONE CAL.

COMMENCING

TO-DAY

AT 6-15



present

EMPIRE

CHOWRINGHEE PLACE,

AND ON

SUN., TUES., WED.

AND

THURS. AT 6-15

MANMATHA RAY'S

SAVITRI

&

Dream Songs of Omar Khayyam

(A LYRIC RHAPSODY IN DANCE & MUSIC)

Featuring

Sadhona Bose

Supported by:

RIBHUTI GANGULI · SATI DEVI · GOURI LAL · PRITI MAZUMDAR
KAMAL BISWAS · KALYAN MAZUMDAR and others

PRODUCED BY
MODHU ƀOSE

Plans open
at the
Theatre

MUSIC BY
TIMIR BARAN
(By courtesy of New Theatres Ltd.)

'সাবিত্রী'র বিজ্ঞাপন

সাবিত্রী

১৯৩১-এ সাধারণ রঙ্গালয়ে ইতিমধ্যে এই নাটক অভিনীত হয়েছিল (নাট্যনিকেতন মঞ্চে)। নাট্যকার মন্মথ পৌরাণিক খোলসের আবরণে আধুনিকতাকে স্পর্শ করতে পেরেছেন। এ নাটকের কাহিনী আমাদের চির-পরিচিত-বিধিলিপি অগ্রাহ্য করে সাবিত্রীর যমের কাছ থেকে মৃত স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনা। কিন্তু এ সাবিত্রী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে আধুনিক, তাই যুগোপযোগী। সাবিত্রীর মধ্যে দিয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে। ধনী দরিদ্রের বৈষম্যে, মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামে, অধিকার বোধ প্রতিষ্ঠায় 'সাবিত্রী' পৌরাণিক হয়েও তাই সমকালীন, আধুনিকা।

মধু বসুর লেখায় পাচ্ছি : "তখন নাট্যকার মন্মথ রায় আমাদের ওখানে প্রায়ই যাওয়া আসা করত। ......তার একটা নাটক 'সাবিত্রী' মঞ্চস্থ করবার জন্য আমরা স্থির করেছিলাম। ......১লা মে ১৯৩৭ হাউসফুল হল।" (আমার জীবন) নৃত্যগীত বহুল এ নাটকে নাম- ভূমিকায় ছিলেন সাধনা বসু। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেছিলেন বিভূতি গঙ্গোপাধ্যায়, সতী দেবী, গৌরীলাল, প্রীতি মজুমদার, কমল বিশ্বাস, কল্যাণ মজুমদার ও অন্যান্যরা। পরিচালনা করেছিলেন মধু বসু। সঙ্গীতে তিমিরবরণ। প্রযোজক সি.এ.পি।

বিদ্যুৎপর্ণা

মন্মথ রায়েরই লেখা একটি ছোটগল্প পড়ে মধু বসু তাঁকে দিয়ে এই নাটকটি লেখান 'সি.এ.পি'র জন্য। কাহিনী এইরকম :

বৈষ্ণব বিদ্বেষী এক শাক্ত নৃপতির ওপর প্রতিহিংসা নেবার জন্য বৈষ্ণব মোহান্ত এক সুশ্রী বেদের মেয়েকে ছোটবেলা থেকে তিল তিল বিষ খাইয়ে বিষকন্যায় পরিণত করেন। তার আলিঙ্গনে, চুম্বনে সর্বশরীরে বিষ। কিন্তু এ কথাটি বৈষ্ণব মোহান্ত ছাড়া আর কেউ জানতো না। মোহান্ত তাঁর শিষ্য শিষ্যাদেরও তাই বিদ্যুৎপর্ণার কাছ থেকে দূরে রাখতেন। কিন্তু শিষ্য ইন্দ্রজিৎ ও বিদ্যুৎপর্ণার মধ্যে এই দূরত্ব সত্ত্বেও গড়ে ওঠে গভীর ভালবাসা। বৈষ্ণব বিদ্বেষী সেই রাজা মোহান্তর নিমন্ত্রণে হৃষীকেশ মঠে আসেন। বিদ্যুৎপর্ণার চুম্বনে ও আলিঙ্গনে তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় বিদ্যুৎপর্ণা বুঝতে পারে যে সে বিষকন্যা। ইন্দ্রজিৎকে সে দূরে সরিয়ে দেয়। মন্দিরের বিগ্রহকে সে আপন করে নেয়।

৯ই অক্টোবর ১৯৩৭ সালে ফার্স্ট এম্পায়ার মঞ্চে এ নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। পরিচালনা করেন মধু বসু। নৃত্য পরিচালনা সাধনা বসু। ঐকতান নায়ক প্রতাপ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত অজয় ভট্টাচার্য, শিল্প নির্দেশক গীতা ঘোষ, মঞ্চাধ্যক্ষ সুশোভন বসু।

অভিনয় করেন :

বিদ্যুৎপর্ণা	:	সাধনা বসু
মোহান্ত	:	অহীন্দ্র চৌধুরী

ইন্দ্রজিৎ	মধু বসু
মঞ্জরী	মঞ্জু দে
ভদ্রকূট	বিভূতি গঙ্গোপাধ্যায়
গোকর্ণ	সুশান্ত মজুমদার
বিষ্ণু দাস	প্রীতি কুমার মজুমদার
রাজা	কালী ঘোষ
সেনাপতি	কল্যাণ মজুমদার
কৃতান্তক	সন্তোষ দাস
চরণদাস	অমিয় দাস।

ফার্স্ট এম্পায়ারে 'সি.এ.পি'-র 'বিদ্যুৎপর্ণা' দেখে পত্রপত্রিকা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে।

আনন্দবাজার পত্রিকা (১১.১০.৩৭) লেখে : " 'বিদ্যুৎপর্ণা' তাঁহাদের অপূর্ব কলাশক্তির আর একটি বিকাশ মাত্র।"

'স্বদেশ' (২১.১০.৩৭) লেখে : "অহীন্দ্র-সাধনা সম্মিলন যে কিরূপ আকর্ষণীয় হয়েছিল তার প্রমাণ ঐ হাউসে উপর্য্যুপরি কয়েকদিন অভিনয় হওয়াতেই পাওয়া গেছে। প্রযোজনায় মধু বসু কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এক দৃশ্যে তিনি নাটকখানাকে সুন্দর ভাবে বইয়ে নিয়ে গেছেন।"

'দিপালী' (১৮.১০.৩৭) লেখে : "মন্মথ রায় রচিত 'বিদ্যুৎপর্ণা' দেখিলাম। ......সাধনা বসু ও অহীন্দ্র চৌধুরীর অনবদ্য অভিনয় নৈপুণ্যে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

Amrita Bazar Patrika (10.10.37) লেখে : "......The author, Sj. Manmatha Roy, has remarkable literary ingenuinity."

Advance (11.10.37) মন্তব্য করে : "Vidyutparna has been the star success of the C.A.P from the point of view of dramatic excellence."

'যুগান্তর' নাটকটি সম্পর্কে লিখলো : "গ্রন্থকারের অপূর্ব সৃষ্টি। নাটকীয় ঘটনা সংস্থাপনায়, সংলাপ ও কল্পনার মনোহারিত্বে অভিনব।"

রাজনটী

নাট্যকার মন্মথ রায়ের কথায় পাই "আমার 'বিদ্যুৎপর্ণা' অভাবনীয় সাফল্যের সহিত অভিনীত হওয়ায় প্রযোজক মধু বসু উৎসাহিত হইয়া তাহাদের পরবর্তী নাটকের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করেন।" সেই নাটক এই 'রাজনটী'। ১৯৩৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর এর মধ্যে এটি রচিত হয়। 'নাটকের আখ্যায়িকাটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক'। শ্রীচৈতন্য দেবের তিরোধানের পর মণিপুরে যখন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হয়, এই নাটকের পটভূমি হিসেবে সেই কালটিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

রাজনটী 'বিদ্যুৎপর্ণা'র প্রায় অনুরূপ কাহিনী। রাজনটী মধুছন্দা ও যুবরাজ চন্দ্রকীর্তির

মধ্যে ভালবাসা গড়ে ওঠে। ওদিকে মণিপুরের রাজা জয়সিংহ তাঁর রাজ্যের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনে চন্দ্রকীর্তির সঙ্গে ত্রিপুররাজকন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। এই সময় নবদ্বীপ থেকে প্রভুপাদ ও কাশীশ্বর গোস্বামী মণিপুরে আসেন শ্রীগৌরাঙ্গের পদধূলি নিয়ে। উদ্দেশ্য, প্রকৃত বৈষ্ণবকে এই পদধূলি দিয়ে আশীর্বাদ করা। চন্দ্রকীর্তি সিংহাসন তুচ্ছ করে রাজনটীকে নিয়ে নির্বাসনে যেতে প্রস্তুত। রাজনটীর কাছে যুবরাজকে ভিক্ষা চান জয়সিংহ। রাজনটী চন্দ্রকীর্তির জীবন থেকে সরে আসে, জানায় এ প্রেম ছিল তার ছলনামাত্র। কাশীশ্বর মুগ্ধ হয়ে রাজনটীকেই শ্রীচৈতন্যের পদধূলি দিয়ে আশীর্বাদ করেন। কিন্তু রাজনটী বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

কাল্পনিক কাহিনী নিয়ে রচিত এই একাঙ্কটিতে চারটি অংশ আছে। স্থান মূলত একটিই, মধুছন্দার প্রাসাদোপম সৌধ ভবনে সুসজ্জিত নৃত্যশালা। ৩০.১০.৩৭ সালে মধু বসুর পরিচালনায়, সাধনা বসুর নৃত্য পরিচালনায়, তিমিরবরণের সুরে, অজয় ভট্টাচার্যের কথায় খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। এ নাটকের কলাকুশলী ছিলেন--

সঙ্গীত রচয়িতা	:	অজয় ভট্টাচার্য
শিল্প পরিচালক	:	গীতা ঘোষ
মঞ্চাধ্যক্ষ	:	সুশোভন গুপ্ত
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা	:	সাধনা বসু
অর্কেস্ট্রা	:	নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড
রূপসজ্জাকর	:	কালিদাস এবং শ্যাম
দৃশ্যপট	:	শ্রী ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স
মঞ্চ তত্ত্বাবধায়ক	:	সুনীত সেন।

চরিত্রলিপি :

মধুছন্দা	:	সাধনা বসু
রিয়া	:	শীলা দত্ত
কাশীশ্বর	:	অহীন্দ্র চৌধুরী
চন্দ্রকীর্তি	:	মধু বসু
জয়সিংহ	:	কল্যাণ মজুমদার
প্রিয়া	:	মঞ্জু দে
দ্বারী	:	বোকেন চট্টোপাধ্যায়
মহাকাল	:	বিভূতি গঙ্গোপাধ্যায়
আচংকা	:	প্রীতিকুমার মজুমদার
শ্রীকণ্ঠ	:	প্রতাপ মুখোপাধ্যায়
টায়া	:	কালী ঘোষ
নর্তকীগণ	:	সি.এ.পি-র নৃত্য সম্প্রদায়।

সি.এ.পি-র এই প্রযোজনা দেখে সে-সময়ের পত্র পত্রিকাগুলি 'রাজনটী'র প্রভূত

প্রশংসা করে।

নাটকের ভিতর দিয়ে গীতিকাব্য সৃষ্টি করবার অদ্ভুত যাদু সৃষ্টি করবার দক্ষতায় মন্মথ চিরদিনই সিদ্ধ হস্ত। এই নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্র বাস্তবতার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে এমন একটি মায়ালোকের ইশারা তৈরি করে যা আধুনিক যে কোনো নাট্যকারের পক্ষে বেশ কঠিন কাজ। নাটকটির গঠন কৌশল, ভাষা, ঘটনা সংযোজনা নাটকীয় প্রতিঘাত সমস্তই উল্লেখযোগ্যতার সীমা স্পর্শ করে।

Hindusthan Standard (13.3.38) লেখে ঃ "At a time when modern Bengali Literature was really in need of a good dramatist, Sj. Manmatha Roy appeared in this sphere with his keen insight into human nature and his extra ordinary talent in creating a truly dramatic situation in his character....In his book 'Rajnatee' Sj Manmatha Roy has once again exhibited his originality in this art. To those who complain of a dearth of suitable Bengali Dramas for amateurs we are glad to recommend this book with this hope that it will be received with the same kind of appreciation as it was the case in Calcutta when it was staged by the C.A.P."

আনন্দবাজার (৬.৩.৩৮) লিখলো : ".....ঘটনাবহুল বা বৈচিত্র্যময় নহে, একটি শান্ত সুন্দর কোমল ঘটনা লইয়া রচিত এই ক্ষুদ্র নাটকখানি কান্তরসে ভরপুর। রাজনটী ও যুবরাজের প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া, সঙ্গীতে, রূপে, ছন্দে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই ক্ষুদ্র সুলিখিত নাটকখানি এক অপূর্ব সৌন্দর্যে বিকশিত।"

দেশ (১৭ই বৈশাখ ১৩৪৫) লেখে : "......সুন্দর দৃশ্যপট ও সুললিত নৃত্যগীতের মধ্য দিয়া এই সুন্দর গল্পের স্রোত বহিয়া গেছে। এইদিক দিয়া বিচার করিলে নাটকখানিকে অপেরার শ্রেণীতে ফেলা যায়। অথচ ইহা পূর্ণাঙ্গ অপেরা নহে। চারিটি মাত্র দৃশ্যে সমাপ্ত একাঙ্ক নাটক।"

The Statesman (14.3.38) লেখে : "Again the combination of Sadhana Bose (as the court Dancer) and Ahindra Chowdhury (as the holy preceptor) curted the play, especially in the secne of renunciation in which both of their dramatic abilities rose to a high pitch."

রূপকথা

লেখকের কথায় পাচ্ছি "আমাদের কল্পলোকে যে রাজকন্যা বন্দিনী ছিল শ্রীযুক্তা সাধনা বোস ও শ্রীযুক্ত মধু বোসের আগ্রহে তাকে মুক্তি দিতেই আমাকে লিখতে হল এই 'রূপকথা'। কোন কোন সমালোচক এটিকে 'রোমাণ্টিক' নাটক বলেছেন। এই নাটকের কাহিনীটি এইরকম :

'কুবেরের বিধান ছিল যদি যক্ষ কোন মানবীর প্রেম লাভ করে তবেই সে অভিশাপ

মুক্ত হয়ে স্বর্গে যাবে। কিন্তু যক্ষ কোন মানবীরই প্রেম লাভ করতে পারে না। ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে বহু নারীকে তার প্রাসাদে বন্দী করে আনে এবং প্রেম লাভে ব্যর্থ হয়ে পাষাণী মূর্তিতে পরিণত করে রাখে। এক রাজকন্যাও এইভাবে পাষাণী হয়। তার প্রণয়ী যক্ষের কবল থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধারের জন্য যায়। এক বন্দিনী যক্ষের মনোবেদনায় তাকে ভালবাসে ; যক্ষ অভিশাপ মুক্ত হয়। রাজপুত্র রাজকন্যাকে খুঁজে পায়।

এ নাটকে রূপকথার যাবতীয় উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। রাজপুত্র, রাজকন্যা, যক্ষ, সোনার কাঠি, রূপার কাঠি, প্রাণভোমরা, পক্ষিরাজ ঘোড়া, রাক্ষস, খোক্কস ইত্যাদি সব। নামকরণটি সুপ্রযুক্ত। মরুপ্রান্তরে দৈত্য নির্মিত পাষাণপুরীতে তিনটি অংশে নাটকটি বিবৃত। মধু বসুর প্রস্তাবে যক্ষরাজের ভূমিকাটি করেন অহীন্দ্র চৌধুরী। চরিত্রটি গুরুগম্ভীর নয়, হালকা হাস্যরস প্রধান, কিন্তু নতুনত্ব ছিল। এ সম্বন্ধে অহীন্দ্র চৌধুরীর বক্তব্য : "রূপকথায় অভিনয় করে আমিও আনন্দ পেয়েছিলাম আর দর্শকরাও খুশি হয়েছিলেন।" (নিজেরে হারায়ে খুঁজি)

মধু বসুর পরিচালনায়, সাধনা বোসের নৃত্যে, অজয় ভট্টাচার্যের কথায় ও সুরে এ নাটক অভিনীত হয় ৩.১২.৩৮-এ।

শিল্প পরিচালক	:	গীতা ঘোষ
দৃশ্যপট শিল্পী	:	হেমন্ত গুপ্ত, সুধাংশু চৌধুরী
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা	:	সাধনা বসু
রূপসজ্জাকর	:	শ্যাম ও হামিদ

প্রথম রজনীর কুশীলবগণ :

রাজকন্যা	:	সাধনা বসু
সোনা	:	রীনা বসু
রূপা	:	মধু বসু
	:	বোকেন চট্টোপাধ্যায়
	:	সুশান্ত মজুমদার
হসন্ত	:	বিভূতি গঙ্গোপাধ্যায়
দৈত্য (অভিশপ্ত যক্ষ)	:	অহীন্দ্র চৌধুরী
কবন্ধ	:	কালী ঘোষ
মুক্তা	:	শেফালী দে
রাজপুত্র	:	প্রীতিকুমার মজুমদার

Amrita Bazar Patrika-তে নির্মল কুমার ঘোষ লিখলেন ঃ "Manmatha Roy the noted playwright of the modern Bengali School has given it an exquisite dramatic shape mostly on the lines of the European pantomime."

ফার্স্ট এম্পায়ার মঞ্চে এর উদ্বোধন হবার পর এ নাটক টানা এক সপ্তাহ চললো



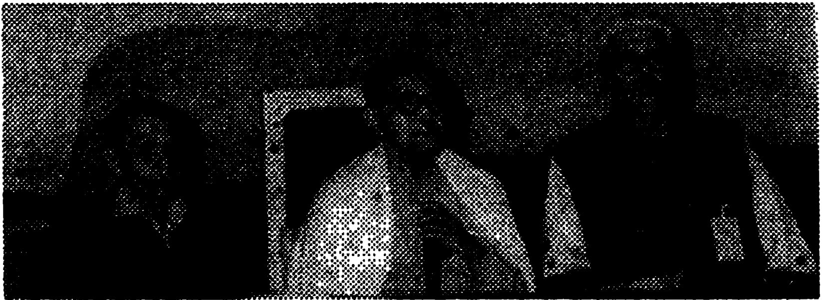
বিদ্যুৎপর্ণায় মঞ্জু দে ও মধু বোস

মন্মথ রায় : জীবন ও সৃজন — ৮

এবং পরে 'শ্রী' চিত্রগৃহের মঞ্চে এটি অভিনীত হল। ১২ই ডিসেম্বর নিউ এম্পায়ারে 'রূপকথা'র চ্যারিটি শো হয়। লেডী ব্রাবোর্ন ঐদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিনই All India Radio এটি প্রচার করেন।

রাজনটী, বিদ্যুৎপর্ণা, রূপকথা—এই তিনটি নাটকই তখনকার দিনে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল ও সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। সমস্ত দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির নাট্য সমালোচকরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সাধারণ দর্শক গ্রহণ করল না। পরিচালক মধু বসু ভেবেছিলেন এ ধরনের নাটক ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে জনপ্রিয় হবে। ডিসেম্বরে পরীক্ষার পর বিদ্যালয়ের শিশু কিশোর কিশোরীরা তাদের মনের আজব দেশের প্রিয় রাজপুত্র, রাজকন্যা, সোনার কাঠি, রূপার কাঠি, রাক্ষস-খোক্কসদের বিচিত্র সাজপোশাকে সামনে দেখে আনন্দ পাবে। অর্থাগমের দিক থেকে ও সন্তোষজনক হল না। কিন্তু দর্শকদের মধ্যে যাঁরা প্রগতিশীল এবং নূতনত্বের প্রয়াসী তারা রূপকথাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়-এর মুক্তার মুক্তি (১৯২৬)-র কথা স্মরণ রেখেও বলা যায় যে সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে সি.এ.পি-ই বোধহয় প্রথম যাঁরা কলকাতার দর্শকদের মঞ্চে fairy tale উপহার দিয়েছিলেন।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের নাটক যখন গতানুগতিকতার শিকার হয়ে দর্শকদের প্রত্যাশিত চাহিদা পূরণে অপারগ হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় মধু বসু ও তাঁর সি.এ.পি-র শিক্ষিত অভিজাত অভিনেতৃ সম্প্রদায়ের পাশে এসে যিনি শক্ত হাতে হাল ধরেছিলেন তিনি হলেন নাট্যকার মন্মথ রায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যুগোপযোগী নাটক রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সাধারণ রঙ্গালয়ের এই স্তিমিত গৌরবের কথা তাঁর স্মরণে ছিল। তিনি বুঝেছিলেন যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে দর্শক রুচিরও পরিবর্তন ঘটছে। নাটকে সঙ্গীতে ও নৃত্যের ব্যবহারের যাথার্থ্য সম্পর্কে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির দৌলতে তাদের সচেতনতা বাড়ছে। 'নৃত্যকলা' নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তাই তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ সচেতনতা নিয়ে সি.এ.পি-র জন্য রচনা করেছিলেন নতুন স্বাদের নাটক যা সেযুগের দর্শকদের মনোরঞ্জনে প্রত্যাশিত ভূমিকা কিছুটা পালন করেছিল।



মধু বোস, দেবকী বসু ও মন্মথ রায়

লোকরঞ্জনের নাটক

পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মন্মথ রায় ও পঙ্কজ কুমার মল্লিকের কাছে ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার দপ্তরের অধীনে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা তৈরি হোক। সেইমত তাঁরা দুজনে সাংস্কৃতিক সংস্থা রূপায়ণের পরিকল্পনার একটি খসড়া তৈরি করে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দপ্তরে জমা দিলেন অনুমোদনের জন্য। লোকরঞ্জনের লক্ষ্য নিয়ে নবভারতের চারণ সম্প্রদায় রূপে রাষ্ট্রীয় নাট্য প্রতিষ্ঠান সঙ্গীত আর নাটকের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে উৎসাহ সঞ্চারে যথার্থ ভূমিকা যাতে পালন করতে পারে এদিকে দৃষ্টি রেখেই পরিকল্পনাটি তৈরি হয়েছিল। ১৯৫৩ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর সমগ্র পরিকল্পনাটি মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন লাভ করে। মন্ত্রীসভার বৈঠকেও 'লোকরঞ্জন শাখা'—যার ইংরাজী নাম 'Folk Entertainment Section' গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার দপ্তরের অধীনে 'লোকরঞ্জন শাখা' নামে এইভাবেই জন্ম নেয় একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা। ১৯৫৪ সালে প্রশাসনিক অনুশাসনের কারণে এই সংস্থার কার্যকলাপ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলেও ১৯৫৫ সালের ১লা এপ্রিল থেকে 'লোকরঞ্জন শাখা' আবার কাজ শুরু করে। এই সংস্থার উপদেষ্টা হলেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক ও প্রশাসনিক আধিকারিকের দায়িত্ব পেলেন নেপাল নাগ ও প্রচার প্রযোজক হলেন নাট্যকার মন্মথ রায়। ভারতে প্রথম এই সংস্থার সাংস্কৃতিক কর্মীরা সরকারি কর্মীরূপে স্বীকৃতি পেল।

'লোকরঞ্জন শাখা'র প্রথম নাট্য প্রযোজনা মন্মথ রায়ের 'মহাভারতী'। একই সঙ্গে সেদিন মন্মথ রায়েরই লেখা দুটি নৃত্যনাট্যও অভিনীত হয়েছিল— 'যাত্রা হল শুরু' ও 'গঙ্গাবতরণ'। কল্যাণী কংগ্রেসের অধিবেশনের শেষে জওহরলাল নেহরু, বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সামনে যথাক্রমে ২২শে জানুয়ারী '৫৪' তা অভিনীত হয়েছিল। এর প্রথম অভিনয় হয় ২৬.১.৫৩ শ্রীরঙ্গমে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পটভূমিকায় প্রথম নৃত্যনাট্য 'যাত্রা হল শুরু'-র বিষয়বস্তু হল জমি ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, আর 'গঙ্গ াবতরণ'-এর বিষয়বস্তু হল বাঁধ নির্মাণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন। দিল্লিতে ১৯৫৭ সালে "১৮৫৭ বিদ্রোহ শতবার্ষিকী জয়ন্তী" উৎসবে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'লোকরঞ্জন শাখা' আকাশবাণী ভবন প্রাঙ্গণে পরপর দুদিন হিন্দীতে এ নাটক মঞ্চস্থ করে। সেখানে জওহরলাল নেহেরু দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ের দ্বিতীয় দিনে অভিনয়ের শেষে তিনি 'লোকরঞ্জন শাখা'র উপদেষ্টা পঙ্কজকুমার মল্লিকের সাথে করমর্দন করে প্রগাঢ় আনন্দে বলেছিলেন : "Bengal has appreciated the concept of my idea about modern pilgrimage of India."

মন্মথ রায় লোকরঞ্জন শাখার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে অনেকগুলি নাটক ও কিছু নৃত্যনাট্য লিখেছেন। যেমন 'মহাভারতী' (১৯৫২), 'গুপ্তধন' (১৯৫৪), 'জটাগঙ্গার বাঁধ' (১৯৫৫), 'আমরা কোথায়' (১৯৫৫), 'লাঙ্গল' (১৯৫৫), 'জীবনমরণ' (১৯৫৫),

'মহাপ্রেম' (১৯৫৯), 'এক আকাশ দুই আঙ্গিনা' (১৯৬০), 'কৃযাণ' (১৯৬১), 'মহাউদ্বোধন' (১৯৬৩), 'গঙ্গাবতরণ' (১৯৫২), 'যাত্রা হল শুরু' (১৯৫২). 'মানভঞ্জন', 'সাত ভই চম্পা' ও 'যক্ষ'।

এইসব নাটকগুলির মধ্যে নাট্যকারের সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বিকাশ দেখা যায়। সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে দেশ গড়ার শপথ ও আদর্শকে এইসব নাটকে বলিষ্ঠ ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নাটকের নানা ভূমিকায় প্রাধান্য পেয়েছে জনসাধারণ। দেশের অর্থনীতি, অসাম্য, ধনবন্টনের বৈষম্য, পুঁজিবাদী শোষন, কায়েমী স্বার্থের স্বরূপ উদঘাটন করতে গিয়ে নাট্যকারকে অজস্র সাধারণ মানুষের চরিত্রকে পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোর সামনে হাজির করতে হয়েছে। নাট্যদ্বন্দ্ব শ্রেণীসংঘাতকে স্পষ্ট করে তুলেছে। বিপুল জনজাগরণ ঘটিয়ে নাট্যকার সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তনে বিশ্বাসী হয়েছেন। নাট্যকারের চিন্তাধারার এই যে রূপান্তর তা আমাদের প্রশ্নমনস্ক করেছে। কারণ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা যে তাগিদ বা প্রবণতা থেকে নাটক রচনা করেছিলেন, মন্মথ রায় সেই রাজনৈতিক তাগিদ বা প্রবণতা থেকে নাটক রচনা করেননি। ফলে তাঁর রচনা একটি ভিন্ন খাত ধরে এগিয়েছে। পূর্ণাঙ্গ নাট্য রচনায় ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত পেশাদার মঞ্চের কথা মাথায় রেখে যে ধারা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন—সে ধারা তাঁর পর রুদ্ধই বলা যায়। কিন্তু অন্য একটি ধারাকে পাশাপাশি ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে দেখেছি যেখানে তিনি আন্তরিকভাবে স্বাধীন ভারতের আদর্শকে এবং তার লক্ষ্যপূরণের জন্যে জনগণকে সৎ নাগরিকে পরিণত করতে চান, চান জনসাধারণের আর্থিক জীবনের পরিবর্তন আনতে, সমাজের অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের অবসান ঘটাতে। কিন্তু এই সৎ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও আপাতদৃষ্টিতে তা নিছক প্রচার হয়ে গেছে বলেই মনে হয়।

'লোকরঞ্জন শাখা' পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত, তবু পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে তার স্পষ্ট প্রভাব অনুভূত হয় না। কারণ লোকরঞ্জন শাখার জন্য লেখা নাটকগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে গভীরতার অভাব। প্রচারগুলি সর্বত্র শিল্পোত্তীর্ণ হতে পারেনি। নাট্যকারের পক্ষে সাধারণ মানুষের খুব কাছাকাছি থেকে তাদের বাধা ও সমস্যাগুলিকে অনুপুঙ্খভাবে দেখা সম্ভব হয়নি। মন্মথ রায় 'লোকরঞ্জন শাখা'র জন্যে লেখা নাটকগুলিতে তাঁর ক্ষমতার সবিশেষ স্ফুরণ ঘটাতে পারেননি। প্রায় সব নাটকগুলিতেই একটা তৈরি করা সমাধান এসে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। অথচ তাঁর চেষ্টা ছিল। তিনি পল্লীজীবনের সুখদুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, হাসিকান্নার মাধ্যমে একটা নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন এই নাটকগুলি লেখার পেছনে তাঁর প্রেরণা ছিল রবীন্দ্রনাথের এই বাণী : "Our object is to try to flood the choked bed of village life with the stream of happiness. For this the scholars, the poets, the musicians, the artists, have to collaborate to offer their contributions. Otherwise they must have like parasites, sucking life from the people and giving nothing back to them.

Such exploitation gradually exhausts the soil of life, which needs constant replenishing by the return to it of life, through the completion of cycle of receiving and giving back."

মহাভারতী

নাটকের 'লেখকের কথা' অংশে পাই "......১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ, ১৯১১ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ, ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০-৩১ সালে আইন অমান্য ও লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ১৯৪২ সালে আগস্ট বিপ্লব, ১৯৪৬ সালে বৃটিশ কর্তৃক ভারতের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ এই রাজনীতিক ঘটনাগুলি এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের বিষয়বস্তু।" ১৯৩৮ সালের পর দীর্ঘ চোদ্দ বছর বাদে ১৯৫২ সালে তিনি লিখলেন তাঁর প্রথম সামাজিক নাটক 'মহাভারতী'। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় এর কাহিনী বিস্তারিত। একটি চাষী পরিবারের বীর্যদীপ্ত কাহিনী এ নাটকের প্রাণবিন্দু। ১৮৫৭ সালের প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শুরু থেকে পরবর্তী কালে কিভাবে সুদিনের সূর্য উঠেছে, এ নাটক তারই কাহিনী। মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রকুলবর্তী একটি গ্রামে মহাভারত মাইতি নামে এক মধ্যবিত্ত কৃষক এবং তার পরিজনবর্গকে কেন্দ্র করে এই নাটকের কাহিনী আবর্তিত। এ নাটকে মাত্র একটি দৃশ্যপট ব্যবহার করা হয়েছে। পাঁচ অঙ্কের নাটক। কোন দৃশ্য ভাগ নেই।

জহর গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ 'শ্রীরঙ্গম' নাট্যমঞ্চে ১৯৫৩ সালের ২৬শে জানুয়ারি 'মহাভারতী' প্রথম মঞ্চস্থ করে। পরে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে কল্যাণীতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে, সর্বভারতীয় প্রতিনিধিদের মনোরঞ্জনের জন্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সরকারি নাট্যসংস্থা লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীদের দ্বারা ১৯৫৪ সালের ২২শে জানুয়ারি এ নাটক অভিনীত হয়। অভিনয় শেষে অভিভূত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল মঞ্চে ছুটে এসে মাইকের সামনে দুটি কথা বলেন ঃ "Only Bengal could do it and Bengal has done it."

'মহাভারতী' প্রদর্শিত হবার পর 'প্রবাসী' (চৈত্র সংখ্যা ১৩৬১) লেখে : "এই ধরনের বিরাট পটভূমিকায় ইতিপূর্বে আর কোন সামাজিক নাটক রচনার চেষ্টা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই এবং একথা বলতে দ্বিধা নেই যে নাট্যকারের প্রয়াস সার্থক হয়েছিল।"

'দেশ' (১৩৬১) লেখে : "নাট্য জগতে অজন্মার দিনে এমন একটি বলিষ্ঠ রাজনীতিক নাটকের যে মূল্য আছে, সে কথা অনস্বীকার্য। নাটকটি এমনভাবে রচিত, দৃশ্যপটগুলির প্রবর্তনও এমনভাবে করা হয়েছে যাতে সাধারণ রঙ্গমঞ্চেই শুধু নয় শৌখিন রঙ্গমঞ্চেও এ নাটকের অভিনয় করার পক্ষে কোন বাধা নেই।"

দীনবন্ধু স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হবার পর "দীনবন্ধুর উত্তর সাধক মন্মথ রায়" এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখা হয়। প্রবন্ধটিতে উল্লেখ করা হয় "......মহাভারতী নাটকটি

ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি পূর্বাপর ধারাবাহিক নাট্য দলিল বলা যায়। ......মহাভারতী কারাগারের চেয়েও সার্থকতর সৃষ্টি। ....কারণ নাটকটিতে সমাজের বাস্তব জীবনের ছবিকে অনেক কাছ থেকে দেখার স্বাদ মেলে, 'কারাগার' নাটকের রাজোচিত আড়ম্বর ও পৌরাণিক বাতাবরণ যেখানে দর্শকদের বাস্তবতাবোধকে আহত করে, সেই স্থলে মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি মহকুমার অন্তর্বর্তী রামনগরের এক গ্রামীণ চাষী পরিবারের জীবনচিত্রণের পটভূমিতে রচিত "মহাভারতী' নাটকে ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াইকে একেবারে জীবন্ত রূপে যেন হাতের মুঠোয় ধরা অবস্থায় পাওয়া যায়।" (নারায়ণ চৌধুরী)

Hindusthan Standard (New Delhi 1957) লিখেছিল ঃ ".....It was more a piece of human document of history than a mere play. .....The success of the drama owes to each and individual artiste's sincere efforts."

Times of India (1957) লিখেছিল ঃ "......a seasoned dramatist who alone could handle the very ambitious theme, the saga of the Indian freedom movement over a period of forty years, phase by phase, campaign by compaign."

The Stateman (New Delhi 1957) লিখেছিল ঃ "......in which we see, four generations of a Bengali village house fighting for the freedom of India."

গুপ্তধন

এ নাটকটি নাট্যকার উৎসর্গ করেছেন মহাত্মা গান্ধীকে। বিধানচন্দ্র রায় নাটকটি সম্পর্কে বলেছিলেন, 'সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা, জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ইত্যাদির সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে দেশবাসীর সহযোগিতার উপর। দেশের জাগ্রত জনশক্তি এই দিকে নিয়োজিত হলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হতে পারে।'

নাটকটিতে তিনটি অঙ্কে যথাক্রমে চারটি, তিনটি এবং তিনটি করে দৃশ্য আছে। নাটকের সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি এইরকম। শ্রীপুর গ্রাম স্বাধীনতার পাঁচ বছর পরেও শ্রীহীন। গ্রামের লোকেরা দুর্দশার জন্যে চলে গেছে শহরে। রয়ে গেছে অত্যন্ত দরিদ্র নিরুপায় মানুষেরা, আর গ্রামে সর্বেসর্বা হয়ে আছে সুযোগ সন্ধানী নায়েব চক্রধর দাস। ভাগ্যের পরিহাসে চক্রধরের স্ত্রী-পুত্র নেই, আছে বিধবা বোন আর তার ছেলে গদাধর। গদাধর তার মামাকে বলে এদেশ থেকে ইংরেজ চলে গেলেও এদেশে তারা রেখে গেছে তিন শত্রু—দারিদ্র্য, ব্যাধি আর অজ্ঞতা। সে আরো বলে, প্রথম জন তার মামা—গরীবদের শোষণ করে দারিদ্র্য বাড়ায়, দ্বিতীয় জন হাতুড়ে ডাক্তার ভবতারণ—যে রোগ পুষে ব্যাধি বাড়ায়, তৃতীয়জন হল বরাত বাবা—যে তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে গ্রামের মানুষকে অশিক্ষা আর কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখে। এ গ্রামেরই বাসিন্দা হলধর মণ্ডল। তার দুই ছেলে

কানাই বলাই গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্যে নিজেদের বিলিয়ে দেয়, পতিত জমি উদ্ধার করে, মজা পুকুর কেটে পথ তৈরি করে, নলকূপ বসায়, বিদ্যালয় খোলে। এ গ্রামেরই মেয়ে রাধা, তাকে গদাধর বিয়ে করতে চায়। গ্রামের অন্যান্য ছেলেরাও গ্রামোন্নয়নের কাজে তাদের সঙ্গে হাত মেলায়। চক্রধর, ভবতারণ ও বরাতবাবা ভাবে গ্রামের ছেলেরা যেভাবে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে মেতে উঠেছে তাতে তাদের অন্ন উঠল বলে। এমন সময় কানাই বলাইদের পুকুর থেকে একটি লোহার সিন্দুক পাওয়া যায়। সারা গ্রামে রটে যায় ওতে নাকি মোহর আছে। কানাই বলাই বলে, এ সিন্দুক সারা গ্রামের সম্পত্তি। রাধার বাবার বলদ মরে যাওয়ায় রাধা আসে তাদের কাছে টাকা চাইতে। রাধাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করার জন্য গ্রামের সকলের সামনে খোলা হয় সিন্দুক, কিন্তু অর্থ ও মোহরের পরিবর্তে সিন্দুকের মধ্যে পাওয়া যায় এক বিরাট রামসীতার মূর্তি।

কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্য আছে কিন্তু কাহিনী গ্রন্থন শিথিল। কয়েকটি চরিত্র চিত্রণ উল্লেখযোগ্য মনে হলেও চরিত্রগুলি যে জীবন থেকে উঠে এসেছে তা মনে হয় না। কারণ এ নাটকে প্রচার সর্বস্বতাই প্রাধান্য পেয়েছে।

জীবনমরণ

১৯৫৪ সালের ১৬ই জুন থেকে ১০ই অগাস্ট-এর মধ্যে রচিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ, লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক ১৯৫৫ সালের ২রা অক্টোবর গান্ধী জন্ম জয়ন্তী দিবসে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে শারদীয়া 'দীপালি' কার্তিক সংখ্যায় (১৯৬১) এটি প্রকাশিত হয়। নাট্যকার নাটকটির উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন ঃ "বাংলাদেশে সমবায় জীবনদর্শনের আদি উদ্‌গাতা শ্রীনিকেতন স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমর স্মৃতির বেদীমূলে শ্রদ্ধার্ঘ।"

তিন অঙ্কের নাটক। সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে রঙ্গালয়ের প্রতিটি শিল্পী কর্মীকে যে বাঁচিয়ে রাখা যায়—এই বক্তব্যকে নাট্যকাহিনী সূত্রে গেঁথেছেন নাট্যকার। নাটকের পরিণতিতে দেখি যে দলের অন্য শিল্পীর চক্রান্তে পঙ্গু হয়ে গেলেও নাট্যশিল্পী সারাজীবন সমবায় পদ্ধতির সাহায্যে আর্থিক সাহায্য পেয়ে সসম্মানে বেঁচে থাকবার অধিকার পান। ছোট অখ্যাত শিল্পীদের বড় নামীদামী শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা, ঈর্ষা নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে নাট্যকার বেশ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মা আনন্দময়ীর চরিত্রটি ভারী সুন্দর, মধুর অথচ স্বাভাবিক। নিস্তারিনীর চরিত্রটি জীবন্ত অথচ সরল। 'সাজাহান' নামে প্রকৃত নাট্যপ্রেমী চরিত্রটি নাট্যকারের এক অদ্ভুত সৃষ্টি।

নাটকটি সম্পর্কে সমবায় আধিকারিক, কলকাতার তদানীন্তন নিয়ামক শ্রী গুরুদাস গোস্বামীর মূল্যবান মন্তব্য উদ্ধৃত করা গেল ঃ "নট ও নটীদের প্রতিভা এবং কর্মীদের সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে বাংলার রঙ্গজগৎ। কিন্তু আর্থিক ক্ষেত্রে এই উভয় শ্রেণীই পারিশ্রমিক পান না। কারণ মঞ্চের যাঁরা মালিক তাঁরা নিম্নতম মূল্য দিয়ে নিজেদের লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি করতে ব্যস্ত। ......সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে এই অবস্থার অবসান সম্ভব।"

লাঙল

১৯৫৫ সালের ২৫শে মে থেকে ৩১শে এ নাটকের রচনাকাল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারি মুদ্রণে মুদ্রিত হয়ে ১৯৫৫ সালের ২রা অক্টোবর গান্ধী জন্ম জয়ন্তী দিবসে এটি প্রকাশিত হয়। নাট্যকার মন্মথ রায় নাটকটি "বাংলার চাষী ভাইদের" হাতে তুলে দিয়েছেন। নাটকটিতে আছে :

পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে ১৩৬২ সনের ১লা বৈশাখ একটি স্মরণীয় দিন। মধ্যস্বত্ব বা জমিদারি বিলোপ এই রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তনের সূচনা করে। আজ থেকে প্রায় ১৬২ বছর আগে ইংরাজ শাসক লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তন করেছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত -- বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা এবং তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিদেশী শাসকের পছন্দ মত ছাঁচে গড়ে তুলতে। পরাধীনতার এই শেষ নিদর্শন এই দিনটিতে অবলুপ্ত হয়ে নূতন যুগধর্মের বিবর্তন আনলো। ফলে বাংলার চাষী ফিরে পেল তার স্বাধিকার। মাটি ও মানুষের মিলনে গড়ে উঠবে এক নতুন সমাজ, সূচিত হবে কৃষি উন্নতির এক নতুন অধ্যায়। শুরু হবে আজ থেকে লাঙল যার জমি তার।

ছ'টি দৃশ্যে সম্পূর্ণ এ নাটকের মূল বক্তব্য 'লাঙল যার জমি তার'। নাট্যকার ধূর্ত নায়েব, অসহায় প্রজা, উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপ জমিদার, জমিদারের আদর্শ চরিত্র পুত্র এদেরকে নিয়ে তাঁর নাট্যকাহিনীকে সাজিয়েছেন। জমিদার মহীপাল রায় কলকাতায় রক্ষিতা নিয়ে বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে। গ্রামের সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে তার ভাবনার সময় নেই। সেই সুযোগের সম্পূর্ণ সদব্যবহার করে ধূর্ত নায়েব। এমন সময় অসহায় প্রজাদের পাশে এসে দাঁড়ায় আলোক। সে এতদিন বেনারসে দাদু-দিদিমার কাছে মানুষ হয়েছে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে। উদাসীন জমিদার মহীপালকে সে ইতিপূর্বে দেখেনি। কারণ তার মা তার জন্ম দিয়েই মারা যান। প্রজাদের সঙ্গে নিয়ে সে যখন কলকাতায় মহীপালের বাগানবাড়িতে জমিদারের কাছে নালিশ জানাতে যায় তখন তার সাক্ষাৎ হয় চন্দনার সঙ্গে। চন্দনা জমিদারের রক্ষিতা হলেও তার ব্যক্তিত্ব তার মাতৃসত্তাকে অমলিন রেখেছিল। চন্দনার কাছে আলোক সব শোনে। পিতার চারিত্রিক স্খলন তাকে দুঃখ দেয়। সে ঠিক করে নিজে অর্থ উপার্জন করে উচ্চশিক্ষা নেবে। তাই সে গ্রামে গিয়ে ছোট তরফের ভূতপূর্ব জমিদারের কন্যার গৃহশিক্ষকের কাজ নেয়। নাম নেয় 'আনন্দ'। ঘটনা দ্রুত গতিতে এগোয়। রটে যায় বেনারস থেকে আলোক উধাও। নায়েব প্রাণকৃষ্ণের সব জারিজুরি ধরা পড়ে যায়। আলোকের আসল পরিচয় আর চাপা থাকে না। নাট্যকার আলোক চরিত্রটির মাধ্যমে তত্ত্বগতভাবে প্রচারকে কাজে লাগিয়েছেন। তাই নাটকের শেষে তার মুখেই শুনি—"দেনার দায়ে গরীব চাষীর জমি যায় তাদেরই খপ্পরে যারা জমি চষে না, লাঙল ধরে না। ...বাংলার চাষী দেনা ঘাড়ে নিয়ে জন্মায়, দেনা রেখেই মরে। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় জমিদারি বিলোপ। —লাঙল যার জমি তার।"

জটাগঙ্গার বাঁধ

রচনাকাল ১৯৫৫ সালের ৮ই জুলাই থেকে ১০ই জুলাই এর মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গ স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ, লোকরঞ্জন শাখা গ্রন্থটি প্রকাশ করে। দার্জিলিং-এর ক্যাপিটাল ছবিঘরে ১৯৫৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রথম অভিনীত হয়। সুরসৃষ্টির ভার ছিল পঙ্কজ কুমার মল্লিকের, পরিচালনা করেন মন্মথ রায়। নাটকটি ৩টি দৃশ্যে সম্পূর্ণ। সংক্ষেপে কাহিনীটি এইরকম : সুন্দরবনের রাঙামাটি গ্রামের জটাগঙ্গা নদীর পাশে ভারত কলেজ ছাত্র সংঘ চালিত সন্তানদল ছুটির অবকাশে যুব-শিবির স্থাপন করেছে। সেখানে খিদের জ্বালায় রুটি চুরি করতে এসে ধরা পড়ে যায় অন্ধ গায়েন কৃষ্ণ দাসের স্ত্রী রাধা। সন্তানদলের দাক্ষিণ্যে শ্রমের বিনিময়ে তাদের খাদ্যের সংস্থান হয়। জাতি ও সমাজের কল্যাণের জন্য সমবায় সমিতির যে ভূমিকা সন্তানদলের মাধ্যমে এ নাটকে তা প্রচার করা হয়েছে। জটাগঙ্গার বন্যার হাত থেকে গ্রামকে, গ্রামের ফসলকে, মানুষকে বাঁচাবার জন্য বাঁধ বাঁধার পরিকল্পনাকে বানচাল করার জন্য গ্রামের মহাজন ধনপতির চক্রান্ত, তার কাছে ঋণের দায়ে বাঁধা গ্রামবাসীর অসহায়তা, তাদের উৎসাহিত করে তোলায় প্রতাপের ভূমিকা মনে রাখার মত। গ্রামের মহিলাদের সংগঠিত করে রাধা। তারা দাবি জানায় মহাজনের কবল থেকে গ্রামবাসীকে রক্ষা করা বাঁধ বাঁধার চেয়েও জরুরী। সমস্ত গ্রামবাসী জোট বেঁধে বাঁধ বাঁধার কাজে অগ্রসর হয়। মহাজনের স্ত্রী নয়নতারাও তাদের সঙ্গী হয়। অবশেষে মহাজনের চৈতন্য হয় সে সমস্ত গ্রামবাসীর সঙ্গে সমান হয়ে শ্রমদান করতে এগিয়ে আসে। এ নাটকের উপসংহার অংশটি বড় বেশি প্রচার সর্বস্ব হয়ে উঠেছে।

মহাপ্রেম

১৯৫৯ সালের ২৮শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর এই নাটকটির রচনাকাল। ১৯৬০ সালের সাধারণতন্ত্র দিবসে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে লোকসেবক দৈনিক পত্রিকায় বার্ষিক সংখ্যাতে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৬২ সালে নাটকটির পরিবর্ধন করা হয়। নাট্যকার নাটকটি উৎসর্গ করেছেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অখ্যাত অজ্ঞাত অগণিত শহীদের পুণ্যস্মৃতির বেদীমূলে। নাটকের উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখেছেন, "বীরের রক্তস্রোত ও মাতার অশ্রুধারা-অভিষিক্ত দিবারাত্রির তপস্যা ধন্য হয়েছে জাতির পরাধীনতার অবসানে ; অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জনগণের এই সিদ্ধি অক্ষয় অক্ষুণ্ণ থাক এই ব্যগ্র কামনাতেই এই নাটকের জন্ম।" নাটকটির প্রথম অভিনয় ৮.১২.৬২তে ২৪ পরগণার উদয়পুরে। দ্বিতীয় অভিনয় রঙমহলের শ্রীমঞ্চে ১৬.১২.৬২।

একটি অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামের অতি সাধারণ মানুষগুলিই এই নাটকের চরিত্র, কোন নেতা নয়, সেনাপতি নয়। তিন অঙ্কে, ১৪টি দৃশ্যে বিভক্ত এই নাটক। সীমান্ত অরণ্য অঞ্চলের একটি গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান মহেন্দ্রর কন্যা ময়নার সঙ্গে দীননাথবাবুর ছেলে কানাই-এর বিবাহ দিয়ে এই নাটকের কাহিনী শুরু। বিয়ের দিনই কানাই বরের আসন

থেকে. উঠে পড়ে বিদেশী শত্রু গ্রামে ঢুকে পড়েছে শুনে। ময়নার দাদা ইন্দ্র ও কানাই-এর দেশপ্রেম মহান। ইন্দ্রর ছোটবেলার খেলার সাথী হরিদাসী আজ বিধবা। অর্থের প্রয়োজনে আজ রাতে তার ঘরে লোক আসে। গ্রামের বড় ব্যবসাদার রাজেন বিদেশী শত্রু নিয়ে যখন রাতে হরিদাসীর ঘরে গেল তখন সে খবর ইন্দ্রের কানে গেল। ইন্দ্রের আবেগময় কথায় হরিদাসী তাদের দেওয়া স্বর্ণালঙ্কার দেশের কাজে ইন্দ্রের হাতে তুলে দিল। বিদেশী শত্রুর মোকাবিলায় গ্রামের ছেলেরা জোট বাঁধলো। কারণ ইন্দ্র কানাই নেতৃত্ব দিয়ে তাদের জোট বাঁধতে শিখিয়েছে। তারা উপলব্ধি করতে শিখেছে প্রাণের বিনিময়েও বিদেশী শত্রুকে রুখতে হবে। গ্রামের অন্যদের নিরাপদ দূরত্বে পাঠিয়ে দিলেও তারা হরিদাসীকে পাঠাতে পারে না। হরিদাসী ইন্দ্রকে ছাড়তে চায় না। মৃত্যু আসুক, কারণ সে যে দেশপ্রেমের অর্থ বুঝেছে। কিন্তু ঠিক তখনই গ্রামে উপস্থিত হয় ভারতীয় সৈন্য। গ্রামবাসীরা সাহসী হয়ে ফিরে আসে, ইন্দ্র ও কানাই-এর সাথে তারা গলা মিলিয়ে গান গায়—"ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।" নাটকটি নিছক প্রচার হওয়ায় শৈল্পিক গাঢ়বদ্ধতা নেই।

অথচ নাটকটি সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হয়েছিল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (২৬.৭.৬২) লিখেছিল, "বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে সংকটকালে দেশবাসীর মনোবল গঠনে সাহিত্যের কর্তব্য হিসেবে প্রথম গ্রন্থ বিখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়ের এই মহাপ্রেম।"

'অমৃত' (২৩.১১.৬২) লিখেছিল ঃ "মন্মথ রায় 'মহাপ্রেম' নাম দিয়ে......নাটকখানি রচনা করেছিলেন। .....বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় এই ভেবে যে ১৯৬২ সালের ২০শে অক্টোবর তারিখে চীনাদের দ্বারা ভারত সীমান্তে যে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হবে, এ সম্পর্কে শ্রীরায়ের কি স্বপ্নদর্শন ঘটেছিল? ......আশ্চর্যভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে এই মহাপ্রেম নাটকখানি।"

'যুগান্তর' (৪.১১.৬২) লিখেছিল ঃ "পৌরুষ ও দেশপ্রেমের সঙ্গেই জাগ্রত জীবনবোধের সুরটিও এই নাটকে ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে......প্রখ্যাত নাট্যকারকে আমরা আন্তরিক সাধুবাদ দিচ্ছি।"

এক আকাশ দুই আঙিনা

১৯৬১ সালে 'বাক্ সাহিত্য' এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। নাট্যকার নাটকটির ভূমিকা অংশে স্বীকার করেছেন বিশেষত যুব সম্প্রদায় শ্রমের মর্যাদা স্বীকার করে, কায়িক পরিশ্রমে পরান্মুখ না হয়ে, জাতীয় উন্নয়নের কাজে যাতে আত্মনিয়োগ করেন সেই আদর্শ সামনে রেখেই তিনি নাটকটি রচনা করেন।

চারটি অংশে নাটকটি বিধৃত। দেবীপুর গ্রামে কাহিনীর সূচনা। কাশী মণ্ডল ও বৃন্দাবন মণ্ডলের বিরোধকে কেন্দ্র করে টুকরো টুকরো ঘটনা, পল্লীজীবনের সুখদুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, হাসিকান্নার একটি কাহিনীর মাধ্যমে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিত্রাঙ্কনের

একটা চেষ্টা নাটকে লক্ষ্য করা যায়। বৃন্দাবনের স্ত্রী লক্ষ্মী। গ্রামের গরীবদের খাদ্য থেকে বঞ্চিত করে ঘরে ধানচাল মজুত রাখা, পরে স্ত্রী লক্ষ্মীর কৌশলে বৃন্দাবনের চৈতন্যলাভ হয়। জাল মিনিস্টার সুদর্শনের স্বরূপ উদঘাটন হয়। মজুত করা ধানচাল গ্রামের লোকেদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। রাধা ও কানাই-এর দুটি পরিবারের মধ্যে সৌহার্দ্য ফিরে আসে। ওদের বিবাহের মধ্যে দিয়ে নাটকে মধুর মিলনান্তক পরিসমাপ্তি ঘটে।

জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির অপরিহার্যতা ঘোষণা করতে গিয়ে নাট্যকার গ্রামীণ কৃষির সমস্যা ও সমাধানের একটা ছবি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন এ নাটকে। সূর্যকান্ত, কানাই, রাধা প্রভৃতি চরিত্রে বাস্তবতা কম হওয়ায় নাটকটিতে বৈচিত্র্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। বরং বৃন্দাবন মণ্ডল, কাশী মণ্ডল, ভৈরব দারোগা অনেক বেশি বাস্তব এবং জীবন্ত চরিত্র। ভিখারী চরিত্রটি আকস্মিক হলেও এ নাটকে সে যেন বিবেকের কাজ করেছে।

মহাউদ্বোধন

১৯৬৩ সালে 'সংহতি' পত্রিকায় (৩য় বর্ষ ১ সংখ্যা) নাটকটি প্রকাশিত হয় বিবেকানন্দ শতবর্ষের প্রাক্কালেই। বিবেকানন্দের জীবনের একাংশকে ঘিরে ছয় দৃশ্যের এই নাটকটি গড়ে উঠেছে। ১৮৮১'র নভেম্বর থেকে ১৮৮৬'র ২২শে এপ্রিল রামকৃষ্ণের দেহত্যাগের অব্যবহিত আগের ঘটনার সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে নাটকটিতে। প্রথম দৃশ্যে নরেন্দ্রর মাতামহীর বাড়ি, ২য় দৃশ্যে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের ঘর, ৩য় ও ৪র্থ দৃশ্যে বিশ্বনাথ দত্তের বৈঠকখানা, ৫ম দৃশ্য দ্বিতীয় দৃশ্যের অনুরূপ এবং ষষ্ঠ দৃশ্যে কাশীপুরের উদ্যানবাটীর কথা আমরা পাই। বিবেকানন্দের জীবনের আঠারো বছর বয়স থেকে তেইশ বছর বয়স—মোট পাঁচ বছরের কথা নাটকে বলা হয়েছে। নাটকটি ১৯৬৩ সালে লোকরঞ্জন শাখার শিল্পী দ্বারা অভিনীত হয়েছিল।

ভাঙ্গাগড়া

'অবসাদগ্রস্ত এবং অব্যবস্থিতচিত্ত উদ্বাস্তুদের' হৃত মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নির্দেশে মন্মথ রায় লিখলেন 'ভাঙ্গাগড়া'। যাদের ঘর ভেঙেছে নতুন করে ঘর গড়তে হবে, দুঃখের আঘাতে তারা যেন ভেঙে না পড়ে এটিই ছিল নাটকটির মূল বক্তব্য। 'ভাঙ্গাগড়া' নাটকের বিষয় হল—শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বে দ্বারকায় যদুদের নতুন রাষ্ট্র গঠন। এ নাটকটি উদ্বাস্তুদের প্রেরণা দিতে লেখা হয়েছিল এবং তা সম্ভবও হয়েছিল।

স্বাধীন ভারতের উন্নয়নমূলক সাংগঠনিক কাজকর্মের জন্য দেশের ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা ও সমাধানের পথ নিদের্শনার দায়িত্ববোধ থেকেই মন্মথ রায় লোকরঞ্জন শাখার জন্য নাটক রচনা করেছিলেন। তাই তাঁর এইসব নাটকের পটভূমি হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন গণজীবনকে। সেই গণজীবনের মানোন্নয়নের জন্যে যে সমাজের সার্বিক পরিবর্তনের প্রয়োজন, একথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই নাটকগুলির মধ্যে দিয়ে মানুষকে এক বৃহত্তর ঐক্যবোধে তিনি

উদ্দীপিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। যে কোন মূল্যে অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা যে দেশবাসীর মহান কর্তব্য এ বোধ সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। এই ধরনের প্রচার নাটকে এটিই আমাদের উপরি পাওনা। সরকারি প্রচারের উদ্দেশ্যে নাটক লিখতে গিয়ে তাঁকে একটি নির্দিষ্ট আদর্শ ও প্রচারের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হত বলে নাটকগুলিতে নাটকীয়তাও শৈল্পিক বিকাশের চেয়ে প্রচারের দাবি গুরুত্ব পেত। কিন্তু প্রচারধর্মিতা সত্ত্বেও নাটকগুলির মধ্যে, দেশপ্রেমের আন্তরিকতা, মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা--সর্বোপরি একজন সৎ নাট্যকার হিসেবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা যে যথার্থই অকৃত্রিম এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশই থাকে না।

লোকরঞ্জন শাখার জন্য লেখা

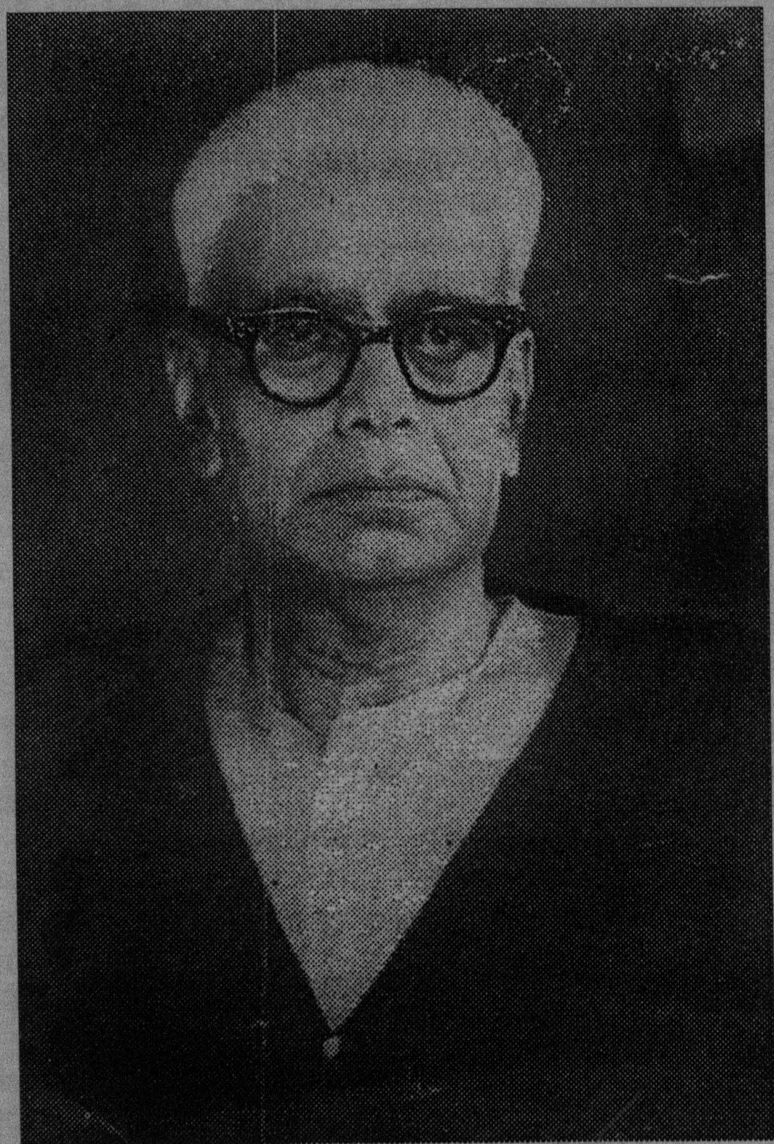
নাটক-নাটিকা

নাটক	রচনাকাল/মুদ্রণ	প্রথম অভিনয়	পরিচালক
মহাভারতী	১৯৫২	২৬.১.৫৩/শ্রীরঙ্গম	জহর গাঙ্গুলি
গুপ্তধন	১৯৫৪	১৯৫৪	নবকুমার ব্যানার্জি
জীবনমরণ	১৯৫৪/১৯৫৫	–	–
লাঙল	১৯৫৫ মে / ১৯৫৫ অক্টোবর	–	–
জটাগঙ্গার বাঁধ	১৯৫৫ জুলাই/১৯৫৫	৩০.৯.৫৫	মন্মথ রায়
আমরা কোথায়	১৯৫৫	১৯৫৫	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাপ্রেম	১৯৫৯ নভেম্বর	১৬.১২.৬২ শ্রীমঞ্চ	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রিয়তোষ মুখার্জি
এক আকাশ দুই আঙিনা	১৯৬১ বাক্ সাহিত্য	১৯৬৩	শান্তি ভট্টাচার্য
মহাউদ্বোধন	১৯৬৩ সংহতি	১৯৬৩	প্রিয়তোষ মুখার্জি
ভাঙ্গাগড়া	–	–	–

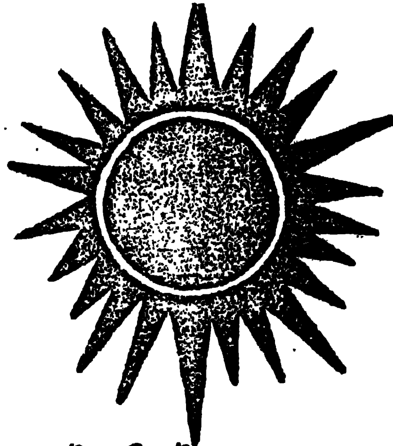
লোকরঞ্জন শাখার জন্য লেখা

নৃত্যগীত বহুল নাটিকা

নাটক	রচনাকাল/মুদ্রণ	প্রথম অভিনয়	পরিচালক
গঙ্গাবতরণ	১৯৫২	২৬ জানুয়ারি '৫৩	–
যাত্রা হোলো শুরু	১৯৫২	২৬ জানুয়ারি '৫৩	–
মানভঞ্জন	১৯৫৬	–	প্রিয়তোষ মুখার্জি
সাতভাই চম্পা	১৯৫৭	–	প্রিয়তোষ মুখার্জি
যক্ষ	১৯৬১	–	প্রিয়তোষ মুখার্জি



৭৮ বছরের বয়সে



স্টার থিয়েটার

মুক্তির ডাক

প্রথম অভিনয় : ১৯২৩ সাল, ২৫শে ডিসেম্বর (বড়দিন)

৫০ বছর পরে

১৯৭৩ সাল, ২৫শে ডিসেম্বর (বড়দিন)

একাঙ্কিকার সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে আমাদের নিবেদন

একাঙ্ক সৃজনে মুক্তির ডাক □

একাঙ্ক

আন্দোলন হিসেবে বিশ শতকে বিশেষ গুরুত্ব পেলেও একাঙ্ক নাটক একটি শিল্প-আঙ্গিক রূপে প্রাচীন কাল থেকেই পরিচিত। এমনকি একাঙ্কের উৎস সন্ধানে যাত্রা করে সম্ভবত পৌঁছানো যায় নাট্য সৃষ্টির গোড়ার যুগে। সমাজতাত্ত্বিকদের বর্ণনার সূত্র ধরে কল্পিত হতে পারে আদিম সমাজের সেইসব গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশের কথা যখন জীবিকার সন্ধানে মানুষ ব্যস্ত হত শিকারে অথবা কৃষিকাজে। জীবনধারণের দরকারে আদিম সমাজের সক্ষম পুরুষেরা যেত বন্য জন্তু শিকারে—যাবার আগে প্রথামত তারা মহড়া দিয়ে নিত নকল শিকারের। কেউ হয়ত সাজত বাইসন অথবা বুনো হাতি এবং সম্ভাব্য শিকারীরা বিবিধ নাচ ও অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে দিত মহড়া। এ অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবাহিত হত যে তীব্রতা—শিকার ক্রিয়ার আরোহ অবরোহের যে তীক্ষ্ণ অভিব্যক্তি, তার মধ্যে একাঙ্ক নাটকের একমুখী অনিবার্যতা আবিষ্কার করা বিস্ময়ের ব্যাপার নয়।

ডঃ সুকুমার সেন ঋক্‌বেদে নাট্যকবিতা হিসেবে যে দুটি নমুনা পেশ করেছেন—'ইন্দ্র অতিথি' ও 'জুয়াড়ির দশা'—তাতেও লক্ষ্য করা যায় একাঙ্ক নাটকের লক্ষণ। তবে একথাও ঠিক যে তখনো নাট্য আঙ্গিক তার স্বকীয় আকৃতিতে স্থিত হতে পারেনি।

প্রাচীন গ্রীক নাটকের যে উদাহরণ উত্তরকালের হাতে পৌঁছেছে সেগুলোতে নাট্যক্রিয়া একটি মাত্র দৃশ্যে বিধৃত হলেও তাদের একাঙ্ক বলা চলে না কোনমতেই। চরিত্র ও কাহিনীর বিশালতায় তারা বহুমাত্রিক। একাঙ্ক নাটক বিচারের সময় এ সত্যটিও স্মরণে রাখা দরকার।

ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে কিন্তু আঙ্গিক হিসেবে একাঙ্ক নাটক তাত্ত্বিকদের কাছে বেশ মনস্ক মর্যাদা পেয়েছে। আচার্য ভরত থেকে ধনঞ্জয়, এমনকি বিশ্বনাথ কবিরাজ পর্যন্ত নাটকের প্রকার ভেদ নিয়ে যত আলোচনা করেছেন তার মধ্যে একটি বড় ভূ-ভাগ অধিকার করে আছে এ নাট্য আঙ্গিকটি। সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব গ্রন্থে যে দশটি রূপক ও আঠারোটি উপরূপক নির্দিষ্ট রয়েছে তার মধ্যে অন্তত নয়টি হল একাঙ্ক ধর্মী। উপরূপকের প্রজাতিগুলো ছেড়ে দিলেও দশ রূপকের মধ্যেই আছে চার ধরনের একাঙ্কের উল্লেখ। তারা হল ভান, ব্যায়োগ, বীথী ও অঙ্ক (উৎসৃষ্ঠাঙ্ক)।

ক) ভান : একটি অঙ্কে একটি মাত্র ধূর্ত চরিত্রের পণ্ডিত অথবা বিট যদি নিজের বা অপরের অনুভূতি বর্ণনা করে তাহলে ভান বলে কথিত হবে। চরিত্রটি উক্তি প্রত্যুক্তি ও আকাশ-ভাষিতের মাধ্যমে শৌর্য ও সৌন্দর্যপূর্ণ ভাব প্রকাশ করবে। এর কথাবস্তু হবে কল্পিত এবং রস হবে মিশ্র শৃঙ্গার।

খ) ব্যায়োগ : এ প্রজাতিতে অঙ্ক থাকবে একটি। এর কাল এক দিবসে পরিব্যাপ্ত। নায়ক হবে ধীরোদ্ধত, সঙ্গে থাকবে বেশ কিছু পুরুষ চরিত্র। ব্যায়োগের বিষয়বস্তু কাল্পনিক বা প্রাচীন আখ্যান। কাহিনীতে সংগ্রাম থাকবে তবে তা স্ত্রী-ঘটিত নয়। রস বীর।

গ) বীথী : বীথী ভানেরই অনুরূপ কারণ এতে কথন আছে। অঙ্ক সংখ্যা এক। এ রূপকে চরিত্রের সংখ্যা একটি বা দুটি। এর অঙ্গীরস হল শৃঙ্গার। তবে দরকারে অন্যসকল রসও মিশ্রিত হতে পারে।

ঘ) অঙ্ক : (উৎসৃষ্টাঙ্ক) প্রখ্যাত কাহিনীর নাট্যরূপ। এর অঙ্ক একটি এবং নায়ক হবেন কোনো লৌকিক ব্যক্তি। এ প্রজাতিতে বাক্যের মাধ্যমে যুদ্ধ ও জয়-পরাজয় ঘোষিত হয় এবং এতে স্ত্রীলোকের ক্রন্দন বা আর্তনাদ থাকে। এর অবলম্বন হল করুণরস।

আঠারোটি উপরূপকের মধ্যে অন্তত নয়টি রচিত হত একাঙ্ক আঙ্গিকে।

নাট্যকার ভাসের বেশ কিছু একাঙ্ক উত্তরকালের হাতে এসে পৌঁছেছে। তাদের মধ্যে 'মধ্যমব্যায়োগ' 'উরুভঙ্গম' প্রভৃতি একাঙ্ক বিখ্যাত। ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটক ক্রিয়া প্রধান নয়, রসমুখ্য। কাহিনী ও চরিত্রের রসগত সংস্থানের উপরই সংস্কৃত নাট্যকারেরা মনোযোগ দিতেন বেশি। অবস্থার সার্থক অনুকৃতি ছিল তাঁদের কাম্য। তাই নাট্যক্রিয়ার সংক্ষোভ সংস্কৃত নাটকে বিশেষ লভ্য নয়। কিন্তু আধুনিক কালের নাট্যকারগণ ক্রিয়াকেই প্রাধান্য দিয়ে নাট্যরচনা করে থাকেন। 'Drama is action Sir action'... একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার লুইজি পিরানদেল্লোর এ উক্তিটি আধুনিকতার প্রেক্ষিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একারণেই সংস্কৃত একাঙ্কের আঙ্গিক কৌতূহল জাগালেও আধুনিক নাট্যকারদের তেমন উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি।

মধ্যযুগের ইউরোপে বেশ কিছু নাট্য প্রজাতির সন্ধান মেলে যার আঙ্গিক ছিল একাঙ্ক। সারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল নানা ধরনের নামে। কখনো বড় নাটক শুরুর আগে কখনো বা দুটি বড় নাটক অভিনয়ের মধ্যবর্তী সময়টুকুতে প্রযোজিত হত এক একটি ছোট দৃশ্য। মধ্যযুগের গোড়ার দিকে ইংলণ্ডে এক ধরনের ছোট নাট্য নক্সা (Short dramatic sketch) মঞ্চস্থ হত যাদের নাম ছিল 'ইন্টারল্যুড'। সাধারণত ভোজসভাতে অনুষ্ঠিত হত এসব অভিনয়। ইংরাজি একাঙ্কের উদ্ভব নাকি এসব 'ইন্টারল্যুড' থেকেই। ক্রমে পূর্ণাঙ্গ নাটকের উদ্ভব হলে কখনো কখনো দুটি অঙ্কের মধ্যেও সন্নিবিষ্ট হত এধরনের 'ইন্টারল্যুড'। ইংরেজ নাট্যকার জন হেউড (১৪৯৭-১৫৮০) সর্বপ্রথম এই নাট্য আঙ্গিকটিকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ইংল্যাণ্ডের এ নাট্য আঙ্গিকটি সন্নিহিত দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়েছিল।

'ইন্টারল্যুড' ইতালিতে পৌঁছে নাম নিয়েছিল 'ইন্টারমেৎজি' (Intermezzi)। পনেরো শতকের শেষদিকে ও ষোড়শ শতকের গোড়ার সময়ে একটি সিরিয়স নাটক অথবা অপেরার দুটি অঙ্কের মাঝখানে অভিনীত হত এগুলো। খুবই হালকা ধরনের ছোট প্রহসন ছিল তারা। এ ধরনের বহু নাট্যদৃশ্য উত্তরকালের হাতে এসে পৌঁছেছে।

উনিশ শতকের ইংল্যাণ্ডে মূল পঞ্চাঙ্ক নাটক আরম্ভের আগে দর্শকদের খুশি করবার জন্য উপস্থাপিত হত একখানি হাস্য মুখর হাল্কা একাঙ্ক। বলা হয়, এ ধরনের একাঙ্ক বা ফার্সগুলো পরিবেশিত হত পরবর্তী পঞ্চাঙ্ক ট্র্যাজেডির বিভীষিকা থেকে দর্শকদের মনকে

খানিক প্রশমিত করতে। এগুলো অভিহিত হত 'কার্টেনরেইজার' নামে। বিশ শতকের গোড়ার দিকেও নাট্য প্রযোজনায় এ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কলকাতায় ইংরেজদের পরিচালিত রঙ্গালয়েও এ ধরনের 'কার্টেনরেইজার' অনেক অভিনীত হয়েছে। অর্ধেন্দু শেখরের 'মুস্তফি সাহেবকা পাক্কা তামাশা' উপস্থাপনে এ ধরনের ইংরেজি 'কার্টেনরেইজার' যে প্রভাব ফেলেছিল তা নিঃসন্দেহ। উনিশ শতকে কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় চলত প্রায় সারারাত ধরে। এসব প্রযোজনাতেও অনেক সময়েই সংযুক্ত হত একাঙ্কের লক্ষণ সম্বলিত ছোট নাটক যাদের বেশির ভাগই ছিল প্রহসন।

আধুনিক একাঙ্ক নাটক চরিত্র ও স্বভাবে পূর্ববর্তীদের থেকে স্বতন্ত্র। আধুনিক একাঙ্কের উদ্ভব জড়িত রয়েছে নিরীক্ষামূলক 'লিট্ল থিয়েটার' আন্দোলনের সঙ্গে। এ আন্দোলনের সূত্রপাত করে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের থিয়েটার লাইবর। তারপর ক্রমে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে বার্লিন, লণ্ডন, ডাবলিন, চিকাগো এবং অন্যান্য স্থানে। এ আন্দোলন থেকেই ঘটল একাঙ্ক নাটকের বর্ণময় আত্মপ্রকাশ, তা আর after piece হয়ে রইল না। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথও একসময় এ দেশে এ ধরনের 'লিটল থিয়েটার' আন্দোলন প্রবর্তনের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন।) এই আন্দোলনে নতুন জোয়ার আনে কিছু আদর্শবাদী এবং বিদ্রোহী যুবক। নাটককে এরা হাতিয়ার করে বিপ্লবী মানসিকতা প্রকাশ করে। নতুন এই চেতনা থেকে জন্ম নেয় বহু একাঙ্ক—যাকে সেসময় সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল আইরিশ নবজাগরণ। লিটল থিয়েটার আন্দোলন এর সঙ্গে যুক্ত হয়। যুক্ত হয় তিনের দশকে বামপন্থী বিক্ষোভ। বাণিজ্য চেতনাকে ভেঙে দিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে আবিষ্কৃত হয় এক নতুন শক্তি—এক নতুন প্রজন্মের নাটক সৃজন।

হাতে অর্থ নেই, বড় সময়াভাব অথচ পেশাদার রঙ্গমঞ্চের বস্তাপচা প্রযোজনা, যার সঙ্গে জীবনযন্ত্রণা বা যুগচেতনার কোনো সম্পর্ক নেই—কেবলমাত্র বুর্জোয়া বিলাসিতা—আর মানুষের মগজকে ভোঁতা করে দেবার কৌশলমাত্র—এটা তো চলতে পারে না। এই নতুন প্রজন্মের বিদ্রোহীরা তাই চাইল সমস্ত রকম অন্যায় বৈষম্য শোষণের বিরুদ্ধে থিয়েটারকে শাণিত অস্ত্রের মত ব্যবহার করতে। ফলে লেখা হতে লাগল অল্প দৈর্ঘ্যের নাটক এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলতে লাগল সেই নাটকের মহড়া। সেগুলি অভিনীত হতে থাকল কলকারখানার সামনে, রাস্তায়, মাঠে, গাড়ির গ্যারেজে, পার্কে সর্বত্র। মানুষ জীবনযুদ্ধের প্রতিফলন দেখতে পেল অপেশাদারী এই থিয়েটার আন্দোলনের মধ্যে—যার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিরূপে আমরা পেলাম সারা বিশ্বজুড়ে নতুন আঙ্গিকের একাঙ্ক—নতুন আন্দোলনের হাতিয়ার, যা সর্বদেশেই মনে হয়েছিল খুব সময়োপযোগী — গতিময়তার যুগের ফসল। আমাদের দেশে একাঙ্ক নাটকের আন্দোলন একান্ত ভাবেই সাম্প্রতিককালের। অবশ্যই এই আন্দোলনের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে আছে এদেশের আর্থ-সামাজিক নানা আন্দোলন। বিশ শতকের পুঁজিবাদ এবং সাম্যবাদের আর্থ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রেরণা থেকেই আধুনিক ছোটগল্পের মত একাঙ্ক নাটকেরও

জন্ম। উন্নত সমাজচেতনা, ব্যক্তি স্বাধীনতার আবেগ, শ্রেণীগতভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা আত্মবিকাশের স্পৃহা ও একাঙ্কের জন্মের নেপথ্য কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

যাই হোক, একাঙ্ক নাটক স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে একটি উপযুক্ত সংজ্ঞার সন্ধানে মনোযোগী হলেন নাট্যতত্ত্ববিদগণ। স্বভাবতই বিভিন্ন তাত্ত্বিকের দেওয়া সংজ্ঞার মধ্যে সাদৃশ্যের অভাব ঘটলো। একাঙ্ক সম্পর্কে মতামত বা সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য যেসব নাট্যতাত্ত্বিকের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় তাঁরা হলেন Shipley (Dictionary of World Literary Terms / P-224), John Hampden (Nine Modern Plays P-232), Percival Wilde (The One Act Play Today P-19-20), Benjamin Roland Lewis (The Technique of The One-Act Play P-21) John Farguson (Seven famous one-act plays / ভূমিকা অংশ), সাহিত্য দর্পণ (সম্পাঃ হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ ৬/৪) ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য (একাঙ্ক সঞ্চয়ন পৃ ১২), ভারতকোষ (২য় খণ্ড পৃঃ ২৭) ভরতের নাট্যশাস্ত্র (সম্পাঃ মনোমোহন ঘোষ), ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য (বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস ১/৩ পৃঃ ৪৭) ড. অজিতকুমার ঘোষ (একাঙ্ক সঞ্চয়ন পৃঃ ২২), সত্যেন্দ্র (হিন্দী একাঙ্কী পৃ- ১২৮) ড. দিলীপ কুমার মিত্র (একাঙ্ক নাটকের কথা পৃঃ ১১৪)। এঁদের দেওয়া সংজ্ঞা বা মতামতের কথা স্মরণে রেখেই একটি সহজগ্রাহ্য সূত্রে পৌঁছানো যেতে পারে :

১) একাঙ্ক নাটকের বাঁধুনি হবে নিরেট।

২) একাঙ্ক নাটককে অভিনীত হতে হবে কমবেশি এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে।

৩) একাঙ্ক নাটকে একটি দৃশ্য থাকতে পারে। আবার একাধিক দৃশ্য থাকলেও ক্ষতি নেই যদি তাতে থাকে—একটি মাত্র প্রতীতি সঞ্জাত সংক্ষিপ্ত নাট্য, কাহিনী যার লক্ষ্য হল কোনো চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশ এবং মানসিকতাকে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে একতম বক্তব্যে পৌঁছে দেওয়া।

৪) তা প্রকাশের জন্য নাট্যকার মেনে চলবেন শিল্পের শৃঙ্খলা ও পরিমিতিবোধ।

৫) ঘটনা ও পরিবেশ স্ফুটনের জন্য নাট্যকার যেমন বাস্তবজীবনকে বেছে নিতে পারেন, তেমনি তার অধিকার আছে প্রয়োজনে অলৌকিক অথবা রূপকথার কল্পজীবনকে নির্বাচিত করবার।

অর্থাৎ একাঙ্ক নাটকের লক্ষ্য হবে একমুখী, আয়তন স্বল্প, ঘটনা হবে সংক্ষিপ্ত—আর জীবনের খণ্ড অংশের মধ্যে দিয়েই পাওয়া যাবে জীবনের গভীরতম সত্যের শিল্পিত আভাস এবং ঐ খণ্ডাংশের মধ্যে দিয়েই উপলব্ধ হবে সমগ্রতার ইঙ্গিত।

একাঙ্ক নাটকে গুছিয়ে গল্প বলার অথবা চরিত্রের বিকাশ দেখানোর সুযোগ ও অবকাশ নেই। যেহেতু নাট্যকারকে এগোতে হয় যথাসম্ভব ত্বরিৎগতিতে তাই তাঁর চেষ্টা থাকে স্বল্পতম পরিসরে শীর্ষবিন্দু বা Climax-এ উপনীত হবার। নাট্যকার তাই সাধারণত একাঙ্ক শুরু করেন কোন সংকটের (crisis) চরম মুহূর্তে এবং দ্রুত পৌঁছে

যেতে চান শীর্ষবিন্দুতে। এই শীর্ষবিন্দু বা climax-এর উপরই নিবদ্ধ থাকে নাটকের যাবতীয় উৎকণ্ঠা (suspense)।

নাট্যকার সিড্‌নী বকস্‌ একাঙ্ক নাটকের ক্রিয়াকে ভাগ করেছেন এভাবে : (১) উন্মোচন (opening), (২) প্রকটন (exposition), (৩) সম্প্রসারণ (development), (৪) শীর্ষবিন্দু বা চরমক্ষণ (climax) এবং (৫) পরিসমাপ্তি (ending)।

দর্শক বা পাঠকের মনোযোগকে দ্রুত আকর্ষণ করার উপর নির্ভর করে একাঙ্ক নাটকের উন্মোচন অংশের যথার্থ সার্থকতা। পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক প্রবেশ করতে বাধ্য থাকবেন নাট্যকারের কল্পনার নিজস্ব জগতে। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নাট্যকার চমক সৃষ্টিতে গোড়াতেই আগ্রহী হতে পারেন। অথবা শুরু করতে পারেন শান্ত প্রস্তুতি নিয়ে। কিন্তু তাঁর প্রকটন ক্রিয়াটিকে হতে হবে অতিশয় প্রাঞ্জল। বিষয় জনিত জটিলতা প্রকটনে থাকতে পারে, কিন্তু তা যেন দর্শককে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য না করে যে নাট্যকারের নিজস্ব দৃষ্টির মধ্যেই রয়ে গেছে অস্বচ্ছতা। তাছাড়া একাঙ্কের ক্রিয়ার সম্প্রসারণেও এমন কোনো অবান্তরতা থাকবে না যা উন্মোচন ও প্রকটনের অনিবার্য ফসল বলে মনে হবে না। এখানেই আসে শিল্পে শৃঙ্খলার কথাটি। স্বল্পতম সময়ে চরম মুহূর্তে পৌঁছতে চান বলেই নাট্যকারকে অধিগত করতে হয় যুক্তির নির্যাসকে।

তারপর আসে চরম মুহূর্ত বা শীর্ষবিন্দু যা সম্প্রসারণের অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই আবির্ভূত হয়। এখানে উপনীত হবার জন্যই নাট্যকার গোড়া থেকে বুনে চলেন নাটকটি এবং চরম মুহূর্তে পৌঁছে নাট্যক্রিয়ার প্রতিটি সুতো টানটান করে বেঁধে দেন তিনি সমগ্রতার ঐক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে। এ প্রক্রিয়া সার্থক হলেই একাঙ্ক নাটকে আসে প্রত্যাশিত পরিসমাপ্তি। সাধারণত একাঙ্ক নাটকে শীর্ষবিন্দু ও পরিসমাপ্তি অবস্থান করে পিঠোপিঠি। চরমতম মুহূর্তে এসেই নাট্যকার চেষ্টা করেন যবনিকা টানতে, কেননা দর্শকদের উপর কাঙ্ক্ষিত অভিঘাতটি তিনি নিষ্ফল করে দিতে চান না।

বাংলা একাঙ্ক তার জন্মলগ্ন থেকে আধুনিক যুগে পৌঁছেছিল কালের স্বাভাবিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই। তার ওপর ইংরেজি একাঙ্কের প্রভাবের সাথে সাথে পাই সংস্কৃত ভাবনার স্পষ্ট ছাপ। প্রাক্‌ আধুনিক পর্বে বাংলা একাঙ্কের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ছাত্রের পরীক্ষা, অভ্যর্থনা, খ্যাতির বিড়ম্বনা, বিনি পয়সার ভোজ কৌতুক রসাত্মক হলেও একাঙ্কের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। আসলে বাংলা একাঙ্ক তার গড়ে ওঠার প্রথম পর্যায়ে সংস্কৃত ভান প্রহসন ও পাশ্চাত্য শারাডকেই অনুসরণ করেছিল এবং এই প্রজাতিটি যে জীবন সম্বন্ধে গভীর বোধ ও বিষয়কে প্রতিফলিত করার মাধ্যম হতে পারে এ ধারণা তখনও পর্যন্ত রচয়িতাদের উপলব্ধ হয়নি। ফলে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নাট্যকারদের একাঙ্কধর্মী রচনায় পেয়েছি লঘুতরল কৌতুক রস প্রবাহ। এর বিশিষ্ট নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা যায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের পঞ্চরংগুলি যেমন সপ্তমীতে বিসর্জন, বড়দিনের

বখশিশ, বেল্লিকবাজার, অমৃতলাল বসুর চোরের উপর বাটপাড়ি, ডিসমিস, চাটুজ্জে বাড়ুজ্জে, তাজ্জব ব্যাপার, কৃপণের ধন, দ্বিজেন্দ্রলালের পুনর্জন্ম, রাজকৃষ্ণ রায়ের দ্বাদশ গোপাল ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিঞ্চিৎ জলযোগ। বাংলা একাঙ্কের স্বর্ণদ্বার উন্মোচনে এই হ্রস্বাকৃতি প্রহসনগুলির গুরুত্ব কম ছিল না। শুধু এগুলিই নয়—এই সময়কালে সাময়িক পত্রিকাতেও বিদেশী ভাষা থেকে (মূলত ইংরেজি) অনূদিত অনেকগুলি একাঙ্ক নাটক প্রকাশিত হয়েছিল, যেগুলি পরবর্তীকালের বাংলা একাঙ্ককে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ দর্শকদের মনোরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে (অবশ্যই নিজেদের ব্যবসায়িক প্রয়োজনের তাগিদে) বড় নাটকের সঙ্গে আমদানি করলেন রঙ্গ-রস প্রধান হ্রস্বাকৃতি নাটক, কারণ মাত্র তিন ঘণ্টার নাটকে তখন দর্শক খুশি হত না। ফলে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটকের পাশাপাশি হ্রস্ব দৈর্ঘ্যের নাটকগুলির (বেশির ভাগই নিম্ন মানের হওয়া সত্ত্বেও) গুরুত্ব বাড়তে লাগল এবং ক্রমশ অনেকবেশি পরিমাণে এ জাতীয় নাটকের চাহিদা বৃদ্ধিতে হ্রস্ব-দৈর্ঘ্যের নাটকগুলির মানেরও উন্নতি ঘটল। মন্মথ রায়ের একাঙ্ক নাটকের আলোচনার প্রসঙ্গে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তাঁর প্রথম একাঙ্ক 'মুক্তির ডাক' স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল (২৫.১২.২৩), অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটক 'কর্ণার্জ্জুনে'র সাথেই। কাজেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটকের সাথে বাড়তি পাওনা হিসেবে অভিনীত হ্রস্ব দৈর্ঘ্যের নাটকগুলি যে পরবর্তীকালের শিল্পসম্মত একাঙ্ক রচনার অন্যতম প্রেরনা হিসেবে কাজ করেছিল একথা অস্বীকার করা যায় না।

মন্মথ রায় ১৯২৩ থেকে ১৯৮৭ (১৩৩১ বঙ্গাব্দ-১৩৯৩) দীর্ঘ ৬৪ বছর ধরে বিপুল সংখ্যক একাঙ্ক রচনা করেছেন। বিষয় বৈচিত্র্যে, আঙ্গিকের অভিনবত্বে, জীবনের গভীর রহস্যময় রূপের প্রকাশে, আধুনিক যুগবৈষম্যের তীক্ষ্ণ জীবন জিজ্ঞাসায়, সমাজ সচেতনায় তাঁর এই একাঙ্কগুলি স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যে বাংলা নাটকের ইতিহাসে আলাদা স্থান দখল করে নেয়। জীবিকার প্রয়োজনে তিনি বরাবর পূর্ণাঙ্গ নাটক, চিত্রনাট্য, যাত্রাপালা, রেকর্ডপালা, বেতারনাট্য লিখেছেন ঠিকই কিন্তু তবু সবচেয়ে কম অর্থ প্রদানকারী একাঙ্ক নাট্যরচনাই ছিল তাঁর শুদ্ধ সাহিত্য কর্মের প্রধান ফসল। তিনিই প্রথম নাট্যকার যিনি বাংলা একাঙ্কের জগৎকে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমতার সাহায্যে দীর্ঘ ৬৪ বছর ধরে সমৃদ্ধ করে গেছেন। বিষয় বৈচিত্র্যে এবং রচনার সংখ্যাধিক্যে তিনি আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর সবকটি একাঙ্কের বিস্তৃত আলোচনা প্রায় অসম্ভব। বিভিন্ন ধারার উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক গুলিকেই আলোচনার তালিকায় রাখা হল।

মন্মথ রায়ের প্রথম একাঙ্ক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে অখিল নিয়োগীর সম্পাদনায়। এই গ্রন্থে ৮টি একাঙ্ক আছে। রাজপুরী, বহুরূপী, উইল, বিদ্যুৎপর্ণা, স্মৃতির ছায়া, উপচার, পঞ্চভূত ও মাতৃমূর্তি। ১৩৬২তে দ্বিতীয় সংস্করণে 'স্মৃতির ছায়া' বাদ যায়, আর ১৪টি একাঙ্ক যোগ হয় মনোমোহন ঘোষের সম্পাদনায়।

যুক্ত একাঙ্কগুলি হল লক্ষহীরা, অপরাজিতা, উদ্ধার, কালীবাড়ি, উল্কাপাত, ক্ষণস্বপ্ন, ভূমিকম্প, তৃষ্ণা, অরূপরতন, বসুন্ধরা, যজ্ঞফল, কানাই-বলাই, টিয়া এবং আমরা কোথায়।

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে 'ছোটদের নাটমঞ্চ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ১৩৬৩তে এই সংকলনটি 'ছোটদের একাঙ্কিকা' নামে নতুনভাবে প্রকাশিত হয়। ১২টি একাঙ্ক যথাক্রমে শ্রীমন্ত ও লক্ষ্মীমন্ত, কালার কাণ্ড, কাজীর বিচার, অমূল্য মূল্য, চতুরে চাতুরী, সোনার তাল, দাদামশায়ের উইল, বিচার, উচিত শিক্ষা, বাণগড়ে একরাত্রি, পঞ্চপ্রদীপ ও রবি শশী তারা।

তৃতীয় একাঙ্ক সংকলন 'নব একাঙ্ক' প্রকাশিত হয় ১৩৬৫তে দশটি একাঙ্ক নিয়ে অর্কেষ্ট্রা, কামধেনু কবচ, রক্তকদম, অসাধারণ, সূর্যমুখী, বলহরি হরিবোল, টোটোপাড়া, সাংঘাতিক লোক, মাসতুতো ভাইরা ও রফা। বিচিত্র পটভূমিতে নাটকগুলির সৃজন হয়েছে। নানা অঞ্চলের মানুষের সমস্যা ও জীবনাচরণ কাহিনীতে স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ একাঙ্ক সংকলন 'ফকিরের পাথর' প্রকাশিত হয় ১৩৬৬তে। এই সংকলনে রয়েছে মোট ৯টি একাঙ্ক, প্রথম একাঙ্কটির নামে গ্রন্থটির নামকরণ হয়। গ্রন্থের আরও আটটি একাঙ্ক যথাক্রমে—'অসীমন্তিনী, সাবধান, যমালয়ে একবেলা, বিবসনা, বোমা, হারিকেন, একটা পাপ ও ওলট-পালট'। এই পর্বের রচনায় নাট্যকার কিছুটা কৌতুক মিশ্রিত কঠিন আঘাত হেনেছেন সমাজের প্রতি। নাটকগুলির আকার ছোট, কিন্তু বিষয় ও উপস্থাপনার গুণে তা হয়ে উঠেছে বিদ্যুতের বর্ণময় ছটা।

পঞ্চম একাঙ্ক সংকলন প্রকাশিত হয় পনেরোটি একাঙ্ক নিয়ে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে 'বিচিত্র একাঙ্ক' নাম নিয়ে। এই সংকলনের সব নাটকই জীবনের বিচিত্র সমস্যাকে নিয়ে লেখা। ভাবে ও আঙ্গিকে একাঙ্কগুলি অভিনব। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মূল্যবোধের অবনমন, মিথ্যাচার, ছলনা প্রবঞ্চনাকে নাট্যকার তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও বিদ্রূপের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করতে চেয়েছেন। তাই সমকালের নানা রাজনৈতিক অসঙ্গতি, ভণ্ডামি সামাজিক অনাচারের স্বরূপকে তুলে ধরেছেন একের পর এক একাঙ্কে। এই পর্বে মন্মথ বিষয় ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষাও করেছেন। জন্মদিন, এই দুই তিন, পলায়ন, ভূভার হরণ কর্পোরেশন, স্ট্যাচু, মানুষের কামড়ে, শেষ সংবাদ, মেলাও এবার হাত, দুর্বোধ্য, কুকুর-বেড়াল, চিত্রাঙ্গদা, অ-মৃত, সুনয়নী, গৃহরাজ্য ও গোপালের মা-র মধ্যে দিয়ে।

ষষ্ঠ সংকলন প্রকাশিত হয় ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে। 'দুর্গেশ নন্দিনীর জন্ম ও একাঙ্কগুচ্ছ' নামে প্রকাশিত। এই সংকলনে রয়েছে দশটি একাঙ্ক। দুর্গেশনন্দিনীর জন্ম, এক টিন বার্নিশ, একটি রাজকীয় মৃত্যু, মুখোশ, সত্যমেব জয়তে, বীক্ষণ, দাওয়াই, এই হয়েছে আইন, কষ্টিপাথর ও অলৌকিক। এ পর্বের সব রচনায় নাট্যকার সব রকমের সামাজিক বৈষম্য, ভণ্ডামি অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন।

সংকলনগুলিতে ব্যবহৃত একাঙ্কগুলি (৭৭টি) ছাড়া একাঙ্ক উদ্যান, একাঙ্ক অরণ্য,

একাঙ্ক অর্ঘ্য-তে পাই আরো ২৮টি একাঙ্ক। অবশ্য এর মধ্যে দু-একটি একাঙ্ক অবশ্য দুটি সংকলনেই ছাপা হয়েছে দেখা গেছে। তাছাড়া নাট্যকারের নিজস্ব সংগ্রহ এবং পত্র পত্রিকার মাধ্যমে পাওয়া মোট ২০৪টি একাঙ্কের মাধ্যমেই একাঙ্ক রচয়িতা মন্মথ রায়ের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই সংকলনগুলির অধিকাংশই সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহ, শাসক শ্রেণীর বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে লিখিত হয়। একাঙ্ক অর্ঘ্য-তে রয়েছে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জীবন নিয়ে রচিত একাঙ্ক, যা পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে, প্রেরণা দেয়।

মন্মথ রায় তাঁর একাঙ্কগুলিকে '‘একাঙ্কিকা’ নামকরণের পূর্বে বহু নামে চিহ্নিত করেছিলেন। আসলে নামকরণেই যে তাঁর তৃপ্তি আসছিল না এবং সাধনার পথে তিনি যে বস্তুটির সঠিক একটা রূপ দিতে চলেছেন একথা তাঁর বিভিন্ন নামকরণের প্রবণতা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। ‘রাজপুরী’কে তিনি আখ্যা দিয়েছেন দৃশ্যকাব্য, ‘লক্ষহীরা’-কে ‘একদৃশ্যে সম্পূর্ণ কথানাট্য’, ‘বিবাহ’কে বলছেন ‘একদৃশ্যে সম্পূর্ণ একাঙ্ক নাটক’, কালরাত্রিকে বললেন ‘কথানাট্য’। এছাড়া ‘সমগ্র নাটিকা’, ‘নাটিকা’, ‘একাংকিকা’ আখ্যা দিলেন যথাক্রমে উপাচার, মানুষের কামড়ে, মরা হাতি লাখ টাকা’কে। জেনে রাখা ভালো ‘বিদ্যুৎপর্ণা’ চারটি অব্যাহত দৃশ্যের সমন্বয়ে রচিত হয়েছে, ‘তৃষ্ণা’-তে সময় পার্থক্যে দুটি সেটের দুটি দৃশ্য ব্যবহৃত হয়েছে ‘ধর্মের হাট’-এ ৫টি সেটে, ৭টি দৃশ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় সে যুগে ‘ভারতবর্ষ’ মাসিক পত্রিকাটি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেই বহু একাঙ্ক নাটক প্রকাশ করেছিল। ১৩১৯ থেকে ১৩৭৩ বাংলার এই ৫৭টি বছরে কমপক্ষে এখানে ৬১টি একাঙ্ক বা ‘নাটিকা’ প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে ১৯টির রচয়িতা মন্মথ রায়। তাঁর একাঙ্ক প্রকাশনার ক্ষেত্রে এই পত্রিকার দান অবিস্মরণীয়। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় মন্মথর ‘রাজপুরী’ প্রকাশিত হবার পর ১৩৩৪ এর কার্তিক সংখ্যার মধ্যে তাঁর আটটি একাঙ্ক এখানেই প্রকাশিত হয়। মন্মথ রায়ের হাতে বাংলা একাঙ্ক প্রথম সার্বভৌম শিল্পরূপ লাভ করে। বক্তব্যের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রচনার আঙ্গিকটি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। ফলে বিভিন্ন রসের বৈচিত্র্য নিয়ে বিচিত্র স্বাদের একাঙ্ক সৃজন সম্ভব হয়েছিল।

বিষয় নির্বাচনে মন্মথ কোনো বাধা মানেন নি। সমসাময়িক ঘটনা, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা কিংবা সুপ্রাচীন কল্প-কাহিনী বা দেশীয় ঐতিহ্যের পটভূমিতে সমকালীন জনগণচেতনা তাঁর নাটকে যেমন অনায়াসে সন্নিবেশিত হয়েছে তেমনি সাম্প্রতিক অবক্ষয়ী জীবনের যুগযন্ত্রণা, জীবন-সৌন্দর্যের রসমধুর ছবিকেও তাঁর কুশলী লেখনী সৃজনের মর্যাদায় জীবন্ত করে তুলেছে। মনস্তত্ত্ব, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, হৃদয়ের স্বধর্ম, হৃদয়ের নানাবৃত্তি, সামাজিক চেতনা, রাজনীতিবোধ তাঁর নাট্যরচনার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মন্মথ রায়ের একাঙ্কগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি ক্রমশ ওপর তলা থেকে নীচের তলার মানুষের কাছে নেমে এসেছেন। আরম্ভ করেছিলেন রাজতন্ত্রের কাহিনীকে ঘিরে, পরে সামন্ততন্ত্র বা পুঁজিবাদী সমাজের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে তাঁর একাঙ্কগুলি। এরপর তিনি সাধারণ মানুষের মাঝে নেমে এসেছেন, সাধারণ পরিবারের

সুখদুঃখ, হাসিকান্নাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে তাঁর রচনা। ছয়ের দশকে এসে তিনি স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন যে তিনি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আর খুশি নন। ফলে তাঁর এই অসন্তোষকে ঘিরে রচিত হয়েছে রঙ্গ-ব্যঙ্গ কৌতুকে ঘেরা সামাজিক অসঙ্গতির চিত্র সমন্বিত বহু একাঙ্ক। এমনকি পাঁচ, দশ, কুড়ি, ও পঁয়ত্রিশ মিনিটে অভিনয়যোগ্য নাটকও তিনি রচনা করেছেন। এই অতি ছোট নাটকগুলি সম্পর্কে তিনি নিজে তার 'বিচিত্র একাঙ্ক'-এর ভূমিকায় লিখেছেন তা অনুধাবনযোগ্য। "আজ এই স্পুটনিক যুগের গোড়াতে আধঘণ্টার একাঙ্ক নাটকও চলছে। এমন দিনও আসছে যখন দশ মিনিটের নাটকেরও চাহিদা হবে। সেদিন আসছে মনে করে পাঁচ, সাত, দশ মিনিটের কিছু একাঙ্ক নাটকও রেখে গেলাম আমি।"

একাঙ্কিকা, নব একাঙ্ক, বিচিত্র একাঙ্ক, ফকিরের পাথর ও নাট্যগুচ্ছ, ছোটদের নাটমঞ্চ, ছোটদের একাঙ্কিকা প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর নানান স্বাদের একাঙ্কগুলি বিধৃত। শেষের দুটিতে শিশুদের জন্যে লেখা একাঙ্কই প্রচুর। 'কাজলরেখা' ইত্যাদি পড়লে বোঝা যায় তিনি শিশুদের জন্য নাটক রচনাতেও স্বচ্ছন্দ। এগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই রয়েছে কিছু উপদেশ। নাট্যদ্বন্দ্বেরও অভাব ঘটেনি। সেদিক থেকে তাঁর সকল একাঙ্ক রচনার মধ্যেই বার্নাড শ-এর কথা যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে— I do not write a single line except for teaching something. যেকোন সমস্যা তাঁকে জর্জরিত করলে নানা প্রশ্ন ও তর্কের সমাবেশ ঘটিয়ে তিনি সর্বদা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন। ফলে কখনও সখনও তা প্রচার হয়ে উঠলেও নাট্যকারের জীবনাদর্শ বোঝা গেছে খুব সহজেই।

পূর্ণাঙ্গ নাটকের মত তাঁর একাঙ্কগুলিতেও দুটি স্পষ্ট পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায়ের একাঙ্কগুলিতে দেখি রোমান্টিক ভাবনার প্রাধান্য, নরনারীর প্রেমভাবনার এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক রূপ। দ্বিতীয় পর্যায়ে নাট্যকার অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ। এই স্তরে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় মানুষের মানসিক জটিলতা, কপটতা, শঠতা, বঞ্চনা, নৈতিক স্খলন চিরন্তন মূল্যবোধকে কিভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে তার প্রাঞ্জল রূপায়ণ—হাসি কান্না, বেদনায়, সরল, সরস, ব্যঙ্গের অভিঘাতে।

একাঙ্ক রচনার প্রথম পর্যায়ে তিনি রাজতন্ত্রের পটভূমিকায় রচনা করেন— মুক্তির ডাক, রাজপুরী, লক্ষহীরা, অরূপরতন, বিদ্যুৎপর্ণা, মাতৃমূর্তি। এই পর্বে বৌদ্ধ যুগের কল্পিত ঐতিহাসিক রোমান্স-রসে তিনি গভীর ভাবে আপ্লুত ছিলেন। এ সব নাটকে প্রেমের জন্য হত্যা, আত্মহত্যা, বিষ প্রয়োগে প্রতিদ্বন্দ্বীর জীবনাবসান ঘটানো, সুন্দরী বারাঙ্গনার হৃদয় জয়ের জন্য সর্বস্ব পণ, প্রেমিকের চোখের মণির সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে জীবনভোর তার ধ্যান এবং তার জন্য যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকা প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকল্প বড় সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এগুলির বিষয় নারী ও পুরুষের নৈতিক স্খলন, রাজপুরুষের ব্যভিচার, স্বেচ্ছাচার, আধিপত্য বিস্তারের উদগ্র কামনা রূপায়ণের পাশাপাশি নিষিদ্ধ কামনার জ্বালাময়ী সর্বনাশা রূপের চিত্রায়ন।

মুক্তির ডাক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় হোস্টেলের ছাত্রদের অভিনয়ের জন্য লিখেছেন 'মুক্তির ডাক'। ১৯২৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর 'স্টার' থিয়েটারে অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় এটি অভিনীত হয়। প্রথমে এর নাম ছিল অম্বা। এতে ব্যবহৃত তিনটি সঙ্গীত রচনা করেন নরেন্দ্র দেব এবং অভিনয় করেছিলেন-- অম্বা : কৃষ্ণভামিনী, বিম্বিসার : প্রফুল্লবাবু, সুন্দরক : তুলসীবাবু, পদ্মা : নীহারবালা। নাটকে পুরুষ চরিত্র চারটি, স্ত্রী চরিত্র দুটি। নাটকটি অভিনয় সাফল্য লাভ না করলেও গুণীজনের প্রশংসা আদায় করে নেয়।

একটি বৌদ্ধ আখ্যায়িকা নাটকটির উপজীব্য। মগধাধিপতি বিম্বিসারের প্রণয়িনী বারাঙ্গনা শ্রেষ্ঠা অম্বার প্রতি আকৃষ্ট হয় শ্রেষ্ঠী সুন্দরক। সে নিজের সুন্দরী স্ত্রী পদ্মাকে অবহেলা করে। এদিকে পদ্মা পিতার সম্পদ লাভ করে। তখন সুন্দরক অম্বার দর্শনী-বাবদ দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা চায় পদ্মার কাছে। ইতিমধ্যে অম্বা এসে হাজির হয় সুন্দরকের গৃহে। পদ্মা তাকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়। সুন্দরক তার প্রাসাদ-ভবন অম্বাকে দান করে পদ্মাকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করে। বিম্বিসার অম্বার সন্ধানে সেই প্রাসাদে এসে হাজির হন। পদ্মা তাঁর কাছে বিচার প্রার্থনা করেন। বিম্বিসার বিচারের জন্য তাঁর রাজদণ্ড অম্বার হাতে তুলে দেন এবং পদ্মাকে আশ্রয় দিতে চেষ্টা করেন। রাজদণ্ড হাতে নিয়ে যখন ঈর্ষিত অম্বা পদ্মার ছিন্নশির সুন্দরককে দেওয়ার আদেশ করে তখন বিম্বিসার অম্বাকে জানান পদ্মা বিম্বিসার ও অম্বার অবৈধ সন্তান। অম্বার প্রাক্তন স্বামী সুচিত্রের গৃহে ধাত্রীর কাছে সে মানুষ। সুচিত্র সুন্দরকের সঙ্গে পদ্মার বিবাহ দিয়ে নিজে বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে যান। অনুতপ্ত অম্বা অবশেষে ভগবান বুদ্ধের চরণে আশ্রয় নিয়ে তার যথাসর্বস্ব সংঘে দান করেন। বুদ্ধের প্রবেশের সাথে সাথে সমস্ত নাটকীয় সংঘাতের সমাপ্তি ঘটে।

কাল্পনিক বৌদ্ধ আখ্যায়িকার পরিমণ্ডলে মন্মথ রায় এই একাঙ্কে নারীত্ব সম্পর্কে, নরনারীর প্রেম সম্পর্কে নতুন জিজ্ঞাসার সূত্রপাত করেছেন। বিবাহিত প্রেম ও বিবাহ সম্পর্রের বাইরের প্রেম সম্পর্কের এক নতুন মূল্যায়ন ঘোষনা করে। পাশাপাশি নারীর প্রেমাকাঙক্ষা, সতীত্ব, মাতৃত্ব এবং নারীত্বের আদর্শ ও ধর্ম নিয়ে নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন। অম্বার প্রেম, প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নারীত্ব সম্পর্কে তার অভিনব জীবন জিজ্ঞাসা চরিত্রটিকে আধুনিক করে তুলতে সাহায্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে নাট্যকার এ নাটকে সতীত্বের চেয়ে নারীত্বকে বেশি মর্যাদা দিলেও সুস্থ সমাজ অনুমোদিত দাম্পত্য প্রেমের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব গোপন থাকেনি। বৌদ্ধ আখ্যায়িকার নাট্যরূপ দিতে গিয়ে নাট্যকার বহু ঘটনা এবং প্রসঙ্গ এনেছেন। ফলে অনেক সময় এইসব চরিত্র ও ঘটনা বাস্তবের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অতি দ্রুত ধাবমান ঘটনার মধ্যে দিয়ে হৃদয়াবেগের যে জয়-পরাজয় ও মানব প্রকৃতির যে দুর্জ্ঞেয় রহস্যলীলা এই একাঙ্কে প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে দিয়েই অভিব্যক্ত হয়েছে নাটকীয় উৎকর্ষ। শিল্পসম্মত বাংলা একাঙ্ক নাটকের সার্থক উদাহরণ হিসেবে তাই এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়।

গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১) 'মুক্তির ডাক' গুণীজনের প্রশংসা পেয়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন, 'মুক্তির ডাক পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইহা সত্য সত্যই মুক্তির ডাক।' নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত নাট্যকারকে লিখেছেন, 'মুক্তির ডাক বাংলা নাট্যসাহিত্যে একটা নতুন পথ ধরিয়াছে তাহা সবাই স্বীকার করিবে।' প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, 'আপনার নাটকখানির মহাগুণ এই যে এখানি যথার্থই একখানি ড্রামা।' নজরুল লিখেছেন, 'সূর্যকে অভিবাদন করতে পারি কিন্তু তাকে উজ্জ্বলতর দেখানোর মত আলো ও অভিমান আমার নেই।'

সেযুগের বহুপ্রচারিত নাট্যপত্রিকা 'শিশির' (১৩৩০ এর ১৩ই পৌষ সংখ্যায়) লিখেছে : 'ছোট একখানি ছবির মত বই। এক দৃশ্যে সম্পূর্ণ। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-প্রভাব যখন অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, আপামর সাধারণ ভগবান বুদ্ধের শরণ লইয়া মুক্তি মার্গের সন্ধানে ছুটিয়াছিল — আখ্যায়িকাটি সেই সময়কার। একটা কুহেলিকাবৃত শান্তির পথে চলিতে চলিতে যেদিন নাটিকার চারিটি নায়ক নায়িকা হঠাৎ যখন মেঘমুক্ত সূর্যের রূপ দেখিতে পাইল, তখন তাহাদের জীবনের গতি এক ভীষণ অভিশাপ তরঙ্গে নিমজ্জিত হইয়া গেল। তখন বুদ্ধের মুক্তিমন্ত্র গ্রহণ করা ছাড়া আর কাহারো কোন উপায় রহিল না। শেষ পর্যন্ত দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে এ নাটকখানি।'

সাহিত্য পত্রিকা 'প্রবর্ত্তক' (১৩৩১ আষাঢ় সংখ্যায়) লিখল ঃ 'মুক্তির ডাক নাটকখানি ক্ষুদ্র হইলেও প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। পড়িতে পড়িতে মেটারলিঙ্কের 'মনাভনার' কথা মনে পড়ে যায়। নাটকখানি ঠিক সেইরূপই। নাটকখানিতে পাকা হাতের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে।'

একাঙ্ক প্রথম খণ্ড, প্রথম পর্ব, সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের পর পরবর্তীকালে আনন্দবাজার পত্রিকা (১৮ই জানুয়ারি ১৯৮২) লিখেছে : "মুক্তির ডাক নাটকেই দেখা গেল যে একাঙ্ক নাটক প্রকৃত সাহিত্যের গুণ নিয়ে উপস্থিত। দৃশ্যকাব্য এবং রসোত্তীর্ণ নাট্য-রচনা দুই-ই একসঙ্গে পাওয়া গেল।"

যুগান্তর (৪ঠা মার্চ ১৯৮২) লিখেছে : "শুধুমাত্র একটি অঙ্কেই শেষ বা অল্প সময়ে স্বল্প পরিসরে শেষ একাঙ্কের শেষ কথা নয়। অবশ্যই সময়, স্থান ও চরিত্রের পরিমিতি একাঙ্ক নাটকে বাঞ্ছনীয়। তবে আসল দরকার স্থির লক্ষ্যে একমুখিতা। সেই বৈশিষ্ট্য নিয়েই প্রথম একাঙ্ক নাটক মুক্তির ডাক।"

সাপ্তাহিক সত্যযুগে (২৩ এপ্রিল ১৯৮২) লেখা হল ঃ- "মুক্তির ডাক নাটক উপস্থাপনের মাধ্যমে তিনি দুটি বিষয়ে চমক সৃষ্টি করেন। এক, পঞ্চাঙ্ক নাটকের বিস্তৃতিকে এক অঙ্কের আঁটসাঁট বন্ধনের মধ্যে সংহত করে কীভাবে একটি সময় সংক্ষেপ দৃঢ়পিনদ্ধ নাট্য প্রস্তুত করা যায় তার পরীক্ষা নিরীক্ষায় অভূতপূর্ব সাফল্যের প্রমাণ দান ; দুই, ভাষায়, ভঙ্গীতে, চিন্তায়...একজন চব্বিশ বছরের যুবার পক্ষে এমন পরিণত মনন ও ভাবনের ঠাসবুনন নাট্যরচনা...তাও এমন আঙ্গিকে যার কোন পূর্ব নজির আমাদের সাহিত্যে ছিল না।"

কাজেই বিষয় বিন্যাসে জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে, আঙ্গিকের অভিনবত্বে মুক্তির ডাক বাংলা একাঙ্ক নাটকের জগতে একটি নতুন দরজা খুলে দিল। নাটকটির আঙ্গিকের আকস্মিকতা, অপ্রত্যাশিত নতুনত্ব ও অভিনয়কালের স্বল্পতার জন্য নাটকটি বেশিদিন চলেনি। কিন্তু সে যুগে একটা ধারা তৈরি করেছিল।

সেমিরেমিস : ১৩৩০ সালে রচিত। নাট্যকার নিজেই স্বীকার করেছেন 'সেমিরেমিস Historians' History of the world-এর' একটি আখ্যায়িকার অতি অস্পষ্ট ছায়াচিত্র।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল থেকে প্রকাশিত ছাত্রদের বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা 'বাসন্তিকা'তে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এক অঙ্ক, এক দৃশ্যের নাটক। এর চরিত্র সংখ্যা ৬টি – ২টি নারী ও ৪টি পুরুষ। ইতিহাসের আদিম যুগে রানী সেমিরেমিস ভারত আক্রমণ করেছিলেন। এই অস্পষ্ট ঐতিহাসিক কাহিনীকে নিজস্ব কল্পনায় রঞ্জিত করে নাট্যকার নাট্যকাহিনী গড়ে তুলেছেন। নজরুল ইসলাম এ নাটিকাটি পাঠ করে পত্রে নাট্যকারকে অভিনন্দিত করেছিলেন : "আপনাকে প্রশংসা করার শক্তি আমার নেই। ......সেমিরেমিস পড়ে কী যে আনন্দ পেয়েছি তা বলে উঠতে পারছিনে। যতবার পড়ি ততবারই নতুন মনে হয়। আজ ইউরোপে জন্মালে আপনার প্রশংসায় দশদিক মুখরিত হয়ে উঠতো। ঈর্ষার এবং ততোধিক ঈর্ষাতুর সাহিত্যিকের দেশে আপনার যোগ্য আদর হয়নি দেখে বিস্মিত হইনি একটুও। দুঃখিত যতই হই। ......সেমিরেমিসে আমি যেন তলিয়ে গেছি। এত বড় সৃষ্টি...এর সৃষ্টির সার্থকতার ও পরিপূর্ণতার দিক দিয়ে বলছি – আমায় আর কারুর কোনো লেখা এত বিচলিত করেনি।" (*নাট্যকারকে লেখা নজরুলের ৪.৭.২৭ পত্র থেকে*)

রাজপুরী : ভারতবর্ষ (১৩৩২ শ্রাবণ সংখ্যায়) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে ১৩৩৮-এ অখিল নিয়োগীর সম্পাদনায় 'একাঙ্কিকা' সংকলনে এটি সংকলিত হয়।

বৌদ্ধ কাহিনীকে মূল কাহিনী হিসেবে নাট্যকার গ্রহণ করেছেন। ভদ্রশাল জাতকের কাহিনীর সঙ্গে 'রাজপুরী'র কাহিনীর মিল এত বেশি যে এটি ভেবে নেওয়া অস্বাভাবিক হবে না যে ঐ জাতকের কাহিনীকেই সামান্য কিছু অদলবদল করে রাজপুরী নাটকের কাহিনী অংশ গড়ে তোলা হয়েছে। এ নাটকের চরিত্র সংখ্যা আট--পুরুষ পাঁচ, নারী তিন।

কোশলরাজ আভিজাত্য রক্ষার জন্য তলোয়ারের জোরে বিবাহ করলেন বাসবক্ষত্রিয়াকে। বিবাহের ষোল বছর পর জানা গেল সে কপিলাবস্তুর এক নর্তকীর কন্যা। এই দীর্ঘ ষোলো বছর মিথ্যা পরিচয়ে অর্জিত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রানী বাসবক্ষত্রিয়ার জীবনে তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত রানী বারবার চেষ্টা করেছেন রাজপুরীর বাইরে বেরিয়ে আসতে। অবশেষে এই অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের জন্য তিনি কৌশলে রাজার কাছ থেকে নির্বাসন দণ্ড ভিক্ষা করে রাজপুরী

পরিত্যাগের পর আত্মবিসর্জন করে রাজপুরীর মিথ্যা মর্যাদার আভিজাত্যের ওপর চরম আঘাত হেনে রাজার ক্রোধ থেকে শাক্যদের রক্ষা করেছেন। কাহিনীর মূল পটভূমি কোশলরাজ এবং শাক্যবংশের সঙ্গে বিরোধ হলেও নাট্যকাহিনীতে প্রাধান্য পেয়েছে রাজপুরীর রানী বাসবক্ষত্রিয়ার অন্তর্লোকের রহস্য উন্মোচন।

কাহিনী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তীব্র গতিময়। নাটকের পরিণতি পর্যন্ত নাট্যকার এক তীব্র নাট্যোৎকণ্ঠা জাগিয়ে রাখতে পেরেছেন। এ নাটকে স্থান, কাল ও ক্রিয়াগত ঐক্য সঠিকভাবে মানা হয়েছে। রাজপুরীর চৌহদ্দিতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই এর কাহিনী শেষ হয়েছে। নাটকের শুরুতে আছে বিস্তৃত পটভূমি বর্ণনা। এই বর্ণনা পড়তে পড়তে অনায়াসে নাট্যকারের বর্ণনার রেখাপথ ধরে মঞ্চে চলে আসতে পারেন পাঠক। পটভূমি বর্ণনাতেও নাটকীয় পারম্পর্য লক্ষ্য করার মত। শ্রাবস্তীতে ঘটনাটা ঘটতে চলেছে একথা জানাবার পর নাট্যকার পাঠককে নিয়ে গেছেন প্রসেনজিতের প্রমোদ-উদ্যান ভবনে। সময় রাত্রি। তারপর জানানো হয়েছে কি উপলক্ষে উৎসব এবং উৎসবের স্বরূপ। মঞ্চের বর্ণনায় আছে একটি কক্ষ এবং তিনটি দরজা। মাঝের বিশাল দরজা দিয়ে পুত্র রাজশেখরকে নিয়ে রাজা রানীর প্রবেশ। রাজার হাতে স্বর্ণপেটিকা – প্রজারা সুশৃংখলভাবে সারিবদ্ধ। হোলির গান শেষ হলে রাজারানীকে তারা নত করে অভিবাদন করবে। নাট্য মুহূর্তের এই বর্ণনায় পাঠকের চোখের অনায়াসে সামনে ফুটে উঠবে রাজপ্রাসাদের বাস্তবচিত্র।

নাটকটি দ্বন্দ্ব সংঘাতে মুখর। অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বহির্দ্বন্দ্বের সমন্বয়ে রানী বাসবক্ষত্রিয়ার আত্মিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে এ নাটকে এক ভাব নিবিড়তা সঞ্চারিত হয়েছে এ নাটকের ঘনীভূত রস – করুণ রস, যা রানীর চরিত্রকে কেন্দ্র করে জাগ্রত হয়েছে। সংলাপ রচনাতেও নাট্যকারের মুন্সীয়ানা অস্বীকার করার নয়। অর্থাৎ সার্থক শিল্পসম্মত একাঙ্কের সব লক্ষণগুলিই 'রাজপুরী' নাটকে পাই। অবশ্য নাট্যকারের আসল কৃতিত্ব এই যে তিনি বৌদ্ধ কাহিনীকে আনুপূর্বিক অনুসরণ না করে বক্তব্যের বিশেষ মেজাজের দিকে লক্ষ্য রেখে কাহিনীকে আপন উদ্ভাবনী শক্তিতে একান্ত নিজস্ব করে নিয়েছেন।

লক্ষহীরা : ভারতবর্ষ পত্রিকায় (১৩৩৩, আষাঢ় সংখ্যায়) প্রথম প্রকাশিত হয়। এ নাটকে চরিত্র চারটি—দুটি নারী, দুটি পুরুষ। এ নাটকে দেখি প্রচলিত কাহিনীর পটভূমিকায় জীবনসত্যের নিরূপণ। বারবনিতা লক্ষহীরা বিকৃত ব্যভিচারী সমাজের সত্যস্বরূপ উপলব্ধির পর ঘৃণা ও বেদনায় তাকে প্রত্যাখ্যান করে বারবিলাসিনীর জীবনকেই বরণ করে নেয়। যে সমাজ স্বামীর বিকৃত কামনাকে চরিতার্থ করবার জন্য স্ত্রীর দেহদানকে পতিভক্তি বলে দাবি করে, সেই জঘন্য সমাজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক সে রাখতে চায়নি। যে দেহ বিলাসিনী লক্ষহীরার চরণতলে সর্বস্ব দিয়ে রাজা ধন্য হন, সেই লক্ষহীরার রূপে কুষ্ঠব্যাধি আক্রান্ত দরিদ্র যুবকও কামার্ত হয়ে পড়ে। তার পতিব্রতা স্ত্রী অদিতি স্বামীর কামনাকে পরিপূর্ণ করার জন্য নিজের কেশ বিক্রি করে একশত স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ

করে রাজনটী লক্ষহীরার প্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হয়। সন্ন্যাসী চন্দন দত্ত অদিতির পাতিব্রত্য দেখে লক্ষহীরাকে অনুরোধ জানায় ব্যাধিগ্রস্ত যুবকের কামনা চরিতার্থ করবার জন্য। ঘৃণায় লক্ষহীরা তা প্রত্যাখ্যান করে। সমাজ অনুমোদিত বিবাহিত প্রেমের প্রতি সে তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করে ব্যভিচারী সমাজের কুৎসিত রূপটি উপলব্ধি করে। এই সমাজে দেহের মূল্যেই নারী পুরুষের কাছে যুগ যুগ ধরে আদৃত। এই মানদণ্ডেই বিচার্য--জীবন থেকে উদ্ভুত এই গভীর আত্মজিজ্ঞাসায় পরিসমাপ্তি ঘটেছে এ নাটকের--"এই তোমাদের সতী? এই সংসারের আদর্শ?" প্রকৃত পাতিব্রত্য কি এ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেছেন নাট্যকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে।

অরূপরতন : ভারতবর্ষ (১৩৩৩ কার্তিক) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এ নাটকের চরিত্র সংখ্যা দশ--৩টি নারী, ৭টি পুরুষ। স্থান ও কাল ঃ চিত্রকূট জনপদ-প্রান্তে কাশীরাজের শিবির। কাহিনীর সূচনা রাত্রিতে, সমাপ্তি প্রভাতে। একটি দৃশ্যের একাঙ্কিকা কিন্তু দৃশ্য সজ্জা তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে দরবার, দ্বিতীয়ভাগে অতিথি নিবাস ও তৃতীয়ভাগে বিলাসকক্ষ। অজন্তা গুহার চিত্র পরিকল্পক সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী রেখানাথ কাশীরাজ বৃহদ্রথের কন্যা লেখার ছবি আঁকতে অস্বীকৃত হয়েছেন। এই খবরে লেখার সদ্যপরিণীত স্বামী কোশলেশ্বর জয়াদিত্য ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে এসেছেন রেখানাথকে দণ্ড দিতে। হয় রেখানাথকে রাত্রি-প্রভাতের মধ্যে তার কল্পিত সুন্দরীর সৌন্দর্যমূর্তি রূপায়িত করে তুলতে হবে নতুবা তিনি জয়াদিত্যের জয়যাত্রার রথচক্রে চূর্ণ হবেন। পরদিন প্রভাতে সম্পূর্ণ সাদা চিত্রপট রাজকন্যাকে উপহার দিয়ে রেখানাথ স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। প্রকৃত সৌন্দর্য তো অধরা -- তাকে রেখায় সীমায়িত করা যায় না। নাট্যিক সংঘাতে সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে এই কাব্যিক অনুভূতি। বৃহদ্রথ, জয়াদিত্যের রাজসিক দম্ভ, রাজকন্যা লেখার অন্তর্দ্বন্দ্ব, রেখানাথ চরিত্রটির রহস্যময়তায় এই নাটকটিতে কাব্যিক আমেজ সৃষ্টি হয়েছে। ঘাত প্রতিঘাতে জমজমাট এই একাঙ্কটিতে এই সত্যই উদ্ভাসিত যে সৌন্দর্যের চরম বিকাশ মনে--কারণ অরূপরতনের ছবি তো রেখা দিয়ে আঁকা যায় না।

বিদ্যুৎপর্ণা : একাঙ্কটি 'ভারতবর্ষ' (১৩৩৪ আষাঢ়) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। চারটি দৃশ্য সমন্বিত একাঙ্ক। মোট আটটি চরিত্র--পুরুষ ৫, নারী ৩।

এর কাহিনী হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম সংঘর্ষের পটভূমিকায় প্রেমের এক জটিল রূপায়ণ। হিন্দুধর্ম বিরোধী বৌদ্ধ রাজাকে হত্যা করার জন্য পুরোহিত বেদে বেদেনীর অনাথা কন্যা বিদ্যুৎপর্ণাকে শৈশব থেকেই সাপের বিষ পান করিয়ে বড়ো করেছেন। এ কন্যার বিষ স্পর্শে মৃত্যু অবধারিত। একথা জানেন কেবল পুরোহিত। বিদ্যুৎপর্ণার রূপের আকর্ষণে অনেকেই যারা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সেই কামন্দক, শতযুদ্ধের বীর যুধাজিৎ--সবাইকে পুরোহিত সরিয়ে দিয়েছেন পৃথিবী থেকে। কিন্তু তাঁর শিষ্য ইন্দ্রজিৎ

বিদ্যুৎপর্ণার প্রতি আকৃষ্ট একথা জানার পর তিনি স্নেহবশত ইন্দ্রজিৎকে সে পথ থেকে ফেরাতে গিয়ে আবিষ্কার করেন যে বিদ্যুৎপর্ণার প্রতি তার নিজেরও আকর্ষণ বড় কম নয়। বিদ্যুৎপর্ণা ইন্দ্রজিৎকে সত্যিই ভালবাসে। অথচ সে জানে না নিজের বিষাক্ত অস্তিত্বের কথা। এক চরম মুহূর্তে বিদ্যুৎপর্ণার আলিঙ্গনে রাজাও প্রাণ হারান। তখন প্রিয় শিষ্য ইন্দ্রজিৎকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পুরোহিত বিদ্যুৎপর্ণাকে চুম্বন করে প্রাণ বিসর্জন দেন। বিদ্যুৎপর্ণা তখন নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে সরসীর জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন করে।

এ নাটিকাটিতে প্রেম, কামনা, বাসনা, প্রমত্ততার তীব্র দহনজ্বালা, রুদ্ধশ্বাস গতি ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। ড. অজিতকুমার ঘোষ এ নাটিকাটিকে শ্রেষ্ঠ একাঙ্কের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। (বাংলা নাটকের ইতিহাস / অজিতকুমার ঘোষ)

একাঙ্কটিতে তীব্র উত্তেজনার চূড়ান্ত পরিণতিতে ট্র্যাজিক সমুন্নতি, পুরোহিতের ষড়যন্ত্র, বিদ্যুৎপর্ণার প্রতি তাঁর কামনাজনিত অন্তর্দাহ, পরম স্নেহবশত ইন্দ্রজিৎকে রক্ষার জন্য পুরোহিতের আত্মিক দ্বন্দ্ব, বিদ্যুৎপর্ণার বিষাক্ত অস্তিত্বের কারণে সমগ্র নাটক জুড়ে গতিময় সংশয়ের দোলা নাটকটি সার্থক একাঙ্কের মর্যাদা দিয়েছে। এ নাটকের পরিণতি অপূর্ব কাব্যময়। একাঙ্ক নাটকের রূপ ও রীতি নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা নাট্যকার করতে শুরু করেছেন এ সময় থেকেই। পরবর্তীকালে ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্সের জন্য মন্মথ ১৩৪৪ সালে নতুন করে লেখেন এ নাটকটি পরিবর্ধনের ফলে চরিত্র সংখ্যাও বাড়ে। কাহিনীও পরিবর্তিত হয়। শেষে দেখি মোহান্ত বিদ্যুৎপর্ণার হাতে মন্দিরের বিগ্রহের ভার তুলে দেন। কারণ তখন সে যথার্থই পরিণত হয়েছে দেবদাসীতে।

মাতৃমূর্তি : প্রথম প্রকাশ 'কল্লোল'-এ (১৩৩৫ কার্তিক)। চরিত্র সংখ্যা পাঁচ—পুরুষ ৩, নারী ২। এ কাহিনীতে দেখি শিল্পীসত্তার রহস্যময় প্রকাশ। শিল্পীর অন্তরের কামনা বাসনা অনেক সময় সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয় না বলে মানুষ তাকে ভুল বোঝে। যেমন ভুল বুঝেছিলেন গৌড়পতি মহাপালদেবের মহারানী। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ভাস্কর ধীমান মহারানীর প্রস্তর নির্মিত ছয়টি মূর্তি গড়ার পর সপ্তম মূর্তি গড়ার সময় তার অশান্ত আবেগপূর্ণ বল্গাহীন প্রেম তার নিজের তৈরী ঐ মূর্তির মাঝে যে এক মাতৃরূপাকে আবিষ্কার করেছিল—এ সত্যটি রানী উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি ভেবেছিলেন তরুণ শিল্পী বুঝি তাঁর প্রতিই আকৃষ্ট। গোপন মিলনের অভীপ্সায় রাত্রে তিনি শিল্পভবনে গেলে তাঁর ভুল ভাঙে। ধীমানের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় তখন। সে জানিয়ে যায়—"তোমারই গর্ভে হবে আমার স্থান......আমি হব তোমার পুত্র, তুমি হবে আমার মা। 'মাতৃমূর্তি' শিল্পীর মাতৃভাবনাকে প্রণয় ভেবে ভুল বোঝাবুঝির ট্র্যাজিক পরিণতি। কাহিনীর অবিচ্ছিন্নতায়, পরিমিত দৈর্ঘ্যে একমুখী গতিতে, ভাবনিবিড়তায় এ নাটক দৃঢ়পিনদ্ধ একাঙ্কের মর্যাদা লাভ করেছে।

ধনী সমাজের নৈতিক স্খলনের ছবিও মন্মথ তাঁর বহু একাঙ্কে ফুটিয়ে তুলেছেন। পুরুষশাসিত সমাজে উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের পুরুষের লাম্পট্য, ধর্মের নামে অধর্মাচরণ ও ব্যভিচারের কুৎসিত রূপ উন্মোচনের জন্য তিনি নির্মমভাবে তাদের মুখোশ খুলে দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি—'যজ্ঞফল', 'রথচক্র', 'উইল', 'উপচার', 'ইলা', 'সোমেশ সরকার' 'উল্কাপাত'-এ।

যজ্ঞফল : 'সবুজপত্রে' (১৩৩২ অগ্রহায়ণ) প্রথম প্রকাশ। চরিত্র সংখ্যা পাঁচ—পুরুষ ৪, নারী ১। সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন তান্ত্রিক গুরুর ব্যভিচারের পরিণাম যে কত মারাত্মক হতে পারে, এই একাঙ্কটিতে নাট্যকার তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। জমিদার কালিকাপ্রসাদ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেন। মহাতান্ত্রিক গুরুদেবের সাধনায় কালিকাপ্রসাদের স্ত্রী হৈম পুত্রবতী হলেন, কিন্তু পুত্রের জন্মের পরই তার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিল। চিকিৎসকের নির্দেশে সেই শিশুপুত্রটিকে তার নিঃসন্তান মাসীর কাছে পাঠানো হল লালন-পালনের জন্য। পুত্রটিকে পাঠিয়ে দেবার পরই হৈম স্বাভাবিক হয়ে গেল। দীর্ঘদিন পর হৈম যখন তার স্বামীকে পোষ্য পুত্র গ্রহণের বাসনার কথা বলল তখন কালিকাপ্রসাদ তাকে তার পুত্রের কথা জানান। হৈম সেই পুত্রকে দেখতে আগ্রহী হয়। পুত্র যখন তার মায়ের কাছে এসে দাঁড়ায় হৈম তখন তাকে গুলি করে হত্যা করে। কারণ সে সন্তানের মধ্যে গুরুদেবের ছায়া দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এইভাবেই নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটে। যজ্ঞের আড়ালে সরলতার সুযোগে তান্ত্রিক গুরুর ব্যভিচারের রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই একাঙ্কটিতে। মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দ্বন্দ্বে যে নাট্য সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছে তাতে ধর্মের নামে প্রবঞ্চনা ও ব্যভিচারের রূপ বেশ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

উদ্ধার : প্রথম প্রকাশ শ্রীহর্ষ শারদীয়া-য় (১৩৩৮)। চরিত্র সংখ্যা পাঁচ—নারী ১ পুরুষ ৪। বন্যা বিধ্বস্ত বাংলার গ্রাম। জল হু হু করে বাড়ছে। আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে বাঁশের মাচায় আশ্রয় নিয়েছে পাঁচ জন অসুস্থ বৃদ্ধ পুরোহিত ও বৃদ্ধের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, সন্তান, ভাগচাষী পরাণ ও সুদের কারবারী মহাজন প্রিয়লাল। বিপর্যয়ের মধ্যে চরিত্রগুলিকে খুব সহজেই চেনা যায়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে মহাজনের প্রলোভন ও কু-প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে সৌদামিনী। পাতিব্রত্যের জয় হয়। জয় হয় সততার। সততার জোরেই সে সকলকে নিয়ে বাঁচে।

রথচক্র : প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (১৩৩২, মাঘ)। চরিত্র সংখ্যা তিন—১ পুরুষ, ২ নারী। এ কাহিনীর নায়ক রাঘবেন্দ্র বংশানুক্রমিক লম্পট। সে চারিত্রিক অবনমনের এমন স্তরে পৌঁছে গেছে যেখানে তার পালিতা বোনকে ভোগ করতে তার বিবেক ও রুচিতে বাঁধে না। পরে সে যখন জানতে পারে যে সেই পালিতা ভগ্নীটি তারই পিতার অবৈধ সন্তান তখন সে আত্মহত্যা করে।

উইল : 'ভারতবর্ষ' (১৩৩৪, আশ্বিন)-তে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ কাহিনীতে চরিত্র আছে পাঁচটি—পুরুষ ৪, স্ত্রী ১। এক খনি মালিক মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি কুলীপাড়ার শ্রমিকদের উইল করে দিয়ে দেন। শ্রমিক বস্তির এক নারীর গর্ভে তার যে কন্যা জন্ম গ্রহণ করেছে, তার প্রতি দুর্বার অপত্য স্নেহের প্রকাশ এই ভাবেই ঘটে। এ নাটকে খনি-মালিকের অন্তর্জীবনের রহস্য মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনে চিত্রিত হয়েছে।

উপচার : 'আত্মশক্তি' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৫৩) প্রথম প্রকাশিত হয়। চরিত্র সংখ্যা চার—পুরুষ ৩, নারী ১। কামলোলুপ পশু শক্তির বর্বরতা, ধর্মের নামে ব্যভিচার, নারীর ত্যাগ—এ নাটকের বিষয়বস্তু। সাধ্বী শিরোমণি ভৈরবী তারা স্বামীর কল্যাণের আশায় নারী জীবনের ঘৃণ্যতম কলঙ্ক শেষ পর্যন্ত বরণ করে নিতে বাধ্য হয়। গ্রামের জমিদার তার ছেলের আরোগ্যের জন্য দুর্গাপূজার আয়োজন করেছেন। পূজায় বারাঙ্গনাদ্বার মৃত্তিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু মহাষ্টমীর দিনে জানা গেল, দেবী স্নানের জন্য সেই মৃত্তিকা পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রামের প্রান্তে পঞ্চবটীর তলায় আশ্রম করে বাস করছে রুগ্ণ মুমূর্ষু ভৈরব তারানাথ আর তার যৌবনবতী স্ত্রী তারা ভৈরবী। গভীর রাতে নায়েব থেকে জমিদার—সকলেই তারা ভৈরবীর আশ্রমে হাজির হয় কুৎসিত প্রস্তাব নিয়ে। তারা ভৈরবীর সামান্য দেহদানে যদি দেবীর মহাস্নান সম্পন্ন হয় এই আর্জি তারা পেশ করে। পতিপ্রাণা তারা ফুঁসে ওঠে। সেও তো দেবীর কাছে এসেছে স্বামীর আরোগ্য কামনা নিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে হার মানতে হয়, জমিদারের কাছে বলতে বাধ্য হয়—"নাও...তুমি আমার দুয়ারের সকল মাটি নাও...কর পুজো...পুজো...নইলে বাঁচে না...ও বাঁচে না।"

ভৈরবীর এই নিষ্ঠা ও ত্যাগ পাঠকের মনে বিস্ময় ও বেদনা উদ্রেক করে। অপূর্ব শৈল্পিক কুশলতায় নাট্যকার সমবেদনায় সিক্ত করে ভৈরবীর মানসিক যন্ত্রণা, অসহায়তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। নারীর দুর্বলতা ও অসহায়তার সুযোগে কামলোলুপ পুরুষের আগ্রাসী ক্ষুধার জান্তব চিত্রকেও স্পষ্ট করেছেন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের কশাঘাতে। শ্লেষাত্মক তুলির টানে গ্রামের অর্থবান বর্বরদের মুখোশ নাট্যকার খুলে দিয়েছেন নির্মমভাবে। নাটকের শেষে দেখি, ঐ চরম মুহূর্তে সংবাদ এসেছে পূজার জন্য প্রকৃত বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা সংগৃহীত হয়েছে কিন্তু এই পরিণতিতে নাটকটির উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়নি। যে সামাজিক সমস্যাটির দিকে নাট্যকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন সেটি গুরুত্ব না পেয়ে পূজা উপচার সংগ্রহে বিড়ম্বনাই প্রাধান্য পেয়েছে।

ইলা : নাট্যকারের ছাত্রজীবনের রচনা। প্রথম প্রকাশ ঢাকার জগন্নাথ হলের ছাত্রদের সম্পাদিত পত্রিকা 'বাসন্তিকা'-য়। পরে (১৩৩৯, শারদ সংখ্যা) 'স্বদেশ'-এ প্রকাশিত হয়। এই নাটিকাটি ১৩৭২ সালে 'প্রিয়তম' নামেও প্রকাশিত হয়। এর চরিত্র সংখ্যা ছয়--পুরুষ ২টি, নারী ৪টি। বৃদ্ধ জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়-এর অবৈধ সন্তান হরিচরণকে এতদিন

সবাই তাঁর আসল পুত্র বলে জেনে এসেছে। সে মদ্যপ, চরিত্রহীন। ইলা তার স্ত্রী—মূর্তিমতী সতী। ইলার ওপর জগন্নাথের পালিত পুত্র প্রিয়তমের অধিক মনোযোগ ইলা বরদাস্ত করতে পারে না। এমন সময় মুমূর্ষু শ্বশুরের কাছ থেকে সে জানতে পারে যে তার শ্বশুরের অবৈধ সন্তান হরিচরণের সঙ্গে বৈধ সন্তান প্রিয়তমের বদল হয়েছিল।

হরিচরণ খুনী আর প্রিয়তম আদর্শ চরিত্রের একজন পুরুষ। ঘটনাচক্রে হরিচরণের রক্ষিতা খুন হয় এবং সেদিন হরিচরণ তার স্ত্রীর শেষ সম্বল হাতের সোনার বালাটি ছিনিয়ে নেয় পালিয়ে যাবে বলে। এই অবস্থায় প্রিয়তম নিজেকে হরিচরণ বলে পরিচয় দেয় ও গ্রেফতার বরণ করে। ইলার জীবনে নেমে আসে আরো দুর্যোগ। মুমূর্ষু শ্বশুর ও কন্যা রাখীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। অসহায় ইলা শ্বশুরের উইল-এ দেখে যে সব সম্পত্তি তিনি ইলা ও প্রিয়তমকে দান করে গেছেন। ইলার চোখ খুলে যায়। সে তখন সংসারের মিথ্যা মাটির ওপর আর দাঁড়াতে চায় না। পুলিশের কাছে গিয়ে 'সত্য হরিচরণের' কথা বলে—প্রিয়তমকে মুক্ত করে আনে। এই একাঙ্কটি পাঠ করে নজরুল (৪.৭.২৭) নাট্যকারকে পত্রে জানিয়েছিলেন—"ইলাও আমার বুকে কম দোলা দেয়নি।"

সোমেশ সরকার : শারদীয়া 'দীপালী'-তে (১৩৪২) এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে 'সাংঘাতিক লোক' নামেও এই একাঙ্কটি অন্যত্র ছাপা হয় (১৩৭৪)। এই নাটিকার চরিত্র সংখ্যা চার—পুরুষ ৩টি, নারী ১টি। প্রৌঢ় ধনঞ্জয় বসু লক্ষপতি ব্যবসায়ী। কিন্তু তিনি নিঃসন্তান। স্ত্রী কমলা সন্তান কামনায় নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন। নাটকের শুরুতেই দেখি পূজার ছুটিতে ভ্রমণের স্থান নির্ধারণ নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মত-বিরোধ। এই সময়েতেই কুড়ি বাইশ বছরের সুপুরুষ এক যুবক প্রবেশ করে, নাম সোমেশ বসু। সে ধনঞ্জয়কে তার মায়ের ছবি দেখায়। ধনঞ্জয় ছবি দেখে চিনতে পারে বিরজাকে—যাকে সে প্রবঞ্চনা করে, ভালবাসার অভিনয় দিয়ে ভুলিয়েছিল অথচ স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি। সোমেশ তাদেরই পুত্র। ছ' মাস আগে বিরজার মৃত্যু হয়েছে এবং তখনই কাগজপত্র ঘেঁটে সোমেশ যেসব চিঠিপত্র ও ছবি উদ্ধার করেছে তাতে তার কাছে তার পিতার পরিচয় আর গোপন থাকেনি। তাই সে ছুটে এসেছে আশ্রয়ের আশায়। কিন্তু সমাজের প্রতিপত্তিশালী লক্ষপতি ধনঞ্জয় তার মান-সম্মান ধূলায় লুটিয়ে দিতে চান না। তার অবৈধ প্রণয়ের পাপকে চাপা দিতে তিনি তারই ঔরসজাত সন্তানকে পুরোনো ছবি ও চিঠিপত্রের বিনিময়ে অর্থের লোভ দেখান, পরিচয় প্রকাশ করতে বারণ করেন। সোমেশ জানায় সে বিরজার সন্তান। অর্থের বিনিময়ে আত্মমর্যাদা বিকিয়ে দিতে সে পারবে না। স্নেহের ভিখারী হয়ে সে তার পিতার কাছে এসেছিল—অর্থের প্রত্যাশায় নয়। এই কথা বলে সমস্ত ছবি ও কাগজপত্র রেখে সে চলে যায়। সেই মুহূর্তে কমলা চা নিয়ে প্রবেশ করে, ছেলেটি চলে গেছে দেখে বিস্মিত হয় স্বামীকে তার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। ধনঞ্জয় জানায় যে ছেলেটি সাংঘাতিক লোক, প্রতারক। কমলার কাছে সত্য অনুদ্ভাসিতই থেকে যায়। এ নাটকের মধ্যে দিয়ে মন্মথ দুটি সত্যকে উদ্ভাসিত করেছেন। এক, সোমেশ যে

উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতার শিকার হয়েও মাথা নোয়ায় না, অর্থের লোভে সততাকে বিক্রি করে না, বরং মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখায় ; দুই পাপবোধ হীন, কর্তব্যজ্ঞান শূন্য, দয়ামায়া, সহানুভূতিহীন উচ্চবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি ধনঞ্জয় বসুর নির্লজ্জ কদাচার যার কোনো প্রতিবাদও হয় না--বিচার তো দূরের কথা।

উল্কাপাত : প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষ পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩৬৬)। চরিত্র সংখ্যা আট--পুরুষ তিন, নারী পাঁচ। ফাল্গুনের একটি সন্ধ্যা। কলকাতার সুরুচিসম্পন্ন একটি পরিবারের সকলে বিবাহ উপলক্ষে বর ও বধূকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য জড়ো হয়েছে। সেখানে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার বিদেহী আত্মার আবির্ভাব ঘটে এক ভয়ানক অমঙ্গল আশঙ্কায়। বর রমেন তার বাড়ির আশ্রিতা উল্কার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয় কিন্তু তাকে বিবাহ না করে সে অন্যত্র বিবাহ করে। সেই বিবাহের দিনেই নাট্য কাহিনীর সূচনা হয়। উল্কা যে রমেনের পিতারই অবৈধ সন্তান এ কথা সেই বাড়ির কেউ জানে না। কারণ মৃত্যু পর্যন্ত বৃদ্ধ তা গোপন রেখেছিলেন। নাটকের শেষে দেখি সরবতে বিষ প্রয়োগের মিথ্যা সন্দেহের কলঙ্কে উল্কা শেষপর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। উল্কার জন্মের অভিশাপ, কলঙ্কিত প্রেম, সুতীব্র বিচ্ছেদ বেদনা নাট্যকার পরম মমতায় এঁকেছেন। ভাব ও রূপসৃজনের অভিনবত্বে একাঙ্কটি স্মরণীয়। মৃত স্বামী-স্ত্রীর অদৃশ্য উপস্থিতি, তাদের সংলাপের মধ্যে দিয়ে উল্কার জীবন রহস্যের পরিস্ফুটন, উল্কা-রমেনের আকর্ষণ বিকর্ষণের দোদুল্যমানতা নাট্যকাহিনীকে চরমোৎকর্ষের দিকে নিয়ে গেছে।

নারীর নৈতিক স্খলনের ছবি ফুটে উঠেছে 'হারিকেন, অপরাজিতা, নাট্যকারের জীবন নাট্য, তৃষ্ণা মুক্তিস্নান ও ভূমিকম্প' প্রভৃতি একাঙ্কে। এই রচনাগুলির মধ্যে মন্মথর সুগভীর জীবনবোধের পরিস্ফুটন লক্ষ্য করার মত। তবে অনেক ক্ষেত্রে আবেগের আতিশয্য নাট্যক্রিয়াকে কাঙিক্ষত চরম মুহূর্তে পৌঁছতে সাহায্য না করে, ব্যাহত করেছে।

হারিকেন : প্রথম প্রকাশ 'বিচিত্রা'য় (১৩৩৪, কার্তিক)। চরিত্র সংখ্যা চার--পুরুষ তিন, নারী এক। সাধারণ গৃহস্থ বাড়ির একটি ঘরে মৃত্যুশয্যায় শায়িত তেরো বছরের বালক কমল। কমলের মাথার কাছে বসে তার বিধবা মা ষোড়শী। কমল সর্বত্রই মৃত্যুর হাতছানি, মৃত্যুর ইশারা পায়। আকাশের তারা, রাতের জোনাকি, তালপুকুরের শীতল জল সবাই কমলকে হাতছানি দিয়ে ডাকে--অথচ কিশোর কমলের দুঃখ তার মায়ের এই উপলব্ধিটুকু নেই। সে বোঝে তাকে দেখতে এবাড়িতে যে ডাক্তার আসে মায়ের প্রতি তার গভীর অনুরাগ। সে অনুরাগের ইশারায় মাও যে সাড়া দেন একথা বুঝতে তার অসুবিধা হয় না। ডাক্তার ও মায়ের মধ্যেকার গড়ে ওঠা সম্পর্ক দূরত্ব বাড়িয়ে তোলে মায়ের সঙ্গে পুত্রের। যে মাতৃস্নেহকে সম্বল করে এতদিন সে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে চলছিল--সে ভালবাসায় টান পড়ে। ব্যথিত কমল ডাক্তারকে ডাক পাঠিয়ে জানতে চায়

মায়ের প্রতি তার ইশারার অর্থ কি। ডাক্তার যখন আসে তখন কমল আর উত্তরের অপেক্ষায় নেই--তীব্র অভিমানে সে তালপুকুরের শীতল জলে তার ঠিকানা খুঁজে নিয়েছে। ছোট ছোট কাব্যিক সংলাপে একাঙ্কটি যেন এক গভীর অর্থবহ কবিতা হয়ে উঠেছে।

অপরাজিতা : প্রথম প্রকাশ 'পূর্বাশা'-য় (১৩৩৯, আশ্বিন)। চরিত্র সংখ্যা ছয়টি—পুরুষ ৪, নারী ২। এতে দেখি নারী-মনস্তত্ত্বের জটিল রহস্যময় রূপায়ণ। সন্তানের পিতা হতে অক্ষম জমিদার সূর্যকান্ত চৌধুরীর স্ত্রী অপরাজিতা স্বামীর নীরব সম্মতিতেই সন্তান বুভুক্ষা ও বন্ধ্যাত্বের অপবাদ মেটাবার জন্য জ্ঞাতিশত্রু দেবরের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে। "......এ অপরাজিতা তো...সইতে পারলো না স্বামীর সেই বুভুক্ষিত বুকের হাহাকার—'আমার বুকে সন্তান দাও অপরাজিতা'......তাই তাঁর স্ত্রীর বুকে যে সক্ষমা নারী ঘুমিয়েছিল, সে জেগে উঠল। তাঁর স্ত্রী ছিল সতী, আর এ নারী ছিল মা।" নারীরূপের রহস্যময় প্রকাশ ঘটেছে এ নাটকে। কিন্তু নাট্যক্রিয়া ও দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের বদলে বিবৃতি সর্বস্বতা একাঙ্কটিকে সার্থকতার কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছতে সাহায্য করে নি।

নাট্যকারের জীবননাট্য : প্রথম প্রকাশ শারদীয়া 'দীপালী'তে (১৩৪৪)। পরে এটি 'সাংঘাতিক নাটক'—এই নামে 'যষ্ঠিমধু'তে (১৩৬২, আশ্বিন) প্রকাশিত হয়। চরিত্র সংখ্যা চার—পুরুষ তিন, নারী এক। নাট্যকার ভবভূতি মিত্রের ফ্ল্যাট। বন্ধু সুদর্শনের সঙ্গে নাট্যকার নাটকের আলোচনায় মগ্ন। তিনি নাটক লেখার জগৎকেই সর্বস্ব বলে জানেন। স্ত্রী, সংসার এসব দিকে দৃষ্টি দেবার সময় তাঁর নেই। কিন্তু তিনি তাঁর এবারের নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এমন এক মানুষের কাহিনীকে যে শেয়ার মার্কেট নিয়েই মত্ত। ঘরে তার শিক্ষিতা সুন্দরী স্ত্রী প্রেমলতা। তার দিকে মনোযোগ নেই হিমাদ্রীর। তাহলে প্রেমলতার কি হবে—সে কি করবে—এই প্রশ্নের সমাধানে চিন্তিত নাট্যকারকে সমাধানের সোজা পথ দেখিয়ে দেয় তাঁরই স্ত্রী ইন্দ্রানী। সে বলে—"ঘুড়ি বানিয়ে উড়িয়ে দাও"। নাট্যকারের জীবননাট্যে তখন অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে যা নাট্যকার ভাবতেও পারেননি। নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে যে কাহিনী তিনি বেছে নিয়েছিলেন সে কাহিনী যে তাঁরই জীবনের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতে চলেছে একথা উপলব্ধি করার মত মানসিকতা তার ছিল না। উপেক্ষার আগুনে দগ্ধ হতে হতে ক্ষুব্ধ ইন্দ্রানী একসময় মন দিয়ে ফেলেছে বিলেত ফেরৎ আর্টক্রিটিক বাক্‌পটু দোদুলকে। বন্ধু সুদর্শন পরামর্শ দেয় নাট্যকারকে নাটকের পরিসমাপ্তিকে সে যেন কলুষিত না করে। ইন্দ্রানী দোদুলের সঙ্গে চলে যাবার সিদ্ধান্তটাও হঠাৎ কেন জানি না বদলে ফেলে, ফিরে আসে ঘরে। নাট্যকার বোঝেন তাঁর জীবনের সত্যিকারের নাটকের সূচনা হল। জীবনকে অস্বীকার করে তো কোন কিছু সৃষ্টি করা যায় না। তার এই উপলব্ধিতেই নাট্যকার নাটকের পরিসমাপ্তি টেনেছেন। জীবন আর নাটকে তখন আর কোনো পার্থক্য নেই।

তৃষ্ণা : প্রথম প্রকাশ 'উজ্জ্বলভারত'-এ (১৩৫৯, আশ্বিন)। এ নাটিকায় রূপ থেকে রূপাতীতের সৌন্দর্য অনুধ্যানের সজীব চিত্র পাই। দুটি দৃশ্য সম্বলিত নাটক। প্রথম দৃশ্য রাজপ্রাসাদের উদ্যান, দ্বিতীয় দৃশ্য আম্রবৃক্ষের তলদেশ। নাটকের মুখবন্ধে নাট্যকার বলেছেন যে, প্রচলিত কিংবদন্তীমূলক গল্প থেকে নাট্যকার এর কাহিনী গ্রহণ করেছেন। অপুত্রক রানীর পুত্রের তৃষ্ণা। রাজকার্যে মত্ত রাজা রানীর প্রতি উদাসীন। প্রজারাই তাঁর কাছে সন্তানতুল্য। রাজবাড়ির মালিনীর স্বামী রানীর রূপমুগ্ধ। তার রূপতৃষ্ণার কথা রানী জেনে তাকে মৌনী সাধু হতে নির্দেশ দিলেন। সে মৌনী সাধু হবার পর এক চরম নাটকীয় মুহূর্তে রানী তার কাছে সন্তান প্রার্থনা করলে সে রানীকে ফিরিয়ে দিল। কারণ ততদিনে তার রূপের তৃষ্ণা কেটে গেছে। রানীর নির্দেশিত পথে তার এখন পরমার্থের জন্য তৃষ্ণা জেগেছে। নাট্যকার অদ্ভুত দক্ষতায় নাটকের উপসংহারে রূপ থেকে রূপাতীতের জগতে আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন।

মুক্তিস্নান : 'অমৃত'-তে (১৩৬৯) প্রথম প্রকাশিত হয়। চরিত্র সংখ্যা তিন—পুরুষ ২, নারী ১। মৃত্যুশয্যায় শায়িতা স্ত্রী তরলা তার স্বামীকে দশ বছরের দাম্পত্য জীবনে যা বলতে পারেনি—অকপটে তাই বলে ফেলে। স্বামী তরলাকে সতী সাধ্বী ভেবেছেন কিন্তু বিবেকের দংশনে কাতর তরলা জানায় সে তা নয়। স্বামীর ডাক্তার বন্ধুর কাছে তাকে সব সমর্পণ করতে হয়েছিল। সেই পাপ থেকে, সেই ক্লেদাক্ত জীবন থেকে তার উত্তরণ ঘটবে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। মৃত্যুতেই হবে তার মুক্তিস্নান। কাহিনীটিতে আবেগের বাহুল্য বাস্তবতা ও নাটকীয় গতিবেগের অভাব নাটকটিকে দুর্বল সৃজন করে তুলেছে।

ভূমিকম্প : শারদীয়া আনন্দবাজারে (১৩৬০) প্রথম প্রকাশিত হয়। চরিত্র সংখ্যা চার— পুরুষ ২, নারী ২। সভ্য সমাজের আড়ম্বর ও আধুনিকতার আড়ালে যে ক্লেদাক্ত বিবর্ণ জীবনের অস্তিত্ব আছে তার আভাস এই নাটিকায় নাট্যকার তুলে ধরেছেন। জয়ন্তী ও মিঃ চ্যাটার্জী বাইরের চোখে সুখী দম্পতি হলেও কেউ কাউকে আন্তরিক ভাবে ভালবাসে না। মিঃ চ্যাটার্জীর রূপাসক্তি ও জয়ন্তীর জীবনে আর্থিক নিরাপত্তার তাগিদই তাদের বিবাহের নেপথ্য ইতিহাস। ভূমিকম্পের বিপর্যয়ই তাদের চরম সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। এই একাঙ্কটিও খুব উচ্চমানে পৌঁছতে পারেনি।

নরনারীর কোমল মধুর প্রেমকে উপজীব্য করে মন্মথ একাধিক একাঙ্ক রচনা করেছেন, তার মধ্যে 'স্মৃতির ছায়া, টিয়া, দুর্বোধ্য, ক্ষণস্বপ্ন, চিত্রাঙ্গদা ও কস্তুরী' উল্লেখযোগ্য। এগুলিতে ব্যভিচার অনাচারের ভয়ঙ্কর অনুভবের বদলে স্নিগ্ধ মাধুর্য, সরল অকপট ভালবাসার প্রকাশ ঘটেছে। এই সময়কালেই সাধারণ রঙ্গালয়ে তিনি নাট্যকার হিসাবেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। খানিকটা আর্থিক নিরাপত্তা তাঁকে মানসিক স্থৈর্য ও শান্তি দিয়েছে। ফলে তাঁর একাঙ্ক সৃজনেও সেই ছায়াপাত ঘটেছে।

স্মৃতির ছায়া : প্রথম প্রকাশিত হয় 'বাসন্তিকা' পত্রিকায় (১৩৩৩)। পরবর্তী কালে এটি 'ভূত' (১৩৬৫) ও 'স্মৃতির ছাপ' (১৩৭৭) নামেও প্রকাশিত হয়। চরিত্র সংখ্যা দুটি--পুরুষ ১, নারী ১। স্নিগ্ধ মধুর কোমল প্রেমের স্মৃতির সৌরভে একাঙ্কটি সুন্দর। বিদেশি সদাগর ভালবেসেছিল পসারিনীকে। পসারিনীও সেই অতীত প্রেমের স্মৃতিকে ভুলতে না পেরে পরিত্যক্ত প্রাসাদে এসেছে। যে সদাগব দেনার দায়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, বহু বছর পর সেও লুকিয়ে সেই পরিত্যক্ত প্রাসাদে এসেছে পসারিনীর অজান্তে সে নিয়ে নিয়েছে তার আলতা রাঙা পায়ের ছাপ--তার প্রেমের স্মৃতির ছাপ। কাব্যিক সংলাপ এ একাঙ্কটির সম্পদ।

টিয়া : প্রথম প্রকাশ উত্তরায় (১৩৩৯, কার্তিক)। চরিত্র সংখ্যা পাঁচ--পুরুষ ৪, নারী ১। দশ বছরের টিয়া মরণাপন্ন। বাড়ির সকলে খুব বিষণ্ণ। মা করুণা কন্যার শোকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। টিয়ার অতি আদরের টিয়াপাখি খাঁচার বাইরে এসে বসেছে। মায়ের ধারণা পাখি উড়ে গেলেই টিয়ার প্রাণ-পাখিকেও আর ধরে রাখা যাবে না। টিয়া চেয়েছিল লতানো গোলাপ--ঠিক সেই গাছটির ওপরই টিয়াপাখিটি গিয়ে বসেছে। পাখিটিকেও ধরতে হবে এবং ফুলও আনতে হবে--কে করবে এই দুঃসাহসিক কাজ? এই প্রশ্নে যখন সবাই বিচলিত তখন দেখা গেল কার্নিশের ওপর দুটি ছোট হাত পাখিটাকে চেপে ধরে গোলাপটি ছিঁড়ে নিয়ে লাফিয়ে এল টিয়ার ঘরের ভেতর। সে আর কেউ না, টিয়ার কিশোর বন্ধু রায়বাড়ির সেই দুরন্ত ছেলে লণ্ঠন। লণ্ঠন চরিত্রটির মুখে কোনো সংলাপ বসাননি নাট্যকার। অথচ অন্য চরিত্রের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে লণ্ঠন আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অনুচ্চারিত কিশোর প্রেমের মিষ্টি আমেজে, কাব্যিক সংলাপে এ একাঙ্কটি সুন্দর।

ক্ষণস্বপ্ন : প্রথম প্রকাশ শারদীয়া 'মন্দিরায়' (১৩৬১)। দুটি দৃশ্যের নাটক। চরিত্র সংখ্যা পাঁচ--পুরুষ ২, নারী ৩। এক বঞ্চিতা নারীর জীবনে কিভাবে আকস্মিক প্রেম এসে তার জীবনকে সুরভিত করে তুলেছে এটি তারই কাহিনী। ধানবাদ কোলিয়ারির মালিক নন্দলাল সেন তাঁর স্ত্রী নন্দা দেবী, কন্যা নন্দিতা। শিক্ষিতা নন্দিতার জন্য মনোনীত পাত্র নন্দলালের বন্ধু-পুত্র নন্দনের বর্মা থেকে আসার কথা। কিন্তু নন্দলাল ও তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে একটি জরুরি নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য আসানসোল যেতে বাধ্য হলেন। নন্দনের অভ্যর্থনার ভার পড়ল ঐ বাড়ির আয়া সুন্দরী শিক্ষিতা সেবার ওপর। নন্দন এসে তাকেই নন্দিতা ভেবে বসল। রক্তমাংসের মানবী সেবা এই ক্ষণস্বপ্নের মাধুর্যটুকুর লোভ সামলাতে পারল না। তাই একরাত্রি সে নন্দিতা সেজেই রইল। কিন্তু পরদিন গৃহকর্তা আসবার আগে চায়ের টেবিলে চিঠি লিখে রেখে নন্দনকে সব কথা খুলে বলল। সেবার সততায় তার ওপর নন্দনের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। সাদামাটা কাহিনীতে ক্ষণস্বপ্নের মত প্রেম সেবার জীবনে মধুর আমেজ ও কোমলতা বয়ে এনেছে। চরিত্রগুলি হয়েছে সহজ সরল ও স্বাভাবিক।

দুর্বোধ্য : 'মধুরাংশচ' (শারদীয়া সংখ্যা ১৩৬৭)-তে প্রথম প্রকাশ। দু পাতার সংক্ষিপ্ত নাটিকা। চরিত্র সংখ্যাও দুটি—১ পুরুষ, ১ নারী। জনবিরল পার্কের এক কোণে একটি বেঞ্চে একাঙ্কটির নাটকীয় মুহূর্তের সূচনা। সূর্য ও সন্ধ্যা এ কাহিনীর নায়ক নায়িকা, যারা অতীতে একদা স্বামী-স্ত্রী ছিল। বিবাহ বিচ্ছেদের পর উভয়েই আবার নতুন জীবনসাথী গ্রহণ করেছে। বহুদিন পর কলিক্ ব্যথার ওষুধ দেবার ছুতোয় পুরোনো স্মৃতি বিজড়িত পার্কে সন্ধ্যাকে ডাক পাঠায় সূর্য। সন্ধ্যা আসে, কিন্তু সূর্যের দেওয়া ওষুধ সে গ্রহণ করে না। কারণ সে উপলব্ধি করে সূর্যের জীবনে আজ তার অস্তিত্বের কোন মূল্য নেই। মৌখিক সহানুভূতির করুণা তাকে পীড়িত করে। সে যখন শোনে সূর্য তার বর্তমান স্ত্রীর অনুমতি নিয়েই সন্ধ্যাকে ওষুধ দিতে এসেছে তখন সে ক্ষুব্ধ হয়ে বলে "চুপি চুপি এসে চোরের মত যদি ঐ অমৃতটা আমার হাতে তুলে দিতে, আমি নিতাম। তবেই মনে হতো তোমার জীবনে আমি এখনো বেঁচে আছি"। শুষ্ক কর্তব্যের নিরুত্তাপ আবেগ মনের রহস্যময় গভীর তলটাকে নাড়া দিতে পারে না। এই উপলব্ধির দুর্বোধ্যতায় একাঙ্কটি সার্থকনামা।

।। **চিত্রাঙ্গদা**।।

প্রথম প্রকাশ (প্রথম বর্ষ শারদীয়া সংখ্যা ১৩৬৭) 'চিত্রাঙ্গদা'-য় চরিত্র সংখ্যা তিন—১ পুরুষ, ২টি নারী। এই একাঙ্কটি "সে আমি নই" নামে অমৃত (২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৭৬) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নারীর দুটি রূপ। বাইরের রূপ আর অন্তরের রূপ। বাইরের রূপে আসে আকর্ষণ আর অন্তরের রূপে সে পুরুষকে দেয় প্রেম ভালবাসার স্নিগ্ধতা। রূপমুগ্ধ পুরুষ কিন্তু বাইরের তাৎক্ষণিক রূপের মায়ায় মোহান্ধ হয়—তখন সে নারীর অন্তরের চিরন্তন সৌন্দর্যকে মূল্য দেয় না। তখন নারীর পরাজয় ঘটে চিত্রাঙ্গদার মত। কারণ শাশ্বত সত্য রূপকে যখন মেকির মায়ায় ভুলে পুরুষ উপেক্ষা করে, সেখানেই ঘটে নারীর চরমতম পরাজয়—দুঃসহ অপমানের গ্লানি। এই একাঙ্কটিতে এই বক্তব্যকেই নাট্যকার সুন্দরভাবে কাহিনীর বিন্যাসে গেঁথেছেন। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে একাঙ্কটি স্বতন্ত্র স্থান করে নিয়েছে সন্দেহ নেই। মিলিটারি অফিসার ক্যাপটেন সেনের আকর্ষণ উদ্দাম উচ্ছল জীবনের প্রতি। তার শান্ত নিরুত্তাপ স্ত্রী মিত্রাকে নিয়ে তাই তিনি পরিতৃপ্ত হতে পারেন না। তাই বাপের বাড়িতে এসে মিত্রা যখন তার যমজ বোনের রূপ ধরে চিত্রা হয়ে উদ্দাম উচ্ছলতায় মিঃ সেনকে ব্যাকুল করে তোলে, তখনই তার কাছে স্পষ্ট হয় তার স্বামীর সত্যিকারের আকর্ষণ, তার বাইরের নকল রূপের প্রতি। তিনি বিশ্বাস করেন, "কোনো বন্ধনে বাধা পড়া মানেই জীবনটাকে ছোট করা, মনটাকে ছোট করা"। একনিষ্ঠ প্রেমের কোনো মূল্যই তার স্বামীর কাছে নেই, এটা জেনে ক্লান্ত অপমানিত, পরাজিত মিত্রা তাকে ফিরিয়ে দেয়। চিত্রাঙ্গদার মত তার মনে হয় "তুমি যাকে চাইছ সে আমি নই। আমি ছলনা।" আন্তরিক প্রেম ছলনা নয়—একনিষ্ঠ অনুরাগের মূল্যে মহত্তর সম্মান চায়। আর সেখানেই হয় তার জিৎ।

কস্তুরী : প্রথম প্রকাশিত হয় 'উত্তরা'য় (আশ্বিন, ১৩৭৩)। চরিত্র সংখ্যা তিন—পুরুষ ২, নারী ১। চল্লিশ বছর বাদে প্রেমিক প্রেমিকার মিলন হয় দশাশ্বমেধ ঘাটে। অতীত প্রেমের অমলিন স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরেই তারা বেঁচে আছে। জীবনে যা কাম্য তাকে পাওয়া জনিত আনন্দের চেয়ে না পাওয়ার বেদনামধুর স্মৃতি যে অনেক বেশি মধুর, এই কঠিন সত্য জীবনের শেষবেলায় পৌঁছে অনুভব করার মধ্যে দিয়েই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পরস্পরের কাছে আসে। তারা উপলব্ধি করে—'সব কিছু পেলে মানুষ বাঁচে না। না পেলে তবে বাঁচে।' তাই স্মৃতিকে অমলিন করে বাঁচিয়ে রাখতে তারা আবার পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। স্বল্প পরিসরে জীবনের এতবড় সত্যের সহজ রসোত্তীর্ণ রূপায়ণে একাঙ্কটির সৃজন শৈল্পিক হয়েছে—এইখানেই নাট্যকারের সহজ কৃতিত্ব।

কর্মসূত্রে, বিচিত্র জীবিকার সূত্রে মন্মথকে বহু ধরনের মানুষ ও তাদের জীবনাচরণের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়েছে। এই পরিচয় তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতাকে ক্রমশ সমৃদ্ধ করেছে। ভালমন্দ, ত্রুটিবিচ্যুতিকে কখনো শাণিত ব্যঙ্গ বা মমতা মাখা ক্ষমায় অথবা প্রসন্ন হাস্যে তিনি গ্রহণ করেছেন। এবং তাঁর সেই উপলব্ধিকে মন্মথ নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সংসারের প্রেক্ষাপটে রেখে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনার অনুষঙ্গে সমাজের নানান সমস্যার ছবির মধ্যে রেখে তাকে জীবন্ত করেছেন তাঁর অনেকগুলি একাঙ্কে। তার মধ্যে 'কালীবাড়ি, অসাধারণ, অর্কেষ্ট্রা, ফকিরের পাথর, শীতবসন্ত' উল্লেখযোগ্য।

কালীবাড়ি : প্রথম প্রকাশ শারদীয়া 'উত্তরায়' (১৩৪৬)। চরিত্র সংখ্যা চার—পুরুষ ২, নারী ২। দুটি নিম্নবিত্ত পরিবারের ভিন্ন মানসিকতার প্রেক্ষিতে এর কাহিনী অংশ গড়ে উঠেছে। দুর্গা আর কালীতারা একই বস্তির দুই প্রতিবেশী। দুর্গার স্বামী এসেন্স কোম্পানীতে প্যাকিং-এর কাজ করেন। তিনি প্রায়ই স্ত্রীর মন ভোলানোর জন্য কোম্পানীর এসেন্স চুরি করে আনেন, স্ত্রীকে নিয়ে থিয়েটারে যান অথচ পাশের বাড়ির প্রতিবেশী কালীতারার স্বামী সাধারণ প্রেসে থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ছাপার কাজ করে—বিলাসিতা করাটাকে তার গরীবের 'ঘোড়া রোগ' বলে মনে হয়। সে তার একমাত্র সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলার জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করে। স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে থিয়েটার দেখার কথা ভাববার অবকাশ তার হয়না। সেই ছেলে যখন পরীক্ষায় প্রথম হয় তখন সাধুচরণ তার দুদিনের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে পথ খরচা সংগ্রহ করে নাট্য-নিকেতনের মালিকের কাছে থিয়েটারের পাস চায়। মালিক খুশি হয়ে তাকে 'স্পেশাল কুপন' ছ'টাকা দামের সিটের পাস দেয়। কিন্তু পোশাকের অভাবে তাদের সেখানে যাওয়া হয় না। হতাশ হয়ে কিশোর বালক তার পিতামাতাকে প্রস্তাব দেয় ঠনঠনের কালীবাড়িতে আরতির অনুষ্ঠান দেখতে যেতে সেখানে যেতে হলে তো স্পেশাল কুপনে বসার মত দামী পোশাকের দরকার হয় না। সে বলে সেখানে গিয়ে সে মা

কালীর কাছে আবেদন করবে "থিয়েটারের সব সিটগুলোই এক দামের এক ক্লাসের করে দাও মা।"

এই একাঙ্কে নাট্যকার অনেক বেশি জীবন-ঘনিষ্ঠ। অসাধারণ মমতা নিয়ে নাট্যকার স্বল্প পরিসরে নিম্নবিত্তের অন্তঃপুরের ছবি এঁকেছেন। কালীতারা, দুর্গা, দাসবাবু, সাধুচরণকে আমাদের অত্যন্ত পরিচিত মনে হয়। ফটিক সুকোমল একটি কিশোর--মায়ের ব্যথায় তার প্রাণ কাঁদে। বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাজের অসম ব্যবস্থার অবসান দ্রুত ঘটুক এই কামনা করে। এ নাটকে মন্মথর শ্রেণী সচেতনতা, সাম্যবাদের প্রতি অনুরাগ ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রস্ফুটিত।

অসাধারণ : প্রথম প্রকাশ 'ভগ্নদূত'-এ (২৯ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা, ১৯৫৫)। চরিত্র সংখ্যা চার--পুরুষ ২, নারী ২। ক্ষয়িষ্ণু সমাজ পরিস্থিতিতে এক আদর্শবাদী অধ্যাপকের যন্ত্রণার ছবি রূপায়িত হয়েছে এই একাঙ্কটিতে। অধ্যাপক পবিত্র বোস মনুষ্যত্ব ও সততার মূল্যে দারিদ্র্যকে বরণ করেছেন হাসিমুখে। কিন্তু সংসার ও পরিজন তাঁর সত্য ও ন্যায় নিষ্ঠার আদর্শকে মেনে নিতে পারেনি। সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রলোভনে জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া অধ্যাপকের স্ত্রী তিন হাজার টাকার বিনিময়ে অধ্যাপকের অগোচরে শহরের বিখ্যাত ব্যারিষ্টারের একমাত্র সন্তানকে পাশ করিয়ে দেন মার্কশীটে গোঁজামিল দিয়ে। এ ঘটনা গোচরে আসার পর অধ্যাপক বেদনায় মূক হয়ে পড়েন। পচনশীল সমাজের অবক্ষয়িত মূল্যবোধ ও উদগ্র লোভে উন্মত্ত মানুষগুলোর ছবি নিজেরই প্রিয়জনদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে তিনি অব্যক্ত যন্ত্রণায় নীল হয়ে যান। ভেঙে পড়া সমাজ জীবনের একটি দিকের ছবি ও গোটা পরিবারের নষ্ট হয়ে যাওয়া মূল্যবোধ নাট্যকার এই একাঙ্কটির মধ্যে দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এ সমাজে কাঞ্চন কৌলীন্যের জোরে ফেল করা ছেলে পাশ করে, আদর্শবাদী অধ্যাপকের স্ত্রী সমস্যায় ক্ষতবিক্ষত হতে হতে নিজের মূল্যবোধকে পরিবর্তিত করে ফেলেন অনায়াসে এবং বলেন—"এ যুগের সভ্যতা হলো যেন-তেন-প্রকারেণ টাকা রোজগার এবং সেই টাকায় জীবনকে ষোল আনা উপভোগ করা"।

এই সমাজ পরিমণ্ডল আদর্শবাদী অসাধারণ চরিত্রের মানুষগুলোকে দেয় না কোনো খেতাব, প্রতিপত্তি বা অভিনন্দন। ছোট এই একাঙ্কটি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে নাট্যকার দেখিয়েছেন যে আদর্শ ও প্রয়োজনের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব বাঁধে, তখন অনেক সময় প্রয়োজনেরই জয় হয় এবং বাস্তবের তাগিদে তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। একাঙ্কটির চরিত্রায়ন সুন্দর।

প্রথম প্রকাশ 'মধ্যবিত্ত' পত্রিকায় (শারদীয়া সংখ্যা ১৯৬৩)। চরিত্র সংখ্যা আট—পুরুষ ৫, নারী ৩। এ একাঙ্কটি একটি অভাবগ্রস্ত পরিবারের সুখদুঃখময় বেদনা মিশ্রিত দিন যাপনের কাহিনী। শহরতলীর মধ্যবিত্ত পল্লীতে করণিক মহারাজ মিত্র

থাকেন সপরিবারে। দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে সংসার। স্ত্রী সুহাসিনী শত ঝড় ঝাপটার মধ্যেও মূর্তিমতী ধৈর্যের প্রতীক। পুত্র আনন্দ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত, বিষণ্ণ মলিন। এই পরিবারেই হঠাৎ একদিন ঠিকানা ভুল করে কন্যা জয়ন্তী মিত্রের নামে কুড়ি হাজার টাকা পুরস্কার জয়ের খবর আসে। এ খবরে নিমেষে উড়ে যায় দুঃখ বিষাদ। পুরস্কার পাওয়ার স্বপ্নে মশগুল জয়ন্তী মাস মাইনের সমস্ত টাকায় সাধ মিটিয়ে সংসারের সকলের জন্যে এটা সেটা কেনে। কিন্তু সমস্ত সুখের আনন্দ স্বপ্নের মতই হঠাৎ ফুৎকারে মিলিয়ে যায় যখন কোম্পানীর লোক খবর দেয় যে ভুলক্রমে অন্য জয়ন্তী মিত্রের পুরস্কার পাওয়ার খবর ওখানে এসে পৌঁচেছে। পরিবারটি আশ্চর্য সংযমে ভেঙে না পড়ে বাস্তবকে মেনে নেয়। স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা তাদের পরাজিত করতে পারে না। দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে দিয়ে নবজীবনে উত্তরণের শপথে নাটকে যবনিকা নামে। চরিত্র চিত্রণ বাস্তব। কোন কোন অংশে হাসির উপাদান যুগিয়েছে মহারাজ ও তার পুত্র ভেঁপু। নামকরণও সঙ্গত। সত্যিই একাঙ্কটি যেন মধ্যবিত্ত সংসারের সুখদুঃখের অর্কেস্ট্রা। মধ্যবিত্ত পরিবারের টানাপোড়েনের বিশ্বস্ত ছবি এঁকেছেন নাট্যকার। স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় ভেঙে না পড়ে যখন সকলে মিলে উঠে দাঁড়ায় তখন পোড়খাওয়া জীবন অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে হাত বাড়িয়েছে মনে হয়। এখানেই একাঙ্কটির সার্থকতা।

ফকিরের পাথর : একাঙ্ক নাট্যগ্রন্থ সংকলনে 'ফকিরের পাথর' অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯ সালে। ১৯৫৮ সালের ১৬ই অক্টোবর এই একাঙ্কটি আকাশবাণী কর্তৃক জাতীয় অনুষ্ঠানে সারা ভারতে বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত হয়েছে। এ নাটকের চরিত্র সংখ্যা পাঁচ—পুরুষ ৩, নারী ২। এক গ্রাম্য পরিবারের পটভূমিতে নাট্য কাহিনীর বিস্তার ঘটেছে। চৈত্র সংক্রান্তির চাঁদনি রাতে যদি ফকিরের পাথরের সামনে বসে একাগ্র হয়ে কিছু চাওয়া যায় তবে তা অবশ্যই পাওয়া যায়। গৃহকর্তা অন্ধ সদাশিব দৃষ্টিশক্তিহীন। অথচ প্রখর অনুভব শক্তিতে সেসব কিছু দেখতে পায়। সংসারের সব ফাঁকি, সকলের ফাঁকি তার উপলব্ধিতে ধরা পড়ে। সেই সদাশিব যখন দৃষ্টি ফিরে পায় তখন হারিয়ে যায় তার প্রখর অনুভব শক্তি। খোলা চোখে পৃথিবীর কুৎসিত রূপ তার কাছে অসহ্য মনে হয়—তার স্ত্রীর অতীতের চারিত্রিক স্খলন তার বুকে কাঁটা হয়ে বেঁধে। সদাশিব মানসিক যন্ত্রণায় আবার দৃষ্টিশক্তি হারায়। দৃষ্টি হারিয়ে সে ক্ষমা-সুন্দর চোখে সকলকে দেখে। সংসারের সব চাইতে বড় চাওয়া হল শান্তি এই উপলব্ধি তার ঘটে। এ একাঙ্কটিতে নাট্যকার কাহিনীবৃত্ত নির্মাণে, সদাশিব ও গঙ্গার জীবন রহস্য উদ্‌ঘাটনে কার্তিক, গণেশ কলাবতীর জীবন ঘনিষ্ঠ রূপচিত্রণে, ফকিরের পাথরকে কেন্দ্র করে নাট্যকাহিনীকে ধাপে ধাপে চরম শীর্ষে পৌঁছে দেবার দক্ষতায়, সংলাপ সৃষ্টির সহজ স্বাভাবিক নৈপুণ্যে, সবশেষে স্বল্প পরিসরের মধ্যে অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সংক্ষোভের রূপায়ণে শৈল্পিক দক্ষতার ছাপ রেখেছেন।

শীতবসন্ত : প্রথম প্রকাশ 'সংস্কৃতি' কার্তিক সংখ্যায় (১৩৬৫)। চরিত্র সংখ্যা চার--পুরুষ ২, নারী ২। একটি অভাবী সংসারের শীতবসন্তের ছবি এঁকেছেন নাট্যকার এই একাঙ্কটিতে। ছা-পোষা কেরানী বসন্তবাবুর মাস মাইনের দিন। বাড়িতে অপেক্ষমাণ তার স্ত্রী কন্যা। অভাবের সংসারে মাসের প্রথম কটি দিনে একটু খুশির হাওয়া বয়। কিন্তু সেই সামান্য খুশির আমেজ অসামান্যতা পায় যখন তিনি তাঁর পরিবারে বাড়তি আনন্দের ব্যবস্থা করতে কিনে আনেন রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' আর একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। তিনি যখন বলেন ঃ "বাঁচবার মন্ত্র পেতে হলে যে বই চাই তাও কিনে এনেছি আজ......জীবনের সব মন্ত্র সঞ্চিত রয়েছে এই একখানি বইয়ে......যতই শীত আসুক না কেন গরীবের জীবনেও বসন্ত আছে"—তখন অভাব অনটনের সংসারে মানসিক চাপে ভারাক্রান্ত না হয়ে বাঁচবার জন্যে লড়াই করার দৃঢ়তা ফিরে পাওয়া যায়। শুধু শারীরিক প্রয়োজন মিটিয়ে বেঁচে থাকা নয়, মনের উপযুক্ত খাদ্য সমেত বাঁচার মন্ত্রে একাঙ্কটি উজ্জ্বল।

নারীর মাতৃসত্তাকে কেন্দ্র করে তাঁর বেশ কয়েকটি একাঙ্ক রয়েছে। যেমন বহুরূপী, গোপালের মা, অমৃত। মাতৃত্বের ক্ষুধা তথা বন্ধ্যাত্বের বেদনা মন্মথ রায়ের অনেক একাঙ্কেই ঘুরে ফিরে এসেছে।

বহুরূপী : প্রথম প্রকাশ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (১৩৩৫, কার্তিক)। চরিত্র সংখ্যা তিন—পুরুষ ২, নারী ১। মৃত্যুশয্যায় শায়িত স্বামী। অচেতন অবস্থার মধ্যেই সে প্রলাপ বকে। ছোটবেলার খেলার সাথী রানী, পূর্ব প্রণয়িনী বিরজা, স্নেহময়ী মা ও প্রাণপ্রিয় সন্তান খোকাকে কল্পনা করে সে কত কথাই না বলে চলে। অসাধারণ ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে স্ত্রী তরলা তা শোনে, কিন্তু মানসিক বেদনায় ভেঙে পড়ে না বরং পরম মমতায় মুমূর্ষু স্বামীকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টায় সে আলো আঁধারি পরিবেশে কখনো হয় বিরজা, কখনো রানী কখনো বা স্নেহময়ী মা। নারী চরিত্রের এই যে বহুমুখী বিকাশের পরিচয় এবং সর্বোপরি অসুস্থ স্বামী সেবায় তাঁর মধ্যে যে মাতৃসত্তার বিকাশ তা একাঙ্কটিতে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। তরলার এই মানসিক উত্তরণের রসোত্তীর্ণতায় একাঙ্কটি সার্থক।

গোপালের মা : প্রথম প্রকাশ 'উজ্জ্বল ভারত' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৬)। চরিত্র সংখ্যা চার—পুরুষ ৩, নারী ১। শহরতলীর বস্তিঘরের বাসিন্দা নন্দলালকে বেপরোয়া লোক বলে অঞ্চলের সবাই সমীহ করে। পেশায় সে চোর। সংসারে তার স্ত্রী যশোদা ছাড়া আর কেউ নেই। নিঃসন্তান যশোদা সন্তান কামনায় গত দশ বছর তাবিজ কবচ, পূজা-মানত, ঠাকুর দেবতা করেও সন্তানের মা হতে পারে না। হঠাৎ একদিন নন্দ মল্লিকবাড়ি থেকে রূপোর তৈরি গোপালের বিগ্রহ চুরি করাতে গোটা এলাকায় সোরগোল পড়ে যায়। পুলিশ হন্যে হয়ে চোর খোঁজে। তাদের সন্দেহ নন্দলালের ওপর। নন্দ সেই

সন্দেহের হাত থেকে বাঁচতে স্ত্রী যশোদাকে অনুরোধ করে গোপালের মূর্তিটি পুকুরে ফেলে দেবার জন্য। নিঃসন্তান যশোদা গোপাল মূর্তিটিকে পেয়ে সন্তানের মত বুকে আগলে রাখে। তার অতৃপ্ত মাতৃত্বের তৃষ্ণা ঐ মূর্তিটিকে ঘিরেই উৎসারিত হতে থাকে। সে স্বামীর কথা শোনে না। সন্তান বাৎসল্যের ফল্গুস্রোতে স্বামীর নিরাপত্তার চিন্তা ধুয়ে মুছে যায়। বাড়ি যখন পুলিশ ঘিরে ফেলে তখন আতঙ্কিত নন্দ ক্রোধে দিশেহারা হয়ে গোপাল মূর্তিটি উনুনের আগুনে ফেলে দিতে উদ্যত হলে যশোদা গোপালকে বাঁচাতে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মাতৃসত্তা যে পার্থিব লাভ লোকসানের হিসেব কষে না এই একাঙ্কটিতে স্বল্প পরিসরে সেটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন নাট্যকার।

অমৃত : প্রথম প্রকাশ 'কলরব'-এ (১৩৬৭, আশ্বিন)। চরিত্র সংখ্যা পাঁচ--পুরুষ ২, নারী ৩। বাপ মা মরা অনাথ ছোট ছোট চারটি ভাই বোনকে অতি কষ্টে বড় করে তোলবার শপথ নেয় কিশোরী উমা মায়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে। দুঃসহ বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে মানসিক জোর না হারিয়ে কঠিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জীবনযুদ্ধের মোকাবিলা করার উদ্দীপ্ত মন্ত্রে একাঙ্কটি উজ্জ্বল। কিশোরী উমা ও তার নাবালক ভাইবোনকে কেন্দ্র করে উৎসারিত বাৎসল্য স্নেহ, মাতৃসত্তার আশ্চর্য সুকোমল বিকাশকে নাট্যকার সংলাপ ও মুহূর্ত সৃষ্টির গুণে বাস্তব স্বাভাবিক করে তুলেছেন এ একাঙ্কটিতে।

মন্মথর জীবনে সৃজনের ক্ষেত্রে প্রথম প্রেরণা তাঁর মা। ১৯২৩-এ বিবাহের পর তার স্ত্রী তপোবালা। হাসিকান্নায় ভরা বৈচিত্র্যময় জীবনে বিচিত্র অনুভব-সঞ্চারেরও সাথী তিনি। তাই দেখি মন্মথর সমস্ত সৃজনের কেন্দ্রে বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছে নারী সমাজ। কখনো অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে কঠিন সংগ্রামী ভূমিকায়, কখনো বা বর্ণময় মানবিক উপলব্ধির বিচ্ছুরণে আবার কখনো বা প্রতিবাদী ভূমিকায়। এক্ষেত্রে নাট্যকারকে নিরপেক্ষ সমাজতাত্ত্বিকের ভূমিকাও নিতে হয়েছে। স্খলন, পতন অবমূল্যায়নকে তিনি যেমন কঠিন কঠোর দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন তেমনি সহজ সমাধানের সূত্রটিও নির্দেশ করেছেন পরম মমতায়। নারীর কঠিন সংগ্রামকে কেন্দ্রে রেখে যে একাঙ্কগুলি লিখেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুষ্পলতা, অসীমন্তিনী ও সূর্যমুখী।

পুষ্পলতা : এই একাঙ্কটি 'আপনার হোটেল' এই নামে প্রথম প্রকাশিত হয় সমীপেষু শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৫)। পরে পুষ্পলতা নামে একাঙ্কটির পরিমার্জন ঘটে (১৩৯০)। চরিত্র সংখ্যা দুটি--পুরুষ ১, নারী ১। শিয়ালদহ অঞ্চলের 'আপনার হোটেল'টি আসলে চোরাকারবারীদের পীঠস্থান। সেখানে হঠাৎ থাকতে এলেন নাট্যকার সুদর্শন রায়। হোটেলের ম্যানেজার তার হাতে একটি আইডেনটিটি কার্ড দেখে তাকে দুর্নীতি দমন বিভাগের বড় অফিসার ভেবে বসলেন ও তাঁকে মূল্যবান বস্তু ঘুষ দিতে চাইলেন। সুদর্শন রায় ব্যাপারটি বুঝলেন এবং যথাস্থানে তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা

জানালেন। এই হোটেলে এসে তিনি উঠেছিলেন নিরিবিলিতে বসে হোটেলের গল্প নিয়ে নাটক লেখার তাগিদে। নাটকের কাহিনী সূত্র যোগালো হোটেলের পরিচারিকা পুষ্পলতা। তার মুখ থেকেই নাট্যকার শুনলেন তার করুণ জীবন সংগ্রামের কাহিনী-- ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার জন্য তাকে হোটেলে জঘন্য দেহবিক্রির কাজ করতে হচ্ছে।

অসীমন্তিনী : প্রথম প্রকাশ (১৩৬৪) 'মন্দিরা' পূজা সংখ্যায়। চরিত্র সংখ্যা পাঁচ--পুরুষ ৩, নারী ২। এ নাটকে নারীর চিরাচরিত সংস্কারকে ত্যাগ করে রুগ্ণ স্বামী পুত্রের মুখে অন্ন তুলে দেবার তাগিদে বিধবা সেজে ধনী গৃহে রন্ধনাগারের তত্ত্বাবধানের কাজটি গ্রহণ করেছিল সাবিত্রী। কিন্তু ঐ গৃহেরই এক কর্মচারী রূপলালের শঠতায় গৃহের কর্ত্রী চিন্ময়ী দেবীর কাছে সমস্ত ঘটনা জলের মত স্পষ্ট হয়ে যায়। কাহিনীটির নাটকীয়তা চমকপ্রদ। সংগ্রামী এক নারীর মহীয়সী ভূমিকার উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে এ একাঙ্কটি সুন্দর।

সূর্যমুখী : প্রথম প্রকাশ 'স্বদেশ' পৌষ (১৩৬৩) সংখ্যায়। এ একাঙ্কের চরিত্র সংখ্যা পাঁচ--পুরুষ ৪, নারী ১। এতেও দেখি শুধু নিজে বেঁচে থাকা নয়, জীবনযুদ্ধে ছোট ভাইকে নিয়ে ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার তাগিদে ধনীগৃহে গভর্নেসের চাকরি নিয়েছে সুপ্রিয়া। ঐ বাড়ির গৃহস্বামী লক্ষপতি ব্যবসায়ী। তারই পুত্র ইকনমিক্সে এম. এ--পিতার অমতে সমাজতন্ত্র নিয়ে পড়াশোনা ও ভাবনাচিন্তা করছে। দ্বন্দ্ব শুরু হয় ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্রের। এরই মাঝে একটি অস্বস্তিকর হাসাকর পরিস্থিতি ঘনিয়ে আসে সুপ্রিয়ার জীবনে। পিতা ও পুত্র দুজনেই তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। সুপ্রিয়া বেছে নেয় socialism নিয়ে মেতে ওঠা পুত্র কুণালকে। চাকরি ছেড়ে দিয়ে তার সঙ্গেই ঘর ছাড়ে, উদ্দেশ্য বিবাহ ও তারপরে সমাজ উন্নয়ন। এক সূর্যমুখী রমণী মনকে কেন্দ্র করে পিতা ও পুত্রের দুই বিপরীত ধর্মী হৃদয়ের টানাপোড়েনের কাহিনীতে অর্থ নয় যৌবনই পরিশেষে জয়ী হয়।

মন্মথর নাটকের মূল সুর মানবতাবাদ। মাটি ও মানুষের প্রতি ভালবাসার সূত্রেই তাঁর এই আদর্শবাদের জন্ম। দেশীয় ঐতিহ্যকে, জীবনে বৃহত্তর মূল্যবোধকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁর সৃজনের ক্ষেত্রেও। ফলে দেশবিভাগের পর ছিন্নমূল মানুষের সমস্যার পাশাপাশি, মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের ছবি, অবলুপ্ত হতে বসা আদিম জীবন ঐতিহ্যের রূপায়ণও চিত্রিত হয়েছে একাঙ্কের পরিসরে। এ ধরনের একাঙ্কের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-- আমরা কোথায়, টোটো পাড়া, রক্তকদম।

আমরা কোথায় : প্রথম প্রকাশ 'বর্তমান' মাসিক পত্রিকায় (১৩৫৫, আশ্বিন)। এই একাঙ্কটির চরিত্র সংখ্যা আট--পুরুষ ৬, নারী ২। দেশবিভাগের পর, মনুষ্যত্ব, নারীত্ব,

সামাজিক সম্পর্ককে ঘিরে মূল্যবোধের যে পরিবর্তন ঘটেছে তা একাঙ্কটিতে কাহিনী বুননের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেশ বিভাগের বিপর্যয় জাতপাত ধর্মের অহংকারকে ভেঙেচুরে দিলেও মানবিক ভালবাসাকে যে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারেনি, যেকোনো মূল্যে জীবনে বেঁচে থাকার অমোঘ তাগিদকে বিনষ্ট করতে পারেনি--তা এ নাটকে ঘটনা ও চরিত্রের বিন্যাসে সুপরিস্ফুট। যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবন সম্পর্কে বোধও বদলে যাচ্ছে। তাই অসুস্থ পিতাকে রোগমুক্ত করবার জন্যে অর্থ রোজগারের তাগিদে কন্যা দেহবিক্রি করছে। নোয়াখালি থেকে দেশবিভাগের সময় একবস্ত্রে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসেছেন মহেন্দ্র দাস, পুত্রকন্যা নীরা ও ইন্দ্রকে নিয়ে। তাদের সঙ্গে জবা নামে আর একটি বিবাহিতা মহিলাও এসেছে, যার স্বামী তাকে ফেলে চলে গেছে। এদেশে এসে তারা ঘর ভাড়া নেয়। বেকার ইন্দ্র হন্যে হয়ে চাকরি খোঁজে। মহেন্দ্র হাঁপানিতে কষ্ট পায়। মেয়ে নীরা বাড়িওয়ালার নার্সিং সেন্টারে চাকরি নিয়ে বুঝতে পারে যে নার্সিং সেন্টারটি আসলে অভাবী মেয়েদের সর্বনাশের ফাঁদ। ইতিমধ্যে জবার প্রাক্তন স্বামী পুলিশের সাহায্যে তাকে ফিরিয়ে নিতে এলে জবা তাকে অস্বীকার করে—কারণ বিপদের সময় যে স্বামী তার স্ত্রীকে ফেলে পালায় তার মধ্যে আর যাই থাক মনুষ্যত্ব নেই। জবার পরিবর্তিত মানসিকতা ধর্ম নয়, জাত নয়—মনুষ্যত্ব ও মানুষকেই মর্যাদা দেয়। মীরা রিভলবার জোগাড় করে বাড়িওয়ালার নোংরামির শোধ নেবে বলে, কিন্তু পারে না। তার মনে হয় জীবন মরুভূমিতে সবাই উট- ক্ষতবিক্ষত হয়েও কাঁটা গাছ খায়। পিতা মহেন্দ্রের চেতনা ফেরে। তিনি রোগ সারাবার 'বুজরুকি-ওষুধ' ফেলে দিয়ে কন্যাকে পরম স্নেহে বুকে টেনে নেন এই বলে—"আয় মা! আমার বুকে আয়--এ মরুভূমিতে এইটুকু যা ওয়েসিস"। নাটকের শেষে শাশ্বত জীবনের জয়গান গাওয়া হয়েছে, কিন্তু বাস্তুহীন মানুষের মর্মযন্ত্রণা আমাদের বিদ্ধ করলেও যন্ত্রণনার মূল উৎসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তুলতে সাহায্য করে না।

টোটোপাড়া : প্রথম প্রকাশ শনিবারের চিঠিতে (কার্তিক ১৩৬০)। প্রথম প্রকাশিত হয় 'টোটো পাড়ায় আসুন' এই নামে। নাটকের প্রস্তাবনা অংশটি তখনও সংযোজিত হয়নি। পরে সংযোজিত হয়। দুটি দৃশ্য সমন্বিত একাঙ্কটির দ্বিতীয় দৃশ্যই নাটকটির সামগ্রিক রূপ ছিল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের রাজাবাজার শাখা ১৯৫৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী এটি 'রঙমহল'-এ অভিনয় করে। এতে ব্যবহৃত সঙ্গীতটি রচনা করেন সজনীকান্ত দাস। চরিত্র সংখ্যা দশ—পুরুষ ৮, নারী ২। একটি বিলীয়মান উপজাতি টোটো জীবনের অর্থনৈতিক দুর্গতি, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের শৃঙ্খল এ নাটকের ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত। টোটোদের লোকসংখ্যা তিনশো চোদ্দ। চাষ তাদের প্রধান উপজীবিকা। দরদী মন নিয়ে নাট্যকার এই উপজাতিটির জীবন-রহস্যের স্বরূপ আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়েছেন। এদেরই একটি পরিবার পেস্তা আর লাবেজ—দুই ভাই-এর পরিবার। তাদের দুজনের স্ত্রীরা হল যমুনা আর কুপিনী। সন্তান সম্ভবা কুপিনীর সুখে নিঃসন্তান যমুনা

ঈর্ষায় জ্বলে। সুখের সংসারে নামে অশান্তির ছায়া। সমাজপতি সমস্যার সমাধান করতে এলে বিপর্যয় নামে দুজনেরই সংসারে। সুতীব্র ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে একটি অবহেলিত উপজাতির সুখদুঃখ মিশ্রিত জীবন সংগ্রামের বাস্তব রূপায়ণ ঘটিয়েছেন নাট্যকার। নট নাট্যকার উৎপল দত্ত নাট্যকারকে লেখা একটি পত্রে অভিনন্দিত করে লিখেছিলেন, "আপনার টোটোপাড়া কি অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর।" জীবনকে নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করার মানসিকতাই এই নাটক সৃজনের মূল প্রেরণা।

রক্তকদম : প্রথম প্রকাশ দীপালীতে (শারদীয়া সংখ্যা ১৩৬৪)। চরিত্র সংখ্যা তিন—পুরুষ ২, নারী ১। আদিম আরণ্যক মানুষের জৈবিক কামনার ছবি, ত্রিভুজ প্রেমের সংঘাতে এ একাঙ্কটি সুন্দর। পশ্চিমবঙ্গের একটি কয়লা খনি অঞ্চলে এই নাট্য কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে। অর্থ সুখ আর বিলাসিতার আকাঙক্ষা মংলুর স্ত্রী কদমকে হাজিরাবাবু মোহনের প্রতি আকৃষ্ট করে। অথচ সে তো সত্যি ভালবাসে তার স্বামী মংলুকে। ত্রিভুজ প্রেম সংঘাতের আবর্ত সৃষ্টি করে। মংলুর ঘর ভাঙে। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত মংলু মোহনকে হত্যা করে কলকাতায় লাখো মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যায়। নাট্যকার নারী চরিত্রের রহস্যময়তাকে আভাসিত করেছেন কদমের মধ্যে। সে যখন হাজিরাবাবুকে বলে—"এমন একটা লোক যে তাগদটা পেল আমার সর্দারের আর বুদ্ধিটা পেল তোর, দরদটা পেল আমার সর্দারের আর চেহারাটা পেল তোর, ধরমটা পেল আমার সর্দারের—আর রোজগারটা পেল তোর—এমন একটা লোক আমার খসম কেন হোলো না।" তখন অরণ্যবাসী ঐ সরল রমণীটির মধ্যে প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে, উপলব্ধির স্পষ্ট উচ্চারণে আধুনিক মনোবিকলনের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়।

কয়েকটি একাঙ্কে নাট্যকার রূপকের আড়ালে বক্তব্যের ব্যঞ্জনাময় উপস্থাপনা ঘটিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'সুনয়নী, পঞ্চভূত ও বসুন্ধরা'।

সুনয়নী : প্রথম প্রকাশ বেতার জগৎ শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৭)। কোন চরিত্রের নামকরণ করা নেই। সংলাপের মধ্যে দিয়ে নারী পুরুষ চেনা যায় এইমাত্র। নাট্যকার নিজে এটিকে 'রূপক' আখ্যা দিয়েছেন। সূর্য সাধুর গুপ্ত গুহায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে ইচ্ছুক নরনারীরা সমবেত হয়েছেন। তার মধ্যে দুটি নরনারী দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে চাইল না, কারণ তারা পরস্পরের প্রতি যে ধারণা পোষণ করে গভীর ভালবেসেছে তাকে আহত করতে চাইল না। মানস নয়নে একে অন্যের রূপ নিরীক্ষণ করে পরস্পরকে চেনার সত্যটি বাস্তব সত্যের আলোকে আহত করতে তারা সাহসী হল না। অনেকসময় দৃষ্টি ফিরে পেয়েও তো মানুষ প্রকৃত সত্যের, প্রকৃত সৌন্দর্যের উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হয়। সংলাপ এ একাঙ্কটির সম্পদ।

পঞ্চভূত : প্রথম প্রকাশ একাঙ্কিকা সংকলনে (১৩৩৮)। চরিত্র সংখ্যা দশ—পুরুষ ৯, নারী ১। রূপকধর্মী একাঙ্ক। গবেষণার নেশায় পাগল অধ্যাপকের দূরত্ব তার স্ত্রীর সাথে ক্রমশ বেড়েই চলে। গবেষণাই তার কাছে প্রাধান্য পায়। দাম্পত্য জীবন, সংসার, ভালবাসা তুচ্ছ হয়ে যায়। 'পঞ্চভূত' এসে যেদিন তার স্ত্রীকে গ্রাস করে সেদিন সে চৈতন্য ফিরে পায়।

বসুন্ধরা : প্রথম প্রকাশ পূর্বাশায় (মাঘ ১৩৪০)। চরিত্র সংখ্যা ছয়—পুরুষ ৪, নারী ২ । এটিও রূপকধর্মী একাঙ্ক। মানুষ এই বসুন্ধরার কোলে ভালাবাসা, স্বপ্ন, কামনা বাসনা নিয়ে ঘর বাঁধে—কিন্তু সে স্বপ্নের ঘর তাকে ছেড়ে চলে যেতে হয় একদিন। এটিই পৃথিবীর অমোঘ সত্য। শিল্পী রঞ্জিতও সুখে ঘর বেঁধেছিল কিন্তু অভাবের থাবা তার সুখের সংসারে আঘাত হানে। বাড়ি ভাড়া বাকি পড়ে, বিয়ের ঘড়ি বিক্রি করে অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হয়। এতসব কথা স্ত্রী রানীকে সে জানাতে চায় না। কিন্তু তার এ দুঃখের অংশীদার হয় তাদের অনুগত ভৃত্য মধু। রঞ্জিত অর্থ সংগ্রহের তাগিদে ছবি আঁকে। সেই সন্ধ্যাতেই তার অর্থ দরকার, কারণ সন্ধ্যের মধ্যেই তাকে এ বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়িতে যেতে হবে। স্ত্রী রানী স্কুল থেকে ফিরে ছবিটি দেখে অবাক হয়। রঞ্জিত তাকে সেই ছবির ভাষা বোঝায়—ধানক্ষেতের পাশে ছোট বাড়ি, সামনে কড়াইশুঁটির ক্ষেত, মেঠো পথ—সেই পথের শেষে দুটি নরনারী। বসুন্ধরার ভাড়াটে হতে অজানা দেশ থেকে এসে পড়েছিল একটুখানি আশ্রয় পেতে। সে আশ্রয় তারা পেল, বাসা বাঁধলো, মাটি চষলো, আবাদ করলো, বীজ বুনলো, ফলফুল হল, পৃথিবী সুন্দর থেকে সুন্দরতর যখন হল তখন ওরা বসুন্ধরার ভাড়া মিটিয়ে বসুন্ধরা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হল।

স্বদেশী আন্দোলনকে প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করে তিনি যে কটি একাঙ্ক রচনা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'ভারতী', 'আম্রমঞ্জরী', 'মহাপ্রেম', 'জওয়ান', 'স্বর্ণকীট' এবং 'সমান্তরাল'। যুদ্ধের পটভূমিকায় দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে এই একাঙ্কগুলিতে তাঁর আধুনিক মনোভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। দেশের বিপন্ন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নাট্যকারের লেখনী প্রতিরোধী ভূমিকা নিয়ে ঐক্যবোধকে জাগ্রত করতে প্রয়াসী হয়েছে। দেশাত্মবোধ থেকেই তো ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রামের সূচনা। নিজের দেশকে ভাল না বাসলে তাকে সুন্দরতর করার ইচ্ছাটাও যে আন্তরিক হবে না। মন্মথ স্বাধীনতার আগে যে নাটকগুলি লিখেছেন তার সঙ্গে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর লেখা নাটকগুলির মৌলিক পার্থক্য ঘটে গেছে। স্বাধীনতালাভের পর নানাধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যায় বিব্রত দেশের পটভূমিকার পরিবর্তন হয়েছে। স্বাধীনতার গভীর আবেগ আর নেই। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে। ফলে নাট্যকার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁর প্রতিবাদের লক্ষ্যবস্তুটিকেও বদলেছেন। পররাজ্যগ্রাসী বৃটিশ শাসক শ্রেণী নয়, তাঁর

নিজ দেশেই যে সুবিধাবাদী, প্রবঞ্চক, লোভী ক্ষমতামত্ত শোষক শ্রেণীর জন্ম হয়েছে— যারা নীচের তলার মানুষকে শোষণ ও নিপীড়ন করে ক্রমশ স্ফীতকায় হচ্ছে তাদের কার্যকলাপকেই তিনি তীক্ষ্ণ সমালোচনার মুখে দাঁড় করিয়েছেন তাঁর সৃজনের মধ্যে দিয়ে। এই শ্রেণীর একাঙ্কগুলির সাহিত্যমূল্য কম হলেও এতে উচ্চারিত মানবপ্রেমের মধ্যে আছে গভীর আন্তরিকতা।

ভারতী : প্রথম প্রকাশ ভারতী পত্রিকায় (১৩৬৫ বৈশাখ)। চরিত্র সংখ্যা নয়—পুরুষ ৭, নারী ২। এ কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র ভারতী। জানা যায় দোল পূর্ণিমায় তার জন্মতিথি। ঐদিন যার কপালে ভারতী আবির দেবে সেই-ই হবে তার জীবনসঙ্গী। কিন্তু এদিন ভারতী অপেক্ষা করে একজন বিশেষ মানুষের জন্য যিনি গত বছর এমনি দিনে দেশের জন্যে কাজ করার অপরাধে জেলে ছিলেন। এমন সময় খবর আসে সেই বিশেষ মানুষটি ভারতীর পুরোনো মাস্টার মশাই মনীশ, মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করতে গিয়ে আহত অবস্থায় গ্রেফতার হয়েছেন। আসন্ন মৃত্যু মুহূর্তে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন ভারতীকে, তাকে কিছু কাজের ভার দেবেন বলে। ভারতী উপেক্ষা করতে পারে না সে আহ্বান। একজন দায়িত্বশীল দেশপ্রেমিকের মত সেই আহ্বানে সাড়া দেয়। এই একাঙ্কটিতে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার প্রতি নাট্যকারের ক্ষোভ অনুচ্চারিত থাকেনি। ফলে নাটকের চরিত্রগুলির মুখ থেকেই শুনতে পেয়েছি ভুয়ো স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি কটাক্ষ। রোমান্টিক সাহিত্যচর্চার প্রতিও এখানে শ্লেষাত্মক বাক্য স্পষ্ট উচ্চারিত হয়েছে : "......দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কই? সকল সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কই? কোথায় সেই সাহিত্য যা গানে গল্পে কবিতায় নিষ্পেষিত জীবনের বিদ্রোহকে বজ্রের ভাষা দেয়। অচেতনকে সচেতন করে, উদ্বুদ্ধ করে, সঞ্জীবিত করে।" দেশপ্রেমের আবেগ এ নাটকে বাস্তবতাকে লঘু করেছে—নাটকীয়তাও কাঙ্ক্ষিত মান স্পর্শ করেনি।

আম্রমঞ্জরী : প্রথম প্রকাশ নবশক্তি ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় (১৩৪০)। চরিত্র সংখ্যা চোদ্দ—পুরুষ ১, নারী ১৩। বৃন্দাবনের রাধাকুঞ্জে দোলোৎসব পালিত হল না আম্রমঞ্জরীর অভাবে। চ্যুত মঞ্জরী হল নবজীবনের প্রতীক। বৃন্দাবনে প্রাণের অভাব হয়েছে, তাই আম্রমঞ্জরীর দেখা নেই। কিন্তু মথুরায় মাত্র একটি মরা গাছে আম্রমঞ্জরী আছে। মথুরা থেকে সেই আম্রমঞ্জরী ছিনিয়ে আনতে হবে। রূপকের আড়ালে একাঙ্কটিতে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার ছবি আঁকা হয়েছে।

স্বর্ণকীট : প্রথম প্রকাশ আনন্দবাজার পত্রিকায় (অগ্রহায়ন ১৩৬৯)। চরিত্র সংখ্যা পাঁচ—পুরুষ ৩, নারী ২। চীন ভারত যুদ্ধের পটভূমিকায় একাঙ্কটি রচিত। স্বর্ণকীট অরিন্দম সোনার নেশায় পাগল হয়ে দেশের গোপন খবর শত্রুর কাছে পৌঁছে দেন। অথচ তার পরিবারেরই স্ত্রী পুত্র কন্যা দেশকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে। এ সত্য উপলব্ধ

হওয়ার সাথে সাথেই অরিন্দম ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কায় আত্মহননের পথটিই বেছে নেন। একাঙ্কটিতে নাট্যদ্বন্দ্ব কম বলে উচ্চমানে পৌঁছতে পারেনি। চরিত্রগুলিও সাদামাটা, তাই কাহিনী নাটকীয় গুণমান স্পর্শ করতে পারেনি। এটি 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।

জওয়ান : প্রথম প্রকাশ 'অমৃত'-তে (অগ্রহায়ন ১৩৬৯)। এ একাঙ্কের দুটি চরিত্র চোর ও পকেটমার—লণ্ঠন ও পল্টন নকল দেশপ্রেমিকের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে হঠাৎ সত্যিকারের দেশপ্রেমিকে পরিণত হয়ে যায়। নাট্যকার দেশপ্রেমের আবেগে দেশাত্মবোধের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে কাহিনীতে অবাস্তব পরিস্থিতি এনে ফেলেছেন। চুরি করতে এসে মহানন্দের পরিবারের সকলের কাছে অফুরন্ত ভালবাসা পেয়ে তারা আমূল বদলে যায়। একাঙ্কটিতে শুরুর দিকে হাল্কা কৌতুকরসের আতিশয্য ও শেষে দেশপ্রেমের অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস স্থান পেয়েছে বলে এর মান আশানুরূপ হয় নি। 'বিশ্বরূপায়' এই একাঙ্কটি অভিনীত হয়।

সমান্তরাল : প্রথম প্রকাশ রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকায় (১৩৬৯)। চরিত্র সংখ্যা তিন—পুরুষ ২, নারী ১। পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছে। দেশপ্রেমিক অধ্যাপক মনোজ বসু যুদ্ধের ত্রাণ-তহবিল সংগ্রহের জন্যে নানা জায়গায় মিটিং করে বক্তব্য রেখে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। তাঁকে এ কাজে সাহায্য করছেন জয়া সেন, তাঁর সহকর্মিণী। অধ্যাপকের অসুস্থ স্ত্রী সবিতা ব্যাপারটিকে সহজভাবে নিতে পারে না, ভুল বোঝে। সেজন্য সে স্বামীকে মাথা ধরার ওষুধের বদলে ব্লাড-প্রেশার নামাবার বড়ি দেয়, যাতে পরদিন সে কোনো সভায় যেতে না পারে। এ ঘটনা কিন্তু গোপন থাকে না। পরে নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়। একাঙ্কটিতে দেশপ্রেমিক অধ্যাপক ও তার সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত স্ত্রীর মানসিক বিশ্লেষণ নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন নাট্যকার।

নারায়ণ : প্রথম প্রকাশ 'যষ্টিমধু' প্রফুল্লচন্দ্র রায় জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩৬৮)। স্বদেশ প্রেমিক প্রফুল্লচন্দ্র রায় যে দেশের স্বাধীনতার জন্য বৈজ্ঞানিক সাহায্য দিয়ে নিজেকে পরোক্ষভাবে বিপ্লবীদের সাথে যুক্ত রেখেছিলেন অনেকের অজ্ঞাত এ বিষয়টিকে উপজীব্য করে নাট্যকার এ একাঙ্কটির রচনা করেছেন। সে যুগের অন্য খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকরাও যে (নীলরতন সরকার, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেন্দ্র ঘোষ) এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা নাট্যকার সুকৌশল নাট্যকাহিনী গ্রন্থনের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তথ্যসমৃদ্ধিই এ একাঙ্কটির প্রাণ।

বাংলাদেশ (পূর্ব-পাকিস্তান)-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী নিয়েও মন্মথ একাঙ্ক রচনা করেছেন। তিনি তাঁর রচনার মধ্যে অতীত ঘটনাকে ধরে রাখার পাশাপাশি সমকালে ঘটে যাওয়া বিশেষ ঘটনাকেও গুরুত্ব দিয়ে নাটক রচনা করতে ভোলেন নি।

স্বাধীনতার ইতিহাস : প্রথম প্রকাশ 'স্বদেশ' নববর্ষ সংখ্যায় (১৩৭৯)। ৩টি দৃশ্যে সম্পূর্ণ নাটক। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে মুজিবর রহমান যে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা করেছিলেন তার নিখুঁত বাস্তব রূপ চিত্রিত করেছেন নাট্যকার। নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত মুজিবরের ভাষণ ব্যবহারে অত্যন্ত সচেতন তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। মুজিবর রহমান ১৯৭২ সালের ৭ই মার্চ রমনার রেসকোর্সে জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, "আমরা রক্ত দিয়েছি আরও রক্ত দেব। এই সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তারপর ২৬শে মার্চ ধানমণ্ডির বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে। ২৫শে মার্চ গভীর রাত্রে ঢাকাতে শুরু হয় পাকিস্তানী জল্লাদ সৈন্যবাহিনীর ধ্বংস, হত্যা ও তাণ্ডব। সঙ্গে সঙ্গে মুজিবর বাংলাদেশের বেতারে ঘোষণা করেন সোনার বাংলার স্বাধীনতা। ১৭ই এপ্রিল মুজিব নগরে এক আম্রকুঞ্জে আনুষ্ঠানিক ভাবে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়—যার নতুন নামকরণ হয় 'স্বাধীন গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।" সে স্বীকৃতি চায় পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশগুলির কাছে। স্বীকৃতি দিতে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে ভারত। এ একাঙ্কের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি চরিত্র নিখুঁতভাবে ইতিহাসের অনুগমন করেছে। তথ্যের প্রতি স্থিতনিষ্ঠতায় কোথাও এতটুকু বিচ্যুতি ঘটেনি। সমকালীন যে কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে নাটকের আঙ্গিকে ধরে রাখার বিচক্ষণতায় মন্মথ দায়িত্বশীল সমাজ সচেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

একুশে ফেব্রুয়ারী : 'কম্পাস' পত্রিকার সম্পাদক পান্নালাল দাশগুপ্তের অনুরোধে মন্মথ রায় ঢাকার ঐতিহাসিক শহীদ দিবস ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাকে নিয়ে একাঙ্কটি রচনা করেন। প্রথম প্রকাশ 'কম্পাস পাবলিকেশন'-এ (১৩৭৪)। চরিত্র সংখ্যা ৬--পুরুষ ৫, নারী ১। ভূমিকাতে মন্মথ নিজে বলেছেন, "পূর্ব-বঙ্গের ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক তথ্যাদি জাতির মানস পটে জাগ্রত রাখাই"—এই একাঙ্ক রচনার উদ্দেশ্য। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্মের আগেই একাঙ্কটি রচিত। নাটকের ঘটনার স্থান ও কাল ঢাকা, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সাল, বৃহস্পতিবার বেলা ৩টা। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রমনার মাঠে লক্ষাধিক লোকের জনসভায় কায়েদ ই আজম জিন্না ঘোষণা করেছিলেন যে মুসলমান রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হবে উর্দু। ঐ সালেই অ্যাসেম্বলিতে দাবি জানানো হয় যে, সংখ্যা গরিষ্ঠের মাতৃভাষা হিসেবে পূর্ববাংলায় রাষ্ট্রভাষা হোক বাংলা। গড়ে ওঠে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম সমিতি। তারা '৪৮ সালের ১১ই মার্চ ঢাকায় এক সাধারণ ধর্মঘট ডাক দেন। পুলিশী অত্যাচার শুরু হয়। আহত হয় প্রচুর। তারপর ঐতিহাসিক দিনটিতে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণ দেন পূর্ব-বাংলার অসংখ্য মাতৃভাষা-প্রেমী মানুষ। তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই নিবেদিত এই একাঙ্কটিতে একই সঙ্গে নাট্যকারের সাংবাদিক তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে শৈল্পিক বোধের মিশ্রণ লক্ষণীয়।

একাঙ্ক রচনা করতে গিয়ে নাট্যকার কখনও ক্লান্তিবোধ করেন নি। বিষয়ের

অপ্রতুলতা কখনও তাঁর কাছে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি--তাই তার লেখনী অবিশ্রাম লেখার মাঝেই বৈচিত্র্য আনবার জন্যই কখনও কখনও খুঁজে নিতে চেয়েছে বিচিত্র বিষয়, স্বতন্ত্র আঙ্গিক, ভিন্ন উপস্থাপনা। এমনই কতগুলি একাঙ্ক হল 'অভিসার', 'জন্মদিন', 'পলায়ন'। এই একাঙ্কগুলিতে বিদেহীর অস্তিত্ব সৃষ্টি করে ঘটনার বিস্তার ঘটিয়েছেন মন্মথ। এ শ্রেণীর রচনাগুলি দানা বাঁধেনি, নাট্যরস কোনো তীব্র দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়নি। ফলে একাঙ্কগুলি তুলনায় দুর্বল হয়েছে।

জন্মদিন : প্রথম প্রকাশ 'শনিবারের চিঠি' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৭)। চরিত্রের নাম উল্লেখ নেই। চরিত্র সংখ্যা আট--পুরুষ ৬, নারী ২। একাঙ্কটি পাঠ্যস্বাদে রমণীয়। চরিত্রগুলির আগমন ও নির্গমন বলা নেই। চরিত্রগুলির নামোল্লেখও নেই। তবে সংলাপের মধ্যে দিয়েই চিনে নেওয়া যায়। ঘটনা যত এগিয়েছে চরিত্রগুলো ততই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে। মূল চরিত্র দুটি--খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও মৃত্যু। দুজনার কথা বলার মাঝখানে কয়েকটি চরিত্র এসেছে (যেমন স্ত্রী, পুত্র, কন্যার সহকারী শিক্ষয়িত্রী, বন্ধু বিপদভঞ্জন, অনাথ আশ্রমের অমল)। খ্যাতনামা সাহিত্যিক তাঁর প্রতি জন্মদিনেই মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চেনাজানা পৃথিবীর কাছে তার মূল্য ক্রমশ কমে যায়। প্রতিটি জন্মদিন পার হয়ে সে মৃত্যুর কাছাকাছি অগ্রসর হয়। কিন্তু মানুষ জীবনের এই চরম সত্যকে স্বীকার করতে ভয় পায়। সূর্যবাবু কিন্তু এ সত্যকে স্বীকৃতি দিতে ভীত হলেন না। তাই জীবনের ঘটল জয়, মৃত্যু তাকে এত তাড়াতাড়ি জীবন থেকে বিচ্যুত করতে পারল না। নামহীন চরিত্রের চলমান সংলাপ থেকে ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট রূপায়ণই এই একাঙ্কটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অভিসার : প্রথম প্রকাশ শারদীয়া 'সংহতি' পত্রিকায় (১৩৪৬)। পরবর্তী কালে 'যম' নামেও পুনর্মুদ্রিত হয়। চরিত্র সংখ্যা পাঁচ--পুরুষ ৩, নারী ২ । জ্যোতিষাচার্য ভাস্কর মিশ্র কন্যা চন্দ্রার ষোড়শ জন্মতিথিতে বিবাহ এবং মৃত্যু গণনার মাধ্যমে এ সত্য জানতে পেরে বিবাহের সব সম্বন্ধই ফিরিয়ে দেন। কিন্তু যমকেই স্বয়ং আসতে হয় ছদ্মবেশে কন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে। চন্দ্রা তাঁকে বিবাহে সম্মতি জানায় এবং মৃত্যুবরণ করে।

পলায়ন : প্রথম প্রকাশ 'উত্তরা' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৭)। চরিত্র সংখ্যা দশ--পুরুষ ৯, নারী ১। আসামের 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের ঘটনা নিয়েই এই একাঙ্কের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। এ একাঙ্কটিতে চরিত্রের কোনো নামকরণ করা নেই। অথচ সংলাপ প্রয়োগের সুদক্ষ কৌশলে প্রত্যেকটি চরিত্রকেই আলাদা করে চিনে নেওয়া যায়। একটি অপরিচিত স্থানে ধূসর কুয়াশায় আচ্ছন্ন পরিবেশে নাট্যকাহিনীর সূত্রপাত। একটি দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা থেকে পালিয়ে আসা বিভিন্ন চরিত্রের গুটিকয়েক মানুষ পথের আচমকা দুর্ঘটনায় হঠাৎই আটকা পড়েছে। চরিত্রগুলির স্বীকারোক্তির মধ্যে দিয়ে একটা কথাই

স্পষ্ট হয়েছে যে সকলেই পালিয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু পালিয়ে তো বাঁচা যায় না। শেষ পর্যন্ত জানা যায় চরিত্রগুলি জীবিত নয়, মৃত। নাট্যকার আশাবাদী, তাই বিপর্যস্ত ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ছবি আঁকলেও তিনি তা থেকে মহৎ উত্তরণের পথও সহজেই খুঁজে নিয়েছেন। এ একাঙ্কটি সম্বন্ধে নারায়ণ চৌধুরী বলেছেন--"পলায়ন উদ্দেশ্যমূলক ফ্যাণ্টাসীর এক অনবদ্য উদাহরণ"।

মন্মথ সমাজের নানা ত্রুটি বিচ্যুতি অসঙ্গতিকে রঙ্গ ব্যঙ্গ ও কৌতুকের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরে সঠিক পথটি নির্দেশ করেছেন তাঁর বিভিন্ন একাঙ্কে। এ ধরনের একাঙ্কের সংখ্যা বড় কম নয়। এই ধারায় তিনি কোনো অসফলতার চিহ্ন রাখেননি। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্যজনিত দুঃসহ অবস্থার নিপুণ পর্যবেক্ষক হিসেবে শুধু নয়, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ একজন দরদী লেখক হিসেবেও তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন এ পর্যায়ের রচনার মধ্যে দিয়ে। এই ধরনের অসঙ্গতির ছবি তিনি ব্যঙ্গ ও কৌতুকের মধ্যে দিয়ে যে একাঙ্কগুলিতে তুলে ধরেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যতার মান স্পর্শ করতে পেরেছে বাটপাড়ি, নতুনপাঠ, যা হয় না, অ-মৃত, একটিন বার্নিশ, সত্যমেব জয়তে, স্বর্গের সিঁড়ি, সামনেই স্বর্গ, নরখাদক শয়তান শ্রী, স্ট্যাচু, ভূভারহরণ কর্পোরেশন, ওলট পালোট, গো সেবা, কামধেনু কবচ, মরা হাতি লাখ টাকা, মেলাও এবার হাত, কুকুর বেড়াল, শ্রেষ্ঠ শাশুড়ী প্রতিযোগিতা, রফা, শেষ সংবাদ, মানুষের কামড়ে, বিবসনা, এক দুই তিন, বোমা, যমালয়ে একবেলা, গৃহরাজ্য, মুখোশ, বীক্ষণ, অলৌকিক, আজব দেশ, কানাই বলাই, কোটিপতি নিরুদ্দেশ, দাওয়াই, এই হয়েছে আইন, একটি রাজকীয় মৃত্যু, হেড আপিসে গোলমাল, বলো হরি হরি বোল, কষ্টিপাথর, যা হয়না একাঙ্কগুলি।

ভূভারহরণ কর্পোরেশন : প্রথম প্রকাশ আনন্দবাজার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৪৬)। চরিত্র সংখ্যা দুই। নারী বর্জিত। ধর্মের ভেকধারী ভণ্ড সাধুদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এ একাঙ্কটিতে। 'ভূভারহরণ কর্পোরেশন'-এর সভাপতি হর্ষ্যানন্দ অন্ধকার গোপন পথে নিজ স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য জীবকুলের পাপভার হরণের ছদ্ম দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য শিষ্যবেশী গোয়েন্দার হাতে তিনি ধরাও পড়েন। গোটা সমাজের অসঙ্গতির প্রতি তীব্র ক্ষোভ ধ্বনিত হয়েছে এ একাঙ্কটিতে। সংলাপের মধ্যে দিয়ে ব্যঙ্গের সরস তির্যকতা সর্বত্র শাণিত হলেও কোথাও তা সংযমের মাত্রা ছাড়ায়নি।

ওলট পালট : প্রথম প্রকাশ শারদীয়া মাসিক শেয়ার মার্কেট পত্রিকায় (১৩৪৬)। চরিত্র সংখ্যা পাঁচ—পুরুষ ৩, নারী ১। যৌন পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে অন্যান্য নরনারীর জীবনে কিভাবে সমস্যার ঢেউ উঠল সেই কাহিনীটিকে নাট্যকার সুকৌশলে সরসতার মধ্যে দিয়ে পরিবেশন করেছেন।

বাটপাড়ি : প্রথম প্রকাশ 'পরাগ' শারদীয়া সংখ্যা (১৩৫১)। পরে এটি 'মাসতুতো ভায়েরা' নামে 'হোমশিখা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (আশ্বিন ১৩৬২)। চরিত্র সংখ্যা তিন। তিনটিই পুরুষ চরিত্র। চুরি করতে এসে হাতেনোতে ধরা পড়ে স্বীকার করে যে অভাবের তাড়নায় সে একাজ করতে নেমেছে। সরল স্বীকারোক্তির ফলে সে উত্তম মধ্যমের পরিবর্তে পায় দশটা টাকা ও মুক্তি। কিছু পরে দেখা গেল, যে ব্যক্তি চোরকে ধরেছিল সে-ই অন্য আর একজনের বাক্স খুলে টাকাপয়সা ইত্যাদি সরাচ্ছে। ঘটনাক্রমে জানা গেল যার টাকা সে সরাচ্ছে সেও আসলে এক চোরাকারবারি। অর্থাৎ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই আর কি। এই একাঙ্কটি ব্যঙ্গ করা হয়েছে তাদের "যাদের কোনো গুণ নেই, কোনো বিদ্যা নেই—দেশের সর্বনাশ করে টাকা রোজগারের ফন্দিফিকির করে।"

বিবসনা : **প্রথম** প্রকাশ 'ন্যাংটো মেয়ে' নামে শারদ সংখ্যা 'ভগ্নদূত'-এ (১৩৫২)। পরে **'বিবসনা' নামে** 'ফকিরের পাথর' একাঙ্ক সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। চরিত্র সংখ্যা তিন—**পুরুষ ১, নারী ২**। অর্থনৈতিক সমস্যার বাস্তব রূপ এ একাঙ্কটিতে ফুটে উঠেছে। উলঙ্গ ফুলিকে দেখে বিনতা ভূত ভেবে ভয় পায়। স্বামী দিব্যেন্দুকে ডাকে। দিব্যেন্দু বন্দুকের গুলিতে প্রমাণ করতে চায় প্রকৃত সত্যের। উলঙ্গ ফুলি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা পড়ে। তালপুকুরে স্নান করতে গিয়ে যার একটি মাত্র ছেঁড়া কাপড় চুরি যেতে লজ্জা নিবারণের জন্য যে বিনতাদের বাড়িতে আশ্রয় নিতে যায়। আসলে বস্ত্র সংকটে মাঝে মাঝে লজ্জা নিবারণ করাও দায় হয়ে পড়ে। তাই উলঙ্গ ফুলি বুকে গুলি লাগার পর তার আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে আক্ষেপ করে না, বলে "গুলি করে মেরে ভালই করলে। আমি বেঁচে গেলাম।" লজ্জা নিবারণের দায় থেকে বেঁচে গিয়ে সে সমাজের অসম বৈষম্যের প্রতি তার তীব্র ক্রোধ পাঠকের মনে অজ্ঞাতসারে সঞ্চারিত করে দিয়ে যায়।

নতুনপাঠ : প্রথম প্রকাশ শারদীয়া 'ভগ্নদূত'-এ (১৩৬০)। পরবর্তীকালে 'শিক্ষকের শিক্ষা' নামে গৌহাটির যুব সাহিত্য সংস্থায় প্রকাশিত হয় (১৩৬২)। স্বাধীনতালাভের ছ' বছর পরে গোটা দেশের প্রশাসন যন্ত্র যে অকেজো হয়ে দেশে নৈরাজ্যের বিপর্যয় ডেকে এনেছে সে ব্যাপারে তীব্র ক্ষোভ উচ্চারিত হয়েছে এ একাঙ্কটিতে। দেশে খাদ্য-বস্ত্র-ঔষধ-সর্বত্রই ভেজাল। বিদ্যালয়ে ভর্তি থেকে শুরু করে ফ্রি-শিপ পাবার জন্য ভূয়া রেশনকার্ড, ভেজাল দরখাস্ত সব কিছুকেই নাট্যকার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে আক্রমণ করেছেন। যে দরিদ্র সৎ শিক্ষক সারাজীবন আদর্শনিষ্ঠ থেকে ছাত্র সমাজকে সততার উপদেশ দিয়ে এসেছেন, সেই শিক্ষককেই সৎ থাকার অপরাধে মিথ্যা চুরির দায়ে জেলে যেতে হয়। নিদারুণ মনোবেদনায় তাঁকেই নতুনপাঠ-এর কথা বলতে শুনি। তার ঐ নৈরাশ্যজনক নেতিবাচক উক্তি আমাদের কেবলমাত্র ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ করে না—অবক্ষয়িত সমাজ ব্যবস্থার শিকার, ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধে হতাশাদীর্ণ মানব সমাজের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে। মন্মথ দায়িত্বশীল সমাজ সংস্কারকের মতই এক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতি অঙ্গুলি

নির্দেশ করে আমাদের সচেতন করতে চেয়েছেন।

যমালয়ে একবেলা : প্রথম প্রকাশ 'সংহতি' আশ্বিন সংখ্যায় (১৩৬১)। চরিত্র সংখ্যা আট—পুরুষ ৭, নারী ১। কৌতুককর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সমাজের বৈষম্য অসঙ্গতি অন্যায় ভণ্ডামি ও পাপাচারকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। যমপুরীতে যমরাজ সিংহাসনে আসীন। বিচার চলছে। একে একে চরিত্রগুলি আসছে—তাদের অপরাধের কথা কবুল করছে। সাধুচরণের অংশটি নক্সানাট্য 'চিত্রগুপ্তের দপ্তর' থেকে এখানে সংযোজিত করা হয়েছে। নাম সাধু হলেও এমন কোনো অসাধু কাজ নেই যা সে করেনি। সে প্রথম শ্রেনীর নরকবাসে দণ্ডিত হল, কারণ সে অসাধু কাজ করলেও আজীবন তার বৃত্তিতে সে সততা দেখিয়েছে। কামনাদেবী নিজেও কামনার আগুনে পুড়েছে অপরকেও পুড়িয়েছে। মিথ্যে খেলা খেলতে খেলতে হঠাৎ সে যখন একদিন ভালবাসল তখন তার প্রেমাস্পদ অন্য রমণীর প্রতি আসক্ত জেনে আত্মহত্যা করা ছাড়া তার আর উপায়ই রইল না। এরপর কাঠগড়ায় এল রামহরির গড়গড়ি ভেজালের কারবারি—কোটিপতি। দানধ্যানের ঢাক পিটিয়ে সে বড় মানুষ সেজেছিল সমাজে। এর পরের আসামী পরমানন্দ—ভণ্ড সাধক, বহু মানুষকে পথে বসিয়েছে। এরপর এল দেশনেতা, স্বদেশ মানুষকে ধোঁকা দেওয়াই যার কাজ। সরস সংলাপে ও বিচিত্র চরিত্রের উপস্থাপনায় একাঙ্কটি উপভোগ্য হয়েছে।

যা হয়না : প্রথম প্রকাশ শারদীয়া 'রূপরঙ্গে' (১৩৬১)। পরবর্তী কালে 'নির্ভেজাল' নামে এই একাঙ্কটি 'ভগ্নদূত' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৮) প্রকাশিত হয়। ভেজাল বিষয়ে ব্যঙ্গ নাটিকা। ডাক্তার রোগী দেখছেন—সবাই পেটের অসুখে ভুগছে। ভেজাল খেয়ে খেয়ে নির্ভেজাল খাদ্য আর কারোরই সহ্য হচ্ছে না। যে ডাক্তার রোগী দেখছেন তারও পেটের ব্যারাম। শেষে তারা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, ভেজাল ওষুধ না দিলে কারো রোগ সারবে না।

কানাই বলাই : প্রথম প্রকাশ 'ভারতবর্ষ' (কার্তিক ১৩৬১) পত্রিকায়। চরিত্র সংখ্যা চার--পুরুষ ২, নারী ২। কৌতুকরস মধুর একাঙ্ক। দুর্গা আর চণ্ডীর স্বামীরা হল কানাই ও বলাই। দুর্গা শান্ত, সরল আর চণ্ডী মুখরা, কুটিলা। বলাই ও কানাই পুরীতে বেড়াতে গিয়ে একটি অসুস্থ জমিদার তনয়ার সঙ্গে পরিচিত হয়। বলাই তার প্রতি আসক্ত হয়। কিন্তু সে তার মুখরা স্ত্রীর ভয়ে নিজের নাম বলে কানাই। কানাই-এর নামে বাড়িতে সেই জমিদার তনয়ার প্রেমপত্র আসতে থাকে। শুরু হয় অশান্তি। চণ্ডী তার স্বামীকে সচ্চরিত্র মনে করে এবং দোষারোপ করে কানাই-এর প্রতি। ইতিমধ্যে হঠাৎ সংবাদ আসে রুগ্ণা জমিদার তনয়া দেহত্যাগ করেছে এবং সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দিয়ে গেছে কানাই-এর নামে। তখন চণ্ডীর আক্ষেপের আর অন্ত থাকে না।

রফা : প্রথম প্রকাশ শারদীয়া যষ্ঠিমধুতে (১৩৬৩)। চরিত্র সংখ্যা ছয়--পুরুষ ৫, নারী ১। প্রাণধন বসুর বিবাহযোগ্যা কন্যা সুনয়নীকে পাত্রপক্ষের দেখতে আসা ও মজাদার পরিস্থিতির সৃষ্টি এ একাঙ্কটিকে হাল্কা হাসির অনবদ্যতায় ভরিয়ে দেয়। চরিত্রগুলির নামকরণের ব্যাপারে নাট্যকারের রসবোধের পরিচয় মেলে--যেমন রাতকানা মেয়ের নাম সুনয়নী, তোত্‌লা পাত্র চন্দ্রবদন। প্রতিটি চরিত্র সংলাপ বলার আগে স্বগতোক্তিতে আগেই মনের ভাব ব্যক্ত করেছে।

বলো হরি হরি বোল : প্রথম প্রকাশ 'স্বদেশ' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৩)। চরিত্র সংখ্যা নয়--পুরুষ ৮, নারী ১। অত্যন্ত কৌতুককর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে মানুষের মনের রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন নাট্যকার। বেকার বাউণ্ডুলে শ্মশানবন্ধু--যারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষের কাছে অপাংক্তেয়, তাদের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, সততা ও অর্গলমুক্ত মনের ছবি প্রসন্ন কৌতুক অথচ মর্মন্তুদ নাট্যকাহিনীর মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত করেছেন নাট্যকার পরম মমতায়।

কামধেনু কবচ : প্রথম প্রকাশ 'স্বাধীনতা' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৩)। কৌতুকের মধ্যে দিয়ে মানব মনের চমৎকার বিশ্লেষণ ঘটেছে এ নাটকে। কামধেনু বিক্রি করে প্রভূত ধনশালী হয়েও ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রতাপচন্দ্র সিংহ, কর্মচারীদের অভুক্ত রাখে। সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েও অর্থের লালসায় মানবিকতা বিসর্জন দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। কাগজে বিজ্ঞাপনে 'কোটিপতি নিরুদ্দেশ'-এর ঘটনা ও সাথে লক্ষ টাকা পুরস্কারের সংবাদ--হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়। নাট্যকার যুগান্তর সব পেয়েছির আসরের ত্রয়োদশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সাহিত্যিকদের দ্বারা অভিনয়ের জন্যে এই একাঙ্কটিকেই নবরূপে গ্রন্থন করে দেন এবং তার নামকরণ করেন 'কোটিপতি নিরুদ্দেশ'। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ১৯৫৯ সালের ৩রা জানুয়ারী 'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে' এটি অভিনীত হয়। কোটিপতি নিরুদ্দেশ-এর পার্থক্য কেবলমাত্র সূচনায়। মাসের ১লা তারিখে শঙ্খ সরকার সিংহ মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত সপরিবারে কোটিপতিকে খুঁজতে যাওয়া দিয়ে নাটকের শুরু। কিন্তু 'কামধেনু কবচ'-এ প্রতাপ সিংহের গৃহে শংখ সরকারের আগমন, সাক্ষাৎ, বিজ্ঞাপনের খসড়া পড়া, কামধেনু কবচের কথা বলা হয়েছে। পরিমার্জিত সংস্করণে কামধেনু কবচ বৃত্তান্তটি বাদ যাওয়ায় নামকরণ পরিবর্তনে কোন বাধা আসেনি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নাট্যকার একাঙ্কটির পরিণতিতে আমাদের আশার আলোক দেখিয়েছেন।

মরা হাতি লাখ টাকা : প্রথম প্রকাশ 'ভারতবর্ষ' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৪)। পরে ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৭ সালে 'ছোটদের পাততাড়ি' (যুগান্তর) সব পেয়েছির আসরের জন্মজয়ন্তী উৎসবে মহাজাতি সদনে বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের দ্বারা এটি অভিনীত

হয়। অভিনয়ের উপযোগী করে তিনি ক্ষুদ্র নাটিকাটির সামান্য বৃদ্ধি ঘটান। একাঙ্কটির প্রযোজিত রূপে যে সঙ্গীতটি ব্যবহৃত হয়েছিল সেটির রচনাকার হলেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। এর চরিত্র সংখ্যা চব্বিশ--পুরুষ ২২, নারী ২। সওদাগরি অফিসের ছাপোষা কর্মচারীর হঠাৎ এক টাকার লটারিতে একটি সার্কাসের হাতি পাবার খবরকে কেন্দ্র করে উদ্ভুত বেদনা মধুর কৌতুকজনক পরিস্থিতি এই একাঙ্কটির মূল ঘটনা। গরিবের কাছে হাতি পোষার অক্ষম স্বপ্ন দেখা অলীক কল্পনারই সামিল। তিনকড়িবাবুরও তাই হল। অবশেষে তিনি লিখিতভাবে হাতির মালিকানা থেকে রেহাই নিয়ে দুশ্চিন্তা মুক্ত হলেন। বিচিত্র ধরনের অসংখ্য চরিত্রের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একাঙ্কটিতে রসঘন কৌতুক, নাটকীয় উৎকণ্ঠা এতটুকু ব্যাহত হয়নি।

বোমা : প্রথম প্রকাশ শারদীয়া 'দীপালী'তে (১৩৬৫)। 'বাঘা ওলে বুনো তেঁতুল' নাটিকার কিছু অংশ এই নাটিকাটির সঙ্গে সংযোজিত করা হয়। এটি নাট্যকারের একটি অসামান্য সৃষ্টি। বোবা স্ত্রীর মুখে কথা ফুটলে পুরুষকে যে কী বিড়ম্বনাকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয় এ নাটকের ঘটনাচক্রের মধ্যে দিয়ে তাই-ই প্রতিফলিত হয়েছে।

সাবধান : প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষ (১৩৬৫ কার্তিক) পত্রিকায়। সমাজ যখন ভাঙনের মুখে তখন তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কাহিনী এর উপজীব্য। 'চোর সাবধান' বুলি শিখে একটি পোষা ময়না কিভাবে চক্রান্তকারিদের জব্দ করবে সেই কাহিনী নিয়েই এ নাটক।

শেষ সংবাদ : প্রথম প্রকাশ শারদীয়া 'লোকসেবক'-এ (১৩৬৫)। চরিত্র সংখ্যা ছয়--পুরুষ ৫, নারী ১। এক ধনাঢ্য চিরকুমার নেতার মৃত্যুকালে তার সম্পত্তির লোভে লুব্ধ মানুষগুলোর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। চিরকুমার ধনপতি বসু মৃত্যু শয্যায়। আসন্ন মৃত্যু সংবাদে ভাইপো, ভাগ্নে, এ্যাটর্নী, ডাক্তার সবাই উপস্থিত। তিনি এখনও কোন উইল করেন নি। ফলে সবাই বিচলিত কে পাবে এই অগাধ সম্পত্তি।

একটি পাপ : প্রথম প্রকাশ 'বনফুল' অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (১৩৬৫)। চরিত্র সংখ্যা তিন--পুরুষ ১, নারী ২। একটি মেয়ের সিগারেট খাওয়ার গোপন অভ্যেসকে কেন্দ্র করে তার নববিবাহিত জীবনে যে দুর্যোগ নেমে এসেছিল, শ্বশুর গৃহে যে অবিশ্বাস আর সংশয় দেখা দিয়েছিল সেই কাহিনী ও পরিণতিতে সব সন্দেহের অবসান ও মধুর মিলন এই একাঙ্কটির উপজীব্য।

মানুষের কামড়ে : প্রথম প্রকাশ শারদীয়া 'ষষ্টিমধু'তে (১৩৬৬)। হালকা হাসির নাটক। সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদকের আর্থিক দুর্গতির একটি সরস অথচ করুণ চিত্র এখানে এঁকেছেন নাট্যকার।

অ-মৃত : প্রথম প্রকাশ 'মধুরাংশচ' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৭)। চরিত্র সংখ্যা চার—পুরুষ ২, নারী ২। পাশাপাশি বাড়ির দুটি ছেলে ও মেয়ে আলো ও ছায়ার মধ্যে গভীর প্রণয়। দুজনে বিবাহ করতে চায় কিন্তু মেয়েটির বাবা জাঁদরেল পুলিশ অফিসার আপত্তি তোলেন। কারণ তিনি দুর্নীতি দমন বিভাগে কাজ করার সূত্রে জানতে পারেন যে, ছেলেটির বাবা ভেজাল ওষুধের কারবার করেন। তাকে ধরাতে পারলে তার প্রমোশন আটকায় কে! তাই পাশাপাশি দুটি বাড়ির এতদিনের আলাপ পরিণত হল ঝগড়া ও কলহে। এই অবস্থায় বিবাহ অসম্ভব জেনে ছেলেটি তার বাবার কারখানা থেকে পটাশিয়াম সায়নাইড এনে দুজনে মিলে খেয়েও যখন মরল না, তখন ছেলেটির বাবা দুজনকে রেজিষ্ট্রি অফিসে গিয়ে বিবাহ করে আসতে বললেন এবং অনুরোধ করলেন ভেজাল পটাশিয়াম সায়নাইডের কথা যেন কেউ জানতে না পারে।

এক দুই তিন : প্রথম প্রকাশ 'শনিবারের চিঠি' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৬)। চরিত্র সংখ্যা তিন—পুরুষ ২, নারী ১। মিলিটারী অফিসার তার সদ্য পরিণীতা স্ত্রী মেঘনাকে নিয়ে নির্জন বাসভবনে এলেন। সেখানে নির্জনতায় কুকুরের ডাক, ক্যাপটেন সেন এর বিচিত্র আচার-আচরণ, দুবারের বেশি কারো অপরাধ ক্ষমা না করা, তৃতীয়বার গুলি ছোঁড়া—এসব বিচলিত করে তোলে মেঘনাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সমস্তই ফাঁকা আওয়াজ, যা নবপরিণীতা স্ত্রী মেঘনা জানতো না। জানতো সে বাড়ির ভৃত্যটি। নাটকীয় চমকে এ নাটকের পরিণতি ঘটেছে। ক্যাপটেন সেন চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে তৎকালীন মিলিটারী ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে।

মেলাও এবার হাত : 'বাণীরূপা' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৭) প্রথম প্রকাশ। 'আও মেরি জান' নামে এটি (১৩৭৩) অন্যত্র পুনর্মুদ্রিত হয়। পার্কে বয়স্ক মানুষদের সান্ধ্য আসরের একটি নক্সা আমাদের উপহার দিয়েছেন নাট্যকার। স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন মুদ্রাদোষ, সংলাপের সরস ব্যবহারে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন।

স্ট্যাচু : 'ভারতবর্ষ' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৭) প্রথম প্রকাশিত হয়। চরিত্র সংখ্যা তিন—পুরুষ ২, নারী ১। একাঙ্কটিতে তথাকথিত সদাশয় দেশনেতার আসল স্বরূপ তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে প্রতিভাসিত হয়েছে। শ্বেতপাথরের বেদীর ওপরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এক বিখ্যাত দেশনেতার মর্মর মূর্তি, লোকে যাঁকে সত্যাশ্রয়ী, নির্ভীক ও জিতেন্দ্রিয় কর্মযোগী, পরদুঃখকাতর দানবীর বলে জানে। মিথ্যার মুখোশ পরে দুনিয়ার সবাইকে ফাঁকি দিলেও নিজেকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি। গভীর রাতে সেই স্ট্যাচুর সামনে হাজির হয় এক নারী মূর্তি। সেই বিখ্যাত দেশনেতাটির স্ত্রী, সে তার স্বামীর সম্পর্কে সব জানে। সে লাথি মেরে ভাঙতে চায় স্ট্যাচুটি। পারে না। কারণ যতদিন সমাজে মিথ্যা আর মেকি থাকবে ততদিন পারবে না। কিন্তু এক যুবক যেদিন সত্য ঘটনা

জানতে পারল সেদিন সে স্ট্যাচুটি ধ্বংস করল। অদ্ভুত নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অবলীলাক্রমে নাট্যকার বলতে পেরেছেন—'সমাজ জীবনের ভিত্তিই হয়ে দাঁড়িয়েছে মিথ্যাচার—পেটে ক্ষুধা নিয়েও মুখে রেখেছি লজ্জা। কপালে করাঘাত করে বলছি এ দুঃখ দারিদ্র্য অদৃষ্টের দোষ।'

কুকুর বেড়াল : প্রথম প্রকাশ 'নতুন খবর' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৭)। পরবর্তীকালে 'চিত্রাঙ্গদা' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৭৬) 'দাম্পত্য' নামে পুনর্মুদ্রিত হয়। চরিত্র সংখ্যা তিন—পুরুষ ২, নারী ১। ব্যঙ্গ মধুর প্রহসন। স্বামীর কুকুর প্রীতি ও স্ত্রীর বিড়াল প্রীতিকে কেন্দ্র করে কলহ। কলহের পরিণতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ হবার উপক্রম পর্যন্ত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উকিলের মধ্যস্থতায় মধুর মিলনে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

গৃহরাজ্য : প্রথম প্রকাশ 'নববঙ্গ' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৭)। এই একাঙ্কটিরই সংক্ষিপ্ত রূপ 'দীপালী' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৬) 'মিলিটারী' নামে প্রকাশিত হয় এবং শারদীয়া 'রূপাঞ্জলি'তে নাট্যকার এই একাঙ্কেরই সংক্ষিপ্ত রূপ নক্সা নাট্য রূপে 'ন্যুডইজম' নাম দিয়ে (১৯৬৬) প্রকাশ করেন। চরিত্র সংখ্যা আট—পুরুষ ৬, নারী ২। পারিবারিক পরিবেশে কৌতুক স্নিগ্ধ সরসতায় তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

হেড অফিসে গোলমাল : প্রথম প্রকাশ 'নববঙ্গ' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৮)। চরিত্র দুটি—জেলর ও ফাঁসির আসামী। স্বাধীনতার পর দেশে কালোবাজারী আর ভেজালের রমরমা কারবার। অর্থনৈতিক শোষণে সমাজে অসাম্য বাড়ছে, ধনী আরো ধনী হচ্ছে। গরীব আরো গরীব। সমাজের অসম ব্যবস্থার প্রতি নাট্যকারের তীব্র ক্ষোভ গোপন থাকেনি।

সত্যমেব জয়তে : শারদীয়া 'উত্তরা'-য় প্রথম প্রকাশিত হয় (১৩৬৮)। চরিত্র সংখ্যা সাত। নারী বর্জিত একাঙ্ক। এযুগে সমাজের চোখে যারা সাধুসজ্জন বলে পরিচিত তারা আসলে ভণ্ড—ভালোত্বের মুখোশ পরে বেড়ায়। একমাত্র শয়তানই প্রকৃত সত্যাশ্রয়ী, কেন না সে মনে এবং মুখে এক।

বীক্ষণ : প্রথম প্রকাশ শারদীয়া সংহতি-তে (১৩৬৮)। চরিত্র সংখ্যা দুই। নারী বর্জিত। মনের ভাষা পড়ার যন্ত্র যদি আবিষ্কৃত হয় তাহলে বোঝা যাবে মুখে সহৃদয়তার ভাব দেখালেও আসলে পরশ্রীকাতর মানুষের সংখ্যাই বেশি। মন মুখ এক—এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম।

একটিন বার্নিশ : প্রথম প্রকাশ শারদীয়া 'শনিবারের চিঠি' (১৩৬৮)। শয়তানের সিন্দুক

থেকে এক টিন বার্নিশ চুরি গেছে। এমন হাতে গিয়ে তা পড়েছে যাতে সমস্যা সব চাপা পড়ে যায়। সব সমস্যার গায়েই লাগানো হচ্ছে উন্নয়নের বার্নিশ। ব্যঙ্গের চাবুকে আধুনিক সমাজ ও শাসন ব্যবস্থাকে কশাঘাত করেছেন নাট্যকার।

দাওয়াই : প্রথম প্রকাশ 'বলাকা' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৮)। দুটি হৃদয়ের চাওয়া পাওয়াকে কেন্দ্র করে এর নাট্য কাহিনী গড়ে উঠেছে। নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতের শেষে মধুর মিলনে নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে।

শ্রেষ্ঠ শাশুড়ী পুরস্কার প্রতিযোগিতা : প্রথম প্রকাশ 'ভারতবর্ষ' আশ্বিন সংখ্যায় (১৩৬৯)। চরিত্র সংখ্যা পাঁচ—পুরুষ ৩, নারী ২। মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের বউ-শাশুড়ী দ্বন্দ্বের চিরন্তন সমস্যার সুন্দর চিত্রায়ন। অনাবিল হাসির ফল্গুধারায় একাঙ্কটি মধুর। আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে বেতার নাটক হিসেবে এটি সাফল্যের সঙ্গে বেশ অনেকবার প্রচারিত হয়েছে।

একটি রাজকীয় মৃত্যু : প্রথম প্রকাশ 'স্বাধীনতা' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৯)। চরিত্র সংখ্যা সাত—পুরুষ ৬, নারী ১। দেশের রাজা অদ্ভুত এক শূল বেদনায় আক্রান্ত। তার মনের গোপন অবৈধ বৃত্তিগুলি তাকে ঐ ব্যথায় পীড়িত করে, কিন্তু যেই তিনি আপন মনের কামনা বাসনাকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন তখন তার যন্ত্রণার উপশম ঘটে। শেষ পর্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রী পরিষদ রানীর পরামর্শে তার মর্যাদা বজায় রাখার জন্য ও রানীর সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য বিষ প্রয়োগে রাজাকে হত্যা করে। শ্লেষাত্মক ভঙ্গীতে রচিত এই একাঙ্কটি মানবীয় আবেদনে সমৃদ্ধ।

মুখোশ : 'বেতার জগৎ' শারদীয়া সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় (১৩৬৯)। চরিত্র সংখ্যা আট—পুরুষ ৬, নারী ২। সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের প্রকৃত রূপের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে এই একাঙ্কটিতে। প্রত্যেকের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছে নিস্পৃহ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে। পতিতা রমণী সমাজের চোখে অসতী হলেও মহত্ত্বে যে সে অনেক গন্যমান্যদের চেয়ে অনেক ওপর তলার মানুষ এটি ঘটনাচক্রে প্রমাণিত হয়ে যায়। শেষে দেখি তার উপার্জিত অর্থের লোভে তাকে ঘিরে ধরেছে সমাজের মান্য ধর্মাত্মা বলে পরিচিত মানুষের দল। তাদের নীচ লোভী স্বার্থপর মনুষ্যত্ববোধ বর্জিত চরিত্রের স্বরূপ এ একাঙ্কে সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত।

এই হয়েছে আইন : প্রথম প্রকাশ 'দামোদর' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৯)। প্রশাসনিক অসঙ্গতিকে তুলে ধরা হয়েছে। হবুচন্দ্র রাজা তীর্থ ভ্রমণ থেকে পাঁচ বছর পর ফিরে এসে দেখেন রাজ্য শুদ্ধ প্রজারা হাসছে। তারা সুখে আছে ভেবে রাজা খুশি হয়।

পরদিন একজন প্রজা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। চুরির কারণ জিজ্ঞেস করলে সে হাসিমুখে জানায় যে রাজ্যের সমস্ত মানুষ আজ ক্ষুধার্ত। গবু মন্ত্রীর অন্যায় শাসন ও শোষণে দেশে তৈরি হয়েছে দুর্ভিক্ষ। গবু মন্ত্রীই আদেশ দেয়--প্রতিটি প্রজা যা করবে হেসে হেসে করবে--নয়ত শূলে দেওয়া হবে। তাই প্রজারা হেসে হেসে বিদ্রোহ করছে ও ঘোষণা করছে গবু মন্ত্রী নিপাত যাক। দীর্ঘকাল শোষিত হতে হতে নিরীহ প্রজারা বিদ্রোহের ধ্বজা তোলে এবং শাসক শ্রেণীর অনিবার্য পতন ঘটে।

স্বর্গের সিঁড়ি : প্রথম প্রকাশ 'আনন্দধারা' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬৯)। চরিত্র সংখ্যা পাঁচ। নারী বর্জিত। নাটকের ঘটনাস্থল পুরীর সমুদ্রতীর। ইন্দ্র বিশ্বকর্মাকে অনুরোধ করেন যে অমরাবতীতে তিনি যেন এমন এক মন্দির নির্মাণ করে দেন যার অপরূপত্ব জগন্নাথদেবের মন্দিরের সৌন্দর্যকেও হার মানাবে। বিশ্বকর্মা জানালেন মর্তের মানুষের সাহায্য ছাড়া সে কাজ সম্ভব নয়। মানুষই পারে তার সীমিত আয়ুষ্কালের মধ্যে বিরাট সৃষ্টির রহস্য ও যাদু আয়ত্ত করতে। কারণ ক্ষণস্থায়ী জীবনের স্বল্প পরিসরের মধ্যেই তাকে রূপে রসে গন্ধে শতদলে বিকশিত হয়ে উঠতে হয়। সুতরাং মানুষের সাহায্যে স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি করে তবেই মন্দির বানানো যাবে। স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি হলে স্বর্গ ও মর্তের ভেদ ঘুচে যাবে, জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য ঘুচে যাবে দেখে ব্রহ্মা কৌশলে দেবকুলের মধ্যে আত্মকলহের সূচনা করলেন এবং স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি বন্ধ হল।

অলৌকিক : প্রথম প্রকাশ উত্তরা-য় (আশ্বিন ১৩৭২)। চরিত্র সংখ্যা তিন--পুরুষ ২, নারী ১। ভণ্ড দেশনেতার স্ত্রী-র চোখে ধরা পড়ে তার স্বামীর আসল স্বরূপ--কুকীর্তির কাহিনী। তাই দেশনেতা ইলেকশনের আগে তার স্ত্রীকে পাগল বানিয়ে পাঠিয়ে দিতে চান পাগলাগারদে। নাট্যকার এই একাঙ্কে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে এঁকেছেন সেই নেতার ছবি যিনি রাতের অন্ধকারে মেয়েদের নষ্ট করেন, চোরাকারবারকে মদত দেন আর মনে করেন পদ পেতে গেলে সত্যিকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করতে হবে, আর মিথ্যেকে সত্যি। এটাই নাকি রাজনৈতিক নেতা হবার মন্ত্রগুপ্তি।

ভূতশুদ্ধি : প্রথম প্রকাশ 'দামোদর' শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৭০)। চরিত্র সংখ্যা পাঁচ--পুরুষ ৪, নারী ১। নিঃস্বার্থ পরোপকারী ব্যক্তির আজ সমাজে বড় অভাব--এই মতবাদ ব্যক্ত করতে গিয়ে নাট্যকারকে বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীর দ্বারা সামান্য প্রভাবিত হতে হয়েছে। বিধবার একমাত্র পুত্র পক্ষাঘাতে জীবন্মৃত। তার পরিপূর্ণ আরোগ্যের জন্য প্রয়োজন একজন নিঃস্বার্থ পরোপকারী ব্যক্তির স্পর্শ। কাহিনী মোটামুটি জাতক অনুসারী।

কষ্টিপাথর : প্রথম প্রকাশ 'গণনাট্য' শারদীয়া সংখ্যায়। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে

নাট্যকার দেখিয়েছেন দুর্নীতিটাই পুণ্য, নীতিটাই পাপ, ব্যবসার এইটাই উদ্দেশ্য আজকের দিনে। তৎকালীন শাসক শ্রেণীর অকর্মণ্য নীতিহীনতা, মূল্যবোধের অবনমন এবং সামাজিক অবক্ষয় ও বিপর্যয় সম্পর্কে উদাসীনতাকে তীব্র আক্রমণ করা হয়েছে এই নাটকে।

শয়তান শ্রী : প্রথম প্রকাশ পূর্ববঙ্গ (১৩৭৮ এপ্রিল)। পরবর্তীকালে এটি 'শয়তানের বাচ্চা' (১৩৭৯) নামেও প্রকাশিত হয়। শয়তানের রাজা মর্ত্যে তার অনুচরকে পাঠিয়েছে মর্ত্য থেকে তিনজন শয়তানকে নিয়ে আসার জন্যে। তাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ হবে তাকে 'শয়তান শ্রী' উপাধি দেওয়া হবে। অনুচররা তিন জন শয়তানকে ধরে আনল। প্রথম ধনপতি শয়তান—কালোবাজারী, চোরাকারবারী, মুনাফাবাজ—শ্রমিকদের যে বিনাক্লেশে শোষণ করে। দ্বিতীয় যুদ্ধবাজ শয়তান—ছলে বলে কৌশলে যে দেশে বিভেদ সৃষ্টি করে ধনে সম্পদে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, আণবিক শক্তিতে দুর্ধর্ষ। এ প্রসঙ্গে ভিয়েতনামের যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন নাট্যকার। তৃতীয় জন হল কামরতি শয়তান—যিনি লেখনীর মাধ্যমে কামকলার সুড়সুড়ি দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। নাট্যকারের বক্তব্য এ নাটকে অতি তীব্র ক্ষোভের আকার নিয়েছে। আজ বাইশ বছর ধরে আমাদের দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক যুদ্ধবাজরা এমন পাপচক্র সেখানে রচনা করে রেখেছে যে দেশটা দিন দিন অবনতির দিকে এগুচ্ছে। ধনীরা ক্রমেই ধনী হচ্ছে গরিবরা হচ্ছে ক্রমশ গরিব। দেশ সুজলা সুফলা হলেও মুনাফাখোর আর কালোবাজারিরা মনুষ্য সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের কবলে ফেলেছে দেশকে। শিক্ষা, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির নামে সি. আই.এ এজেন্টে দেশ ছেয়ে ফেলেছে। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে শুরু করে গ্রামের কৃষিক্ষেত্রে এমন কি ঘরে ঘরে চলছে মানুষকে নপুংসক করার মহা অভিযান।

একাঙ্ক অর্ঘ্যে সংকলিত অনেকগুলি একাঙ্ক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জীবন নিয়ে লেখা।

বিস্মৃত তরঙ্গ : প্রথম প্রকাশিত হয় 'সপ্তর্ষি' (ষষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৩৬৯)-তে। চরিত্র সংখ্যা ১০—৩ নারী, ৭ পুরুষ। সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান নেতা ক্রুশ্চভের জীবনের একটি কোমল মুহূর্তের চিত্রায়ন এই একাঙ্কের বিষয়। অষ্ট্রিয়ার একটি হোটেলের প্রতীক্ষা কক্ষে পাঁচমিশেলি জনতা অপেক্ষমাণ সাক্ষাৎপ্রার্থী হিসেবে। মহিলা- পুরুষ প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে কথোপকথন রত। তারই মধ্যে ক্রুশ্চভ আবিষ্কার করেন তাঁর তিরিশ বছর আগের দেখা বান্ধবী তাতিয়ানাকে। শ্রমিক তাতিয়ানাকে যে একদিন ক্রুশ্চভের জীবনে প্রথম আনন্দের উৎস হয়ে এসেছিল।

মহাসাগর : প্রথম প্রকাশ সংহতি শারদীয়ায় (১৩৮৫)। চরিত্র সংখ্যা ৫—নারী ১, পুরুষ ৪। বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষদিকের ঘটনাকে অবলম্বন করে এ একাঙ্কটি রচিত

হয়েছে। কলকাতার বাদুড় বাগানের বাড়িতে রোগশয্যায় শায়িত বিদ্যাসাগর—তাঁর ৭০ বছর ৯ মাস ১৯ দিন বয়সের সময়কার এ ঘটনা। বিদ্যাসাগরের মা শ্রীমতী ভগবতী দেবীর অসাধারণ চরিত্র কথা ঘটনাক্রমে ব্যক্ত হয়েছে—যিনি "গয়না বলতে বুঝতেন আমার (বিদ্যাসাগর) স্থাপিত গ্রামের বিদ্যালয়, আর পাতি বলতে তিনি বুঝতেন আমার স্থাপিত চিকিৎসালয়।" শীতের সময় ছেলের কাছে ভগবতী দেবী কলকাতায় চিঠি লিখে গাদাগাদা লেপ চেয়ে নিয়ে গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে বলতেন, এবার আমার ছেলে আমাকে এই গয়না পাঠিয়েছে। বিদ্যাসাগরের মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নিখুঁত রূপায়ন একাঙ্কটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

মহর্ষি ভুবনমোহন : প্রথম প্রকাশ শনিবারের চিঠি আশ্বিন সংখ্যায় (১৩৬৫)। চরিত্র সংখ্যা ১১—পুরুষ ১০, নারী ১। দিনাজপুর জেলার প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি মহর্ষি ভুবনমোহনের স্মৃতিচারণ করা হয়েছে একাঙ্কটিতে। নাট্যকার সবিনয়ে ভূমিকা অংশে স্বীকার করেছেন কিছুটা কল্পনার আশ্রয় নিয়ে ও সজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি'র সাহায্য নিয়ে একাঙ্কটি লিখেছেন। ঘটনার সময়কাল ১৯১৪। দিনাজপুরে বালুবাড়ি পল্লীর দাতব্য চিকিৎসালয়ে হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা করেন অশীতিপরবৃদ্ধ মহর্ষি ভুবনমোহন। খাটো মোটা ধুতি ও একটা গামছা তিনি বস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। ভোর থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত প্রায় ২০০ রোগী দেখেন, ওষুধ দেন। পয়সা নেন না। ওষুধ যোগায় মিউনিসিপ্যালিটি ও জনসাধারণ।

নারায়ণ : প্রথম প্রকাশ ষষ্টিমধু শ্রাবণ সংখ্যায় (১৩৬৮)। চরিত্র সংখ্যা ৪ (সব পুরুষ)। এই একাঙ্কে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে পুলিন দাস ও জ্ঞান মজুমদারের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে আভাসিত হয়ে ওঠে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বৈপ্লবিক ভাবনা।

শরৎশতাব্দী : প্রথম প্রকাশ শারদীয়া স্বদেশ-এ (১৩৮২)। চরিত্রসংখ্যা ২১ (৭ নারী ১৪ পুরুষ)। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর লেখকের কল্পনায় শরৎচন্দ্র এসেছেন সূত্রধার রূপে নিজের জীবনের টুকরো টুকরো কাহিনীর মালা গাঁথতে। এটিকে নাট্যকার নিজেই বলেছেন, 'একাঙ্ক নয়, একাঙ্ক গন্ধা'। বেতার নাটক হিসেবে এটি লিখিত ও অভিনীত হয়েছিল।

বাইশে শ্রাবণ : প্রথম প্রকাশ নবকলি-তে (১৩৮১)। চরিত্র সংখ্যা ৬ পুরুষ ৩, নারী ৩। নির্মলকুমারী মহলানবীশের লেখা 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থের সাহায্য নেওয়ার কথা নাট্যকার রচনার শুরুতেই বলেছেন। এই একাঙ্কটিতে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের ক'টি দিনের কথা ঘটনার সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে।

এদেশে লেনিন : ১৩৯৩-তে লেখা নাট্যকারের শেষ নাটক। ১৯২১ সালে ফণীভূষণ ঘোষের লেখা লেনিনের জীবনী গ্রন্থ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে নাট্যকার এই একাঙ্কটি লেখেন। বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের শোষিত সমাজে লেনিনের মতবাদের উপযোগিতার অপূর্ব বিশ্লেষণ নাট্যকারকে মুগ্ধ করে। বৃটিশ শাসনকালে পরাধীন ভারতের একজন নাগরিক ফণীভূষণ ভারতের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনে লেনিনের মহান শিক্ষার উপযোগিতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। তাই ফণীভূষণকে কেন্দ্র করে রচনা করেন একাঙ্কটি। লেনিন-এর জীবনীগ্রন্থ রচনার ইতিহাসই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সতীর্থ সঙ্গমের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা গোর্কি সদনে এটি অভিনীত হয়।

বয়স্কদের জন্য নাট্য রচনার ফাঁকে মননশীল সমাজ সচেতন এই নাট্যকার ছোটদের উপযোগী নাটকও রচনা করেছেন। 'কাজলরেখা'—রূপকথার আঙ্গিকে লেখা। শিশু মনের উপযোগী করে কাহিনী নির্বাচন, চরিত্র চিত্রণ, বক্তব্য বিষয় উপস্থাপন এবং এরই মাঝে নীতি উপদেশ পরিবেশন ভাবনা মাথায় রেখেই সুচিন্তিতভাবে ছোটদের উপযোগী নাটক সৃজনের কাজটি তাঁকে করতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর মনস্ক চিন্তার প্রতিফলন পাই ১৯৬৪ সালে তৃতীয় নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনে (লক্ষ্ণৌ) দেওয়া ভাষণে। অনুকরণের প্রবৃত্তি থেকেই তো নাটকের জন্ম। শিশুদের মনে এই অনুকরণ প্রবৃত্তি সহজাত বলেই নাটকপ্রীতিও সহজাত এই বিশ্বাস থেকেই নাট্যকার তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য উপস্থাপন করতে পেরেছেন। মা ঠাকুরমার কোলে ব'সে শিশু শোনে ঘুমপাড়ানি গান, রাক্ষসের সঙ্গে রাজপুত্রের লড়াই, বেঙ্গমা বেঙ্গমির গল্প, সোনার কাঠি রূপার কাঠির অদ্ভুত সব ক্ষমতা, পক্ষিরাজ ঘোড়ার ছুটোছুটি, রাজপুত্র আর কোটালপুত্রের সাহায্যে দৈত্যের হাত থেকে বন্দিনী রাজকন্যার উদ্ধার। রূপকথার গল্পের এই কল্পলোকই শিশুমনে সৃষ্টি করে নাটক ভাবনা। শিশু আস্তে আস্তে যখন বড় হতে থাকে, পৃথিবীকে চোখ মেলে দেখতে শেখে—জীবন—জীবনের অসংখ্য অগণিত ঘটনা ধারার সাথে, বিচিত্র চরিত্রের মানুষের আচার আচরণে অভ্যস্ত হতে থাকে। ক্রমশ জীবন সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে।

শিশু দেখে প্রকৃতির বিচিত্র লীলাখেলা—মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা, ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডব। নদী, পাহাড় অন্তহীন সমুদ্রের পর্বত প্রমাণ ঢেউ। যত বড় হতে থাকে ক্রমশ চিনে নেয় ভালো মানুষ—মন্দ মানুষকে। সেই শিশুমনেই সে বুঝে নেয় ভালো মন্দের দ্বন্দ্ব চলছে অবিরাম সব জায়গায়, সবখানে। মা, বাবা, শিক্ষক শিক্ষিকা, বড়দের শিক্ষায় শিশু কিশোর ক্রমে বুঝে নিতে শেখে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ। ভালোর প্রতি অনুরাগ, মন্দের প্রতি ঘৃণা করতে সে শেখে। নাট্যকার মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন শৈশব আর কৈশোরের এই শিক্ষাই ব্যক্তি মানসকে প্রভাবিত করে সারাজীবন। আর নাটকের মাধ্যমেই এই শিক্ষা হয় সহজতর।

এই ব্যাপারে শিশু নাটক রচয়িতাদেরও আছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মন্মথ মনে করেন নাটকের মাধ্যমে শিশু ও কিশোরকে গড়ে তোলার দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত, নাটকের বিষয় নির্বাচনে তাদের তীক্ষ্ণ সতর্ক হতে হয়। কারণ প্রত্যেক দায়বদ্ধ নাট্যকারই চান দেশের শিশুরা—ভবিষ্যৎ নাগরিকরা হয়ে উঠুক সৎ এবং সার্থক নাগরিক—সার্থক মানুষ, আন্তরিক দেশপ্রেমিক। জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার যোগ্যতাসম্পন্ন। এইদিকে লক্ষ্য রেখেই শিশু নাটকের বিষয় নির্বাচন করতে হবে, এটাই তাঁর বিশ্বাস। মন্মথ মনে করেন রূপকথার নাটক দিয়ে শুরু হয় শিক্ষার এই অভিযান। এবং ক্রমশ শিশু মনে জাগতে থাকে কল্পনার দ্বিতীয় পৃথিবী। আস্তে আস্তে সেই পৃথিবী রূপান্তরিত হয় আমাদের পৃথিবীর বাস্তবজীবনে। নাট্যকার এর পাশাপাশি বিশ্বাস করেন শিশু ও কিশোর নাটকের বিষয়বস্তু হবে সেই সব মহাজীবন—যে সব মহাজীবন জীবনযুদ্ধে সার্থক হয়েছে, মহান হয়েছে, শৌর্যে বীর্যে, শিক্ষায় দীক্ষায়, ত্যাগে ও সেবায়। এই সব মহাজীবনের বাল্য ও কৈশোর কালের কথা নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। কারণ, এই বয়সের বিশেষত্বই এই যে তারা সমবয়সী চরিত্রের কার্যকলাপে আকৃষ্ট হয় বেশি।

ছোটদের উপযোগী করে অনেকগুলি একাঙ্ক মন্মথ রচনা করেছেন—এ বিষয়ে তার উদ্ভাবনী শক্তির কোনও সীমা পরিসীমা ছিল না। তাঁর সচেতন মনন জীবন থেকে আহরণ করা চরিত্রের পাশাপাশি না-দেখা কল্পলোকের দূরের চরিত্রকেও শিশুনাটকে স্থান দিয়েছে অবলীলাক্রমে। তাই তাঁর ছোটদের জন্য নাটকগুলিতে পেয়েছি বাস্তব ও কাল্পনিক, উদ্ভট ও কিংবদন্তীমূলক নানা ধরনের কাহিনী ও চরিত্র। প্রায় সব ক্ষেত্রেই মন্মথ সফল হয়েছেন। মনোরম কাহিনীর মোড়কে অনায়াসেই তিনি ছোটদের মননে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন উপদেশ নীতিকথার মাধ্যমে শিক্ষণীয় বক্তব্য। সেই সময়ের ছোটদের জন্য লেখা জনপ্রিয় পত্রপত্রিকাগুলিতে ছাপা হয়েছে তাঁর অজস্র একাঙ্ক। শিশুসাথী, বাংলার কথা, পাঠশালা, শারদীয়া যুগান্তর, সোনার কাঠি, রংমশাল, শারদীয়া যাদুঘর, মাধুকরী, শিশুভারতী, কিশোর ভারতী-র মত ছোটদের জনপ্রিয় পত্রিকাগুলির কাছে মনন্মথ'র নাটকের চাহিদা ছিল বেশ বেশি।

ছোটদের জন্য লেখা নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

'কাজলরেখা' (বার্ষিক শিশুসাথী ১৩৩৩), সোনার কাঠির মোহন স্পর্শ (শারদীয়া বাংলার কথা ১৩৩৫), বিচার (পাঠশালা, আশ্বিন ১৩৪৪), কালার কাণ্ড (বার্ষিকী সোনার কাঠি ১৩৪৪), শ্রীমন্ত ও লক্ষ্মীমন্ত (কার্তিক পাঠশালা ১৩৪৪), চতুরে-চাতুরী (বৈশাখ পাঠশালা, ১৩৪৫), চড়ুই পাখি (শারদীয়া যুগান্তর ১৩৪৫), কাজীর বিচার (শারদীয়া রংমশাল ১৩৪৫), উচিত শিক্ষা (শারদীয়া যাদুঘর ১৩৪৫), অমূল্য মূল্য (বার্ষিকী মাধুকরী ১৩৪৫), সোনার তাল (কার্তিক পাঠশালা ১৩৪৫), পঞ্চ প্রদীপ (বার্ষিকী শিশুসাথী ১৩৬২), তিনটি মিনিট (বার্ষিকী শিশুসাথী ১৩৬৪), ছলনা (বার্ষিকী শিশুসাথী ১৩৬৩), আত্মহত্যা (শারদীয়া শিশুভারতী ১৩৬৬), একটি বোতাম (বার্ষিকী শিশুসাথী ১৩৬৮), সোনার হরিণ (শারদীয়া শিশুসাথী ১৩৬৯), স্টুপিড (শিশুভারতী

১৩৭০), অতি চালাকির গলায় দড়ি (বার্ষিকী শিশুসাথী ১৩৭২), বাংলাদেশের মেয়ে (বার্ষিকী শিশুসাথী ১৩৭৮), মিষ্টিমুখ (শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৮৯)।

"সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় এক একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত আছে। তা হোল চলমান স্রোতের গতি পরিবর্তন। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস কবিতা ছোটগল্পে যেমন এই গতি পরিবর্তনের ঐতিহাসিক মুহূর্ত আছে, তেমনি রয়েছে বাংলা নাট্য সাহিত্যেও। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী', বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' যেমন বাংলা নাট্যপ্রবাহের এক একটি বাঁক ফেরা, ঠিক তেমনি ঐতিহাসিক ব্যাপার মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক'।........তৎকালীন বহমান নাট্যস্রোতের মধ্যে আর একটি শাখা....সব চাইতে বেগবান, বিচিত্রমুখী এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত।...এ এক দুঃসাহসিক প্রয়াস। কারণ বাংলা নাট্যমঞ্চে তখন পূর্ণাঙ্গ নাটকেরই জয়ধ্বনি।......ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে মন্মথ রায় একাঙ্ক নাটকে মনস্ক।" (রতনকুমার ঘোষ / মধুপর্ণী ভাদ্র ১৩৮২ / মন্মথ রায় সংখ্যা)।

পেশাদার বাংলা রঙ্গমঞ্চের তাৎপর্যময় মুহূর্তে মন্মথ'র আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯২৩-এ। সেই শুরু। তারপর দীর্ঘ ৬৪ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে ২০৪টি একাঙ্ক সৃজন করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি একজন সচেতন নাট্য গবেষকের দায়িত্বও পালন করেছেন। আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন উনিশ থেকে বিশ শতকের নাট্য-বিবর্তনের রূপরেখা, কয়েকটি যুগের রঙ্গমঞ্চ ও দর্শকদের সূক্ষ্ম মেজাজ ও ঐতিহাসিক চেহারা। সর্বত্র ইতিহাসের তথ্য যে তিনি দিয়েছেন তা নয়, কিন্তু প্রতিটি নাটকের উপাদানে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ইতিহাস—কয়েক দশকের সামাজিক, মানবিক সম্পর্কের কিছু গভীর ছবি—জীবন ও সম্পর্কের কিছু জটিলতা, সামাজিক মূল্যবোধের গুরুতর রূপান্তর। বাংলা একাঙ্ককে নান্দনিক স্তরে উন্নত করে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ার মহান দায়িত্বটি মন্মথই প্রথম পালন করেছেন।পাশাপাশি বাংলা রিডিং ড্রামার দরজাটিও তিনি উন্মুক্ত করেছেন।

একাঙ্ক নাটক রচনার প্রথম দিকে (স্বাধীনতা পূর্ব) মন্মথ রায় বিষয়বস্তু ও নাট্যাঙ্গিকের ব্যাপারে কিছুটা ব্যাকরণ মেনে চলার প্রবণতা দেখালেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর জটিল দ্বান্দ্বিক বাস্তবতা তাঁকে প্রথাসিদ্ধ পথ-বর্জনের প্রেরণা যুগিয়েছে। ফলে প্রথম পর্বে রচিত একাঙ্কগুলির পৌরাণিক পরিমণ্ডল, সুতীব্র আবেগ, মানসিক অনুভূতির কাব্যিক প্রকাশ ও বাস্তবতা বর্জিত রোমাণ্টিক ভাবালুতার পরিবর্তে ক্রমশ পরবর্তী পর্যায়ের একাঙ্কগুলিতে (স্বাধীন হবার পরেও) এসেছে বিষয়বস্তুতে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ, রোমান্টিক আবেগ মুক্তির চেষ্টা, সাধারণ জীবনের সুখদুঃখ হাসিকান্নায় ভরা এক গভীর নাটকীয় অনুভব—জীবনমনস্ক উপলব্ধি। বিষয়বস্তু নির্বাচনে এ সময় থেকে তিনি কোন বাধা মানেন নি। ফলে মানব জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, বিচিত্র উপলব্ধি, অসংখ্য চরিত্র স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাঁর একাঙ্কগুলিতে অনায়াসে স্থান করে নিতে পেরেছে। তাঁর সমগ্র নাটকই দেশজ। পুরাণ, সমাজ, ইতিহাস যা থেকেই তিনি নাটকীয় উপাদান

নিয়েছেন তা একান্তভাবেই দেশীয়। রসদের জন্য তাঁকে বিদেশের দিকে তাকাতে হয়নি। নাটকের উপাদান সংগ্রহ করেছেন তিনি নানান উৎস থেকে। সচেতন শিল্পবোধ নিয়ে একাঙ্কের রূপকল্পের বৈচিত্র্য সাধনে তিনি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং বৌদ্ধযুগের অতীত ইতিহাসের কল্পিত রোমান্টিক ঘটনাকে যেমন অনায়াসে তাঁর একাঙ্ক নাটকে আত্মস্থ করেছেন তেমনি সমকালের রূঢ়বাস্তব জীবন সমস্যা, ধর্ম, মনুষ্যত্ব, নারীত্ব, সামাজিক ও আত্মিক সম্পদের নতুন মূল্যায়ন করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছে তাঁর সমাজ সচেতন ও সময় সচেতন মানসিকতা। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবক্ষয় কিভাবে মানুষের চিরন্তন মূল্যবোধকে বিনষ্ট করছে নাট্যকার তাঁর একাঙ্কের আপাত সরল বক্তব্যের আড়ালে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে শ্লেষে সেই ছবি তুলে ধরেছেন। মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিতে নারী প্রকৃতির জৈব বিশ্লেষণ, নারী পুরুষের যৌন সম্পর্কের জটিলতা, সমাজে নারীর বিচিত্র ভূমিকার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তাঁর একাঙ্কগুলির মধ্যে।

মন্মথ সব সময়ই তাঁর কালের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। তাই জাতীয় ভাবধারার যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়েও পরবর্তী সময়ের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে অস্বীকার করতে পারেননি। একজন দায়িত্বশীল নাট্যকারের মতই তাঁকে স্বকাল ও স্ব-সমাজের চাহিদার প্রতি সজাগ থেকে বদলাতে হয়েছে নিজের লক্ষ্য, দৃষ্টিকোণ ও রচনাভঙ্গিকে। এ সম্পর্কে 'সাপ্তাহিক সত্যযুগে' নারায়ণ চৌধুরীর অভিমত (২৩শে এপ্রিল ১৯৮২) তুলে দেওয়া যেতে পারে। "বিশের দশক থেকে নাট্য সাহিত্যের অনুশীলন করতে করতে তিনি চল্লিশ ও পঞ্চাশ-এর দশকে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছেন।......তাঁর সমাজতন্ত্রের আনুগত্য ততটা দৃঢ় প্রত্যয় সঞ্জাত নয়, যতটা যুগরুচির প্রভাব জনিত। আসলে পেশাদার নাট্যকারের আত্মখণ্ডনমূলক বিধিলিপি তিনি নিজের ব্যক্তিত্বে বহন করেছেন, তাই একদিকে যেমন সমাজতান্ত্রিক নাটক লিখেছেন অন্যদিকে ভক্তিমূলক পালাও লিখেছেন।" বহুক্ষেত্রেই স্থান কাল পাত্রের নিরবচ্ছিন্ন ঐক্য সমন্বিত হয়ে তাঁর একাঙ্কগুলি শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে।

নাটকের ফর্ম নিয়েও তিনি গভীর ভাবনা চিন্তা করেছেন। বিষয় ও বক্তব্য প্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি নির্দ্বিধায় পুরোনো ফর্ম ভেঙেছেন—তৈরি করে নিয়েছেন নতুন ফর্ম। তাই দেখি নাট্য সংকলনগুলিতে বিচিত্র ফর্ম ও মেজাজের একাঙ্ক। সিরিয়াস একাঙ্কের পাশাপাশি প্রহসন, ব্যঙ্গ, পোস্টার নাটিকা, নকশা, চালচিত্র, শ্রুতিনাটক—এমনকি বাংলার অতীত দিনের পেশাদার মঞ্চের 'কার্টেন রেইজার'-ও। এটা খুবই বিস্ময়ের বিষয় যে আধুনিক যুগের (৬-এর দশক থেকে ৮-এর দশক) একাঙ্কের সৃজন ও প্রয়োগ পদ্ধতির নতুনত্ব, বিষয় বৈচিত্র্যের অভিনবত্বের যে চমক নিয়ে আমরা গর্ব করি তার বেশির ভাগ অংশই প্রায় চল্লিশ বছর আগে মন্মথর অধিগত ছিল। আসলে পরীক্ষা নিরীক্ষায় তিনি অভ্যস্ত করে তুলেছিলেন নিজেকে নাটক রচনার সূচনা মুহূর্ত থেকেই। সব সময় সাফল্য আসেনি। ক্লান্তিকর মনে হয়েছে কখনও কখনও। কিন্তু তাঁর অনেক একাঙ্কের মধ্যেই আমরা পেয়েছি রিয়ালিস্ট রীতি, রাবীন্দ্রিক রূপক রীতি,

ইবসনের সাংকেতিক রীতি, মেয়ার হোল্ডের থিয়েট্রিকাল রীতি, ব্রেখ্টের এপিক রীতি এবং বার্নার্ড শ'র ডিসকাশন রীতি। এই চর্চার অব্যাহত গতি কিন্তু কোনও সময়ই তাঁর সৃজনের নিজস্ব মেজাজকে দুর্বোধ্য কঠিন করে তোলেনি। প্রত্যেকটি নির্মাণ তাই হয়ে উঠেছে সাহিত্য রসানুভূতিতে পরিপূর্ণ।

তাঁর উল্লেখযোগ্য একাঙ্কগুলির প্রায় প্রতিটিতেই পেয়েছি একটি নিটোল গল্প, ক্রিয়াশীল ঘটমান জীবন, তীব্র গতিবেগ, অসাধারণ চরিত্র সৃষ্টি এবং স্বল্প পরিসরে সৃষ্টি হতে দেখেছি নাটকীয় সংঘর্ষের ক্ষেত্র। প্রথম পর্বের একাঙ্কের মধ্যে এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য হল—মুক্তির ডাক, রাজপুরী, লক্ষহীরা, বিদ্যুৎপর্ণা। ইতিহাসের অস্পষ্ট ছায়াপাতে কল্পনার ওপর ভিত্তি করে রচিত এই একাঙ্কগুলিতে নাট্যিক ক্রিয়ার উচ্ছ্বাস, চকিত চমক, সংলাপের কাব্যময়তা, বর্ণময়তা আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু একাঙ্কগুলিতে সামাজিক প্রসঙ্গ সমন্বয়ের ক্ষেত্রটিকে অবাস্তব বলে মনে হয়। অনেকক্ষেত্রে তা বিশ্বাসযোগ্যতার মাত্রা স্পর্শ করতে পারে নি। পরবর্তী পর্যায়ে রচিত একাঙ্কগুলি—এক দুই তিন, উইল, পঞ্চভূত, কালিবাড়ি, উপচার, আমরা কোথায়, অর্কেষ্ট্রা, অসাধারণ, টোটোপাড়া, ফকিরের পাথর, ক্ষণস্বপ্ন, অসীমন্তিনী, কষ্টিপাথর, কোটিপতি নিরুদ্দেশ, অপরাজিতা, উল্কাপাত, সাংঘাতিক লোক, ভূমিকম্প, অনবদ্য রচনা। মাতৃত্বের ক্ষুধা ও বন্ধ্যাত্বের যন্ত্রণা মন্মথ'র একাঙ্কে বারেবারে ঘুরে ফিরে এসেছে। এই বিষয়টিকে নানাভাবে তিনি তাঁর একাঙ্কে চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন। সার্থক ছোটগল্পের নিটোল মেজাজ, সাহিত্য রসানুভূতির নিটোল তৃপ্তিতে এই একাঙ্কগুলি সমৃদ্ধ। 'নবএকাঙ্ক' সংকলনে নাট্যকার জীবনের অনেক কাছাকাছি, অনেক বেশি বাস্তবনিষ্ঠ। প্রসন্ন মাধুর্যে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের অবক্ষয়িত মূল্যবোধ, কামনা বাসনাময় স্বরূপের পরিচয় দিতে গিয়ে অনায়াসে তিনি লঘু কৌতুকের নির্মল পরিবেশ তৈরি করে ফেলেছেন—কামধেনু কবচ, বলো হরি হরি বোল তার প্রমাণ। ব্যঙ্গের তীব্রতা ও হাস্যের সরসতা দুই-ই পাঠককে আকর্ষণ করে। 'বলো হরি হরি বোল' একেবারে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনজীবিকা নির্বাহের জন্য, কোনোরকমে টিকে থাকার জন্য কঠিন সংগ্রাম—অন্ন বস্ত্র সংকটের ভয়ঙ্কর ছবি 'বিবসনা', আর 'এক দুই তিন'-এই স্যাটায়ার নাটকটিতে বাক্সর্বস্ব রাজনীতির অন্তঃসার শূন্যতাকে তীক্ষ্ণ আক্রমণ করা হয়েছে।

জীবন সম্পর্কিত বোধ, চেনাজানা স্বার্থগন্ধী বাস্তব মানুষের পরিচয়, সামাজিক অসাম্য নিস্পৃহ কাঠিন্যে 'ফকিরের পাথর' নাট্যগুচ্ছে তুলে ধরেছেন। সচেতন সমাজ-মনস্ক নাট্যকারের নতুন পরিচয় পাওয়া যায় এখানে। রোমাণ্টিকতা বর্জন করে তিনি অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক নির্মোহ বিশ্লেষকের ভূমিকা নিয়েছেন। তাই এ পর্যায়ে দেখেছি এখানে প্রাধান্য পেয়েছে আমাদের চেনাজানা মানুষ, তাঁদের সমস্যা, সামাজিক অসাম্য এবং অবশ্যই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নাট্যকারের বিবেকবান মনন। এমন কোনও বিষয় নেই যা তাঁর লেখনি স্পর্শ করেনি ; এমন কোন অনুভব নেই যাকে মন্মথ আপনার মধ্যে আত্মস্থ করে সৃজনের মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত করেননি। ধাপে ধাপে সিঁড়ি মাড়িয়ে

তিনি এগিয়েছেন অতি সতর্ক সচেতন পদক্ষেপে। ক্রমশ আবেগবর্জিত শাণিত উজ্জ্বলতায় ঘটেছে তাঁর উত্তরণ। প্রসন্নতা অনেক সময় পরিবর্তিত হয়েছে স্যাটায়ারে। বিচিত্র একাঙ্ক-র নাটকগুলি এর নিদর্শন। এই পর্বের অধিকাংশ নাটকই 'রিডিং ড্রামার' অন্তর্ভুক্ত। 'জন্মদিন', 'গোপালের মা'-তে তত্ত্বকথা বলেছেন। দুর্বোধ্য, চিত্রাঙ্গদা-য় অভিব্যক্ত মানসিক জটিলতার ছবি। পলায়ন-এ তত্ত্বধর্মিতা ও বাস্তববোধের সমন্বয় ঘটেছে। মন্মথ রায়-এর "তত্ত্ব আমাদের চিরন্তন ন্যায়বোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কোন জটিল তত্ত্ব নয়।" (কুমার রায় / এক দীঘি পদ্ম / আজকাল ১৮.৯.৮৩)

সংলাপ মন্মথ রায়ের একাঙ্কের শৈল্পিক সাফল্যের অন্যতম হাতিয়ার। চরিত্র অনুযায়ী নাটকীয় সংলাপ রচনায় ঘাত প্রতিঘাত সৃষ্টিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। পৌরাণিক পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠা একাঙ্কগুলির চরিত্ররা চিরাচরিত নিয়মরীতি ভেঙে গদ্য সংলাপে মনের ভাব ব্যক্ত করেছে। যদিও সে গদ্য প্রাত্যহিক জীবনের গদ্য নয়—আবেগ, উচ্ছ্বাস, অলংকারের আতিশয্যে রবীন্দ্র-সংলাপের সমতুল কাব্যধর্মী। ডঃ অজিত কুমার ঘোষ তাঁর 'নাটকের কথা' গ্রন্থে সংলাপ ব্যবহার সম্বন্ধে বলেছেন, "সংলাপ যেখানে শুধু চরিত্রের মুখের কথা নয়, সমগ্র সত্তার অভিব্যক্তি হয়, সেখানে সংলাপ সার্থক। আর সংলাপ যেখানে শুধু কেবল ভাষায় অহেতুক আড়ম্বর মাত্র, স্থান কাল পাত্রের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সেখানে তা চরিত্রকে কলের পুতুল করে মাত্র, সজীব মানুষে পরিণত করতে পারে না।" মন্মথ রায়ের এ সত্যটি অবগত ছিল, তাই এ ব্যাপারে তীক্ষ্ণ সচেতন থেকে তাঁকে নাটকীয় চরিত্র গড়ে তুলতে হয়েছে। বস্তুতান্ত্রিক জগতের অসংখ্য ভাব ও ভাবনার মধ্যে মানুষের চলমান জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলির বর্হিপ্রকাশের মাধ্যমে, একদিকে তিনি যেমন সুস্থ সবল চরিত্র সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি হতাশা অবক্ষয়ের রূপটিও তুলে ধরে জাতিকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। নাট্যকার হিসেবে তাঁর যে একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে, ভূমিকা আছে একথা তিনি কোনো দিনই ভুলতে চাননি। নাটক যে শুধু চিত্ত বিনোদনের উপকরণ নয়—অন্যায়, অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার সেকথা তিনি শুধু নানা সভা সমিতির ভাষণে বলেই ক্ষান্ত হননি, নিজের অসংখ্য নাটকের মাধ্যমেও তিনি সেই হাতিয়ারকে ব্যবহার করেছেন। তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বস্তুর পাশাপাশি, তুচ্ছ বিষয়বস্তু, স্বল্পঘটনা এবং সংবাদপত্রের চমকপ্রদ সংবাদের ওপর ভিত্তি করেও তিনি লিখেছেন বহু একাঙ্ক। সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত একাঙ্কগুলি দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল—মানব চরিত্র চিত্রণে ও নতুন জীবনবোধের মন্ত্র উচ্চারণে সমাজের এই কুৎসিত কালিমা মুছে দেবার জন্য নাট্যকারের প্রতিবাদী বক্তব্যে এবং পরিশেষে সমস্ত বেদনা, সমস্যা ও গ্লানির উর্দ্ধে এক মঙ্গলময় অনাগত উজ্জ্বল দিনের সম্ভাবনার আভাস দানে। সব সময় দেখা গেছে দেশের ও জাতির উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজেরও আত্মিক উত্থান পতন ঘটেছে। ভাবগত এই সাযুজ্যই মন্মথ'র নাটকের বৈশিষ্ট্য। তাই জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নাট্যকার যুগের প্রবহমান চিন্তা, সমাজতন্ত্রের আহ্বান কিংবা সাম্যবাদের আদর্শকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। নিজের মাতৃভূমি ছিল তাঁর একমাত্র

আবেগ। সেই আবেগকে তিনি সর্বদাই সঞ্চারিত করে দিয়েছেন তাঁর সৃজনে।

মন্মথ রায়ের জীবন ও সমাজ সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতালব্ধ ও রসসমৃদ্ধ একাঙ্কগুলির মধ্যে (উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছাড়া) যে নেতিবাচক দিকটি আমাদের চোখে পড়েছে তা হল তাঁর একাঙ্কগুলি সুতীব্র দ্বন্দ্ব ও গতি-র ওপর নির্ভরশীল। ঘটনা বিন্যাসের শিথিলতা কখনও কখনও (প্রথম পর্যায়ের একাঙ্কে) অতি নাটকীয় পরিমণ্ডল তৈরি করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের একাঙ্কগুলি ব্যঙ্গে স্যাটায়ারে তীক্ষ্ণ চাবুক হলেও সর্বক্ষেত্রে গভীর জীবন অনুধ্যায়ী হয় নি। দেশের ব্যাপকতম মানুষের (শ্রমিক ও কৃষক) জীবনচর্যার নিখুঁত ছবি তাঁর একাঙ্কে পাই নি। অথচ বেশ কিছু একাঙ্কে সামাজিক অর্থনৈতিক ও জনজীবনের দুঃসহ দুর্গতির ছবি আঁকলেও অর্থনৈতিক শোষণ ও বন্ধনের মূল কারণ তিনি উল্লেখ করেন নি। অবহেলিত শ্রমজীবী চরিত্রকে বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর একাঙ্কে পেয়েছি ঠিকই কিন্তু কোথাও তাদের প্রতিবাদী ভূমিকায় মূল নাট্যদ্বন্দ্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখা যায় নি। মনে হয় তখনও পর্যন্ত মন্মথ একজন উদারবাদী লেখক হিসেবে গোটা সমাজের চেহারাটাকে যেমন দেখেছেন তেমনই তুলে ধরেছেন। সর্বহারা মানুষের সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের ভিত্তিতে বিচার করেন নি। তাঁর একাঙ্ক আগাগোড়া জাতীয় ভাবধারায় সিক্ত। যে বিশ্ববোধ রবীন্দ্র সাহিত্যের সম্পদ সে বিশ্ববোধ মন্মথ রায়ের মধ্যে পাই না। তাঁর নাটকে জাতীয়তা থাকলেও আন্তর্জাতিকতা ছিল না।

যখন মন্মথ শৈল্পিক একাঙ্ক রচনায় মন দিয়েছিলেন তখন বাংলা নাট্যমঞ্চে একাঙ্ক নাটকের সমাদর ছিল না--আমন্ত্রণও না। মঞ্চ ও প্রকাশক উভয়ের কাছেই। তিনিই প্রথম লঘু কৌতুককর বিষয় পরিহার করে অন্তরাশ্রয়ী মানবিক আবেদনে ভাস্বর করে তুলেছেন একাঙ্ককে। আটপৌরে জীবনের অতি তুচ্ছ এক একটি মুহূর্তকে মানবিক রসে আপ্লুত করে একাঙ্কের আধারে উপহার দিয়েছেন পাঠককে। সে নির্মাণ শৈলীতে প্রচ্ছন্নভাবে পরিস্ফুট হয়েছে মন্মথ'র রোমান্টিক প্রকৃতি--যা পাঠককে যুক্তি বুদ্ধি বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের বদলে নিয়ে গেছে এক অন্য উপলব্ধির জগতে--যেখানে সমাজ ঘটনা ও মানুষকে বারে বারে নতুন নতুন করে আবিষ্কারের আনন্দে মুগ্ধ হতে হয়েছে। এইখানেই তাঁর জয়। এইখানেই নাট্যকার হিসেবে তাঁর সার্থকতা।

শতবর্ষ অতিক্রম করা নাট্যকার মন্মথ'র কাছে বাংলা নাট্যসাহিত্যের পরমপ্রাপ্তি এখানেই যে তাঁর বেশির ভাগ একাঙ্কই জীবনের কথা, আশার কথা, আলোর কথা বলেছে। অন্ধকার, দুঃখ, পরাজয়ের কঠিন বাধা অতিক্রম করে--নেতিবাচক নৈরাশ্য থেকে ক্রমশই ইতিবাচক প্রাপ্তির পথ দেখিয়েছে। যে জীবন অকুতোভয়--ক্রম উত্তরণে অঙ্গীকারবদ্ধ--তাকে আলোক বর্তিকার মত সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। জীবন সম্পর্কে মন্মথর এই যে গভীর অনুভব যা চিরায়ত সত্যের অনুগামী, তা নানান স্বাদের একাঙ্ক সৃজনের মধ্যে দিয়ে আভাসিত হয়ে উঠেছে দীর্ঘ ছয় দশক ধরে।

মন্মথ রায়ের একাঙ্ক সারনী

[প্রথম বন্ধনীর মধ্যে সাময়িক পত্রিকার কোন সংখ্যা এবং পত্রিকার নাম। তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে একাঙ্কটির পরিবর্তিত নাম ও প্রকাশ কাল দেওয়া হল। লোকরঞ্জন শাখায় অভিনীত নৃত্যগীত বহুল তিনটি নাটিকা (মানভঞ্জন, সাতভাই চম্পা, যক্ষ এবং রেকর্ডপালা কাফনচোরা) এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হল না।]

১৩৩১ মুক্তির ডাক (জ্যৈষ্ঠ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স / মন্মথ রায়ের প্রথম নাট্যগ্রন্থ)

১৩৩২ রাজপুরী (শ্রাবণ, ভারতবর্ষ)
মাধুরী (আশ্বিন, সবুজপত্র)
যজ্ঞফল (অগ্রহায়ন, সবুজপত্র)
রথচক্র (মাঘ, ভারতবর্ষ)
কালরাত্রি (ফাল্গুন, ভারতবর্ষ)

১৩৩৩ লক্ষহীরা (আষাঢ়, ভারতবর্ষ)
অরূপরতন (কার্তিক, ভারতবর্ষ)
অজগরমনি (ফাল্গুন, কল্লোল)
কাজলরেখা (বার্ষিক, শিশুসাথী)
স্মৃতির ছায়া [ভূত, ১৩৬৫ : স্মৃতির ছাপ, ১৩৭৭] (বাসন্তিকা)

১৩৩৪ বিদ্যুৎপর্ণা (আষাঢ়, ভারতবর্ষ)
চরকা (আশ্বিন, কল্লোল)
উইল (আশ্বিন, ভারতবর্ষ)
হারিকেন (কার্তিক, বিচিত্রা)
বহুরূপী (কার্তিক, ভারতবর্ষ)

১৩৩৫ ভারতী (বৈশাখ, ভারতবর্ষ)
প্রায়শ্চিত্ত (দেশবন্ধু স্মৃতি বার্ষিকী, আত্মশক্তি)
মা (ভাদ্র, ধূপছায়া)
সোনারকাঠির মোহন স্পর্শ (শারদীয়া বাংলার কথা)
উপচার (শারদীয়া আত্মশক্তি)
বিবাহ (কার্তিক, ভারতবর্ষ)
মাতৃমূর্তি (কার্তিক, কল্লোল)

১৩৩৬ সবিতা (আষাঢ়, বেনু)

১৩৩৭ স্বর্গমর্ত (পৌষ নাচঘর, বড়দিনসংখ্যা)

১৩৩৮ পঞ্চভূত (একাংকিকা)

১৩৩৯ অপরাজিতা (আশ্বিন, পূর্বাশা)
ইলা [প্রিয়তম, ১৩৭২] (শারদীয়া, স্বদেশ)
টিয়া (কার্তিক, উত্তরা)

১৩৪০ (আম্রমঞ্জরী (৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নবশক্তি)
ডিনামাইট (আষাঢ়, স্বদেশ)
বসুন্ধরা (মাঘ, পূর্বাশা)

১৩৪১ কবিপ্রিয়া (শারদীয়া, দীপালি)
ঘুমের ঘোরে (শারদীয়া, আনন্দবাজার)
মাধবীলতা (দোল সংখ্যা, আনন্দবাজার)

১৩৪২ সোমেশ সরকার [সাংঘাতিক লোক ১৩৭৪] (শারদীয়া, দীপালি)
শেষ রাত্রি (শারদীয়া, নাগরিক)

১৩৪৩ কলংকীচাঁদ (শারদীয়া, অগ্রগতি)
বাঞ্ছা কল্পতরু (শারদীয়া, আনন্দবাজার)
তৃতীয়পক্ষ (শারদীয়া, স্বদেশ)

১৩৪৪ বিচার (আশ্বিন, পাঠশালা)
নাট্যকারের জীবননাট্য [সাংঘাতিক নাটক, যষ্টিমধু] (শারদীয়া, দীপালি)
কালার কাণ্ড (বার্ষিকী সোনারকাঠি)
মমতার মৃত্যু (বার্ষিকী, রূপশ্রী)
শ্রীমন্ত ও লক্ষ্মীকান্ত (কার্তিক, পাঠশালা)

১৩৪৫ চতুরে চাতুরী (বৈশাখ, পাঠশালা)
চড়ুই পাখী (শারদীয়া, যুগান্তর)
Kiss Cure (শারদীয়া, স্বদেশ)
ওয়াইল্ড ক্লাব (শারদীয়া, খেয়ালী)
কাজীর বিচার (শারদীয়া, রং মশাল)

উচিত শিক্ষা [যেমন কুকুর তেমনি মুগুর, মাঘ মৌচাক—১৩৪৮]
(শারদীয়া যাদুঘর)
অমূল্য মূল্য (বার্ষিকী, মাধুকরী)
উদ্ধার (শারদীয়া, শ্রীহর্ষ)
সোনার তাল (কার্তিক, পাঠশালা)

১৩৪৬ মুশকিল আসান (বৈশাখ, ভাণ্ডার)
বিপদ দেখুন (১৪ই শ্রাবণ, মাতৃভূমি)
বানগড়ে একরাত্রি (শারদীয়া, মধুচক্র)
ভূভারহরণ কর্পোরেশন (শারদীয়া, আনন্দবাজার)
হিমটংকার লাবন্যরস (শারদীয়া, মাতৃভূমি)
ওলটপালট (শারদীয়া, মাসিক শেয়ার মার্কেট, রিপোর্ট সংখ্যা)
লীলা নাগিনী (শারদীয়া, স্বদেশ)
অভিসার [যম, ১৩৬৮] (শারদীয়া, সংহতি)
প্রিয়বন্ধু (পঞ্চম সংখ্যা, রূপসী)
কালীবাড়ী (শারদীয়া, উত্তরা)

১৩৪৮ চতুরাননের চাতুরী (শ্রাবণ, সংহতি)
আষাঢ়ে (শ্রাবণ, সংহতি)
কিসের ক্ষতি (শারদীয়া, আনন্দবাজার)
লক্ষ্মীর লক্ষণ (শারদীয়া, সংহতি এবং ১৩৬৭ উজ্জ্বল ভারত)
সাইরেন (১৪ ফেব্রুয়ারি, চিত্রা)
সাজাহান (দোল সংখ্যা, রূপমঞ্চ)
ইভাকুয়েশন (সংহতি)
ধর্মের কল [ধর্মের হাট, শাশ্বতী ১৩৬৩], (স্বদেশ)

১৩৪৯ রবি শশী তারা (দেব সাহিত্য কুটীর বার্ষিকী)
শ্রীকৃষ্ণা (শারদীয়া, প্রত্যহ)
বাটপাড়ি [মাসতুতো ভায়েরা, হোমশিখা ১৩৬২] (শারদীয়া, পরাগ)
ডাবল ফরটি নাইন [ফরটি নাইন, শারদীয়া ভগ্নদূত] (শারদীয়া, স্বদেশ)

১৩৫২ ন্যাংটো মেয়ে [বিবসনা—ফকিরের পাথর নাট্যগ্রন্থ] (শারদীয়া, ভগ্নদূত)

১৩৫৯ তৃষ্ণা (আশ্বিন, উজ্জ্বল ভারত)

১৩৬০ উল্কাপাত (বৈশাখ, ভারতবর্ষ)
ভূমিকম্প (শারদীয়া, আনন্দবাজার)
নতুনপাঠ [শিক্ষকের শিক্ষা, গৌহাটি যুবসাহিত্য সংস্থার পত্রিকায় ১৩৬৯] (শারদীয়া, ভগ্নদূত)
শ্রীশ্রীসারদামনি (ফাল্গুন, প্রবাসী)

১৩৬১ ক্ষণস্বপ্ন (শারদীয়া, মন্দিরা)
মরমকামড় (শারদীয়া, ভগ্নদূত)
যমালয়ে একবেলা [যমালয়ে একবেলা—যমালয়ে শেষবিচার—যমালয়ে ফ্যাসাদ—যমালয়ে ফ্যাসাদ—যমালয়ে পরমানন্দ (শারদীয়া ভগ্নদূত, সংহতি, খেয়া, চিত্রিতার সমন্বয়]
যা হয় না [নিভের্জাল ১৩৬৮ ভগ্নদূত শারদসংখ্যা] (শারদীয়া, রূপরঙ)
কানাই বলাই (কার্তিক, ভারতবর্ষ)

১৩৬২ অসাধারণ (জুলাই, ভগ্নদূত)
পঞ্চপ্রদীপ (বার্ষিকী, শিশুসাথী)
গো সেবা (শারদীয়া, ভগ্নদূত)

১৩৬৩ রফা (শারদীয়া যষ্টিমধু)
অর্কেষ্ট্রা (শারদীয়া, মধ্যবিত্ত)
বল হরি হরিবোল (শারদীয়া, স্বদেশ)
গভীর প্রেমের লক্ষন (শারদীয়া, জন্মভূমি)
রক্তকদম (শারদীয়া, দীপালী)
কামধেনু কবচ (শারদীয়া, স্বাধীনতা) [কোটিপতি নিরুদ্দেশ, যুগান্তর, সব পেয়েছির আসরের জন্য ১৯৫৯)
ছলনা (বার্ষিকী, শিশুসাথী)

টোটোপাড়া (১ম খণ্ড, কার্তিক, শনিবারের চিঠি)
সূর্যমুখী (স্বদেশ, পৌষ)

১৩৬৪ ফুল একবারই ফোটে (শারদীয়া, যষ্টিমধু)
অভিসারিকা (শারদীয়া, দীপালি)
তিনটি মিনিট (বার্ষিকী, শিশুসাথী)
মা যে বসতু জিহ্বায়াং (শারদীয়া, যুগান্তর)

ডাকবাংলো (শারদীয়া, স্বদেশ)
মরা হাতী লাখ টাকা (শারদীয়া, ভারতবর্ষ)
দিব্যদৃষ্টি (শারদীয়া জনসেবক)
নেতাজী আসছেন (শারদীয়া, ভগ্নদূত)
যুগল মিলন (কার্তিক, চাষ ও চাষী)

১৩৬৫ . ফকিরের পাথর (আকাশবানী কর্তৃক প্রচারিত ১৬-১০-৫৮)
বোমা [বোম্বা; বাঘা ওলে বুনো তেঁতুল](শারদীয়া, দীপালী ও যষ্টিমধুর সমন্বয়)
কানুর বাঁশী (শারদীয়া যুগান্তর)
মহর্ষি ভুবনমোহন (শারদীয়া, শনিবারের চিঠি)
শীত বসন্ত (শারদীয়া দীপালী, ১৩৬৭ চিত্রিতা)
আপনার হোটেল [পুষ্পলতা, নববঙ্গ, ১৩৭১] (শনিবারের সমীপেষু)
ঈশ্বর কোথায় (শারদীয়া উজ্জ্বল ভারত)
শেষ সংবাদ (শারদীয়া লোকসেবক)
অসীমন্তিনী (শারদীয়া, মন্দিরা)
তিনবন্ধু (কার্তিক, উল্টোরথ)
একটি পাপ (কার্তিক বনফুল)
সাবধান (কার্তিক, ভারতবর্ষ)
মানুষের কামড়ে (শারদীয়া যষ্টিমধু)
আত্মহত্যা (শারদীয়া শিশুভারতী)
বুনো মুর্গী (শারদীয়া যুগান্তর)
গোপালের মা (শারদীয়া উজ্জ্বল ভারত)
বড়বিদ্যা (শারদীয়া বিচিত্রা)
অকালবসন্ত (শারদীয়া ভগ্নদূত)
অ-মৃত (শারদীয়া মধুরাংশ্চ)
এক-দুই-তিন (শারদীয় শনিবারের চিঠি)
রকেট (শারদীয়, স্বদেশ)
শ্বেত পারাবত (শারদীয় লোকসেবক)
মিলিটারী [নুডইজম ১৩৬৬ = গৃহরাজ্য ১৩৬৭ শারদীয়া নববঙ্গ] (শারদীয়া রূপাঞ্জলি)

১৩৬৭ অমৃত (আশ্বিন, কলরব)
জন্মদিন (শারদীয় শনিবারের চিঠি)

পলায়ন (শারদীয়া, উত্তরা)
বাঘিনী গুহা [কি থেকে কি, শারদীয়া স্বদেশ ১৩৭১] (শারদীয়া লোকসেবক)
মেলাও এবার হাত [আও মেরি জান ১৩৭৩] (শারদীয়া, বানীরূপা)
স্ট্যাচু (শারদীয়া, ভারতবর্ষ)
দুর্বোধ্য (শারদীয়, মধুরাংশ্চ)
কুকুর বেড়াল [দাম্পত্য চিত্রাঙ্গদা শারদীয়া ১৩৭৬] (শারদীয়া, নতুনখবর)
চিত্রাঙ্গদা [সে আমি নই ১৩৭৪] (শারদীয়া, চিত্রাঙ্গদা)
সুনয়নী (বৈশাখ, ভারতবর্ষ)

১৩৬৮ নারায়ন (শ্রাবণ, যষ্টিমধু)
নামাবলী [রাত্রিপ্রভাত, ১৩৬৯] (শারদীয়, চৈতালি)
কে বড় (শারদীয়া, পাঠশালা)
নষ্টচন্দ্র (শারদীয়া, যুগান্তর)
একটি বোতাম (বার্ষিকী শিশুসাথী)
এক টিন বার্নিশ (শারদীয়া, শনিবারের চিঠি)
আর এক জীবন (শারদীয়া, তরুনের স্বপ্ন)
খেলা (শারদীয়া, বঙ্গঁবানী)
ভেটকি (শারদীয়া, বানীরূপা)
হারাধন (শারদীয়া, সূত্রধার)
বনমানুষ (শারদীয়া, ভারতবর্ষ)
তীর্থদর্শন (শারদীয়া, লোকসেবক)
ধৃতরাষ্ট্রের মূর্চ্ছা (শারদীয়া, যষ্টিমধু)
হেড অফিসে গোলমাল (শারদীয়া, নববঙ্গঁ)
কস্তুরী (শারদীয়া, মন্দিরা)
সত্যমেব জয়তে (শারদীয়া, উত্তরা)
বীক্ষণ [সত্য বড় ভয়ঙ্কর, শারদীয়া উজ্জ্বল ভারত ১৩৭১] (শারদীয়া সংহতি)
দাওয়াই (শারদীয়া, বলাকা)
যক্ষ (শারদীয়া, চিত্রিতা)

১৩৬৯ অমৃতস্য পুত্রা (শারদীয়া, যুগান্তর)
সোনার হরিণ (শারদীয়া, শিশুসাথী)

শ্রেষ্ঠ শাশুড়ী প্রতিযোগিতা (শারদীয়া ভারতবর্ষ)
একটি রাজকীয় মৃত্যু (শারদীয়া, স্বাধীনতা)
মুখোশ (শারদীয়া, বেতারজগৎ)
অনাদি অনন্ত (শারদীয়া, ভগ্নদূত)
এই হয়েছে আইন (শারদীয়া, দামোদর)
স্বর্গের সিঁড়ি (শারদীয়া, আনন্দধারা)
মুখ্যমন্ত্রী নিরুদ্দেশ (শারদীয়া, বুলেটিন)
মুক্তিস্নান (২৩ নভেম্বর, অমৃত)
স্বর্ণকীট (২২ নভেম্বর, আনন্দবাজার)
জওয়ান (১৪ ডিসেম্বর, অমৃত)
সমান্তরাল (বিশ্বভারতী পত্রিকা)
ভূতশুদ্ধি (শারদীয়া, দামোদর)
স্টুপিড (সংযোজনী খণ্ড, শিশুভারতী)

১৩৭১ চোখ গেল (শারদীয়া, যুগান্তর)
সামনেই স্বর্গ (শারদীয়া দামোদর)

১৩৭২ অগ্নি পরীক্ষা (শারদীয়া কিশোরী)
সদাসত্য কথা বলিবে (বার্ষিকী নীহারিকা)
আবিষ্কার (শারদীয়া, যুগান্তর)
কষ্টিপাথর (শারদীয়া গণনাট্য)
অতি চালাকির গলায় দড়ি (বার্ষিকী শিশুসাথী)
মুক্তি (শারদীয়া বেতারজগৎ)
অলৌকিক (শারদীয়া, উত্তরা)
নরখাদক (মে-জুন, সংলাপ)

১৩৭৩ চাঁদামামা (শারদীয়া যুগান্তর)
বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা (শারদীয়া যষ্টিমধু)
ধূসর স্বর্ণ [অবসন্ন কুবের, ১৩৭৩] (বর্ষসংখ্যা গৌড়দেশ)

১৩৭৪ একুশে ফেব্রুয়ারী (কম্পাস পাবলিকেশন)

১৩৭৫ আমরা মরবো না (শারদীয়া যুগান্তর)
তা তা থৈ থৈ (শারদীয়া, স্বদেশ)

১৩৭৬ চন্দ্রগ্রহণ (শারদীয়া, চিত্রিতা)

১৩৭৮ শয়তানের কসম (শারদীয়া, কিশোরভারতী)
বাংলাদেশের মেয়ে (বার্ষিকী শিশুসাথী)
কণ্ঠরোধ (শারদীয়া, নতুনপাতা)
শয়তান শ্রী [শয়তানের বাচ্চা, ১৩৭৯] (বৈশাখ পূর্ব্ববঙ্গঁ)

১৩৭৯ স্বাধীনতার ইতিহাস (নববর্ষ স্বদেশ)
মহাসাগর (জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় সংখ্যা, বাংলাদেশ)

১৩৮১ বাইশে শ্রাবণ (নবকলি)

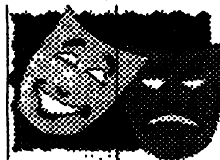
১৩৮৫ বিস্মৃত তরঙ্গ (সংহতি শারদীয়া)

১৩৮৯ মিষ্টিমুখ (শারদীয়া কিশোর ভারতী)

১৩৯২ মহাভারতের কথা (গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা, আগষ্ট-অক্টোবর সংখ্যা)

১৩৯৩ আবার কারাগার

১৩৯৪ এদেশে লেনিন



একাঙ্কের জনকত্ব : একটি বিতর্ক

১৯২৩ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত মন্মথ বাংলা একাঙ্ক নাটকের জগতে একটি বহু-উচ্চারিত, সম্মানিত নাম। ৬৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি অগণিত অজস্র একাঙ্ক সৃজন করেছেন। সংখ্যার হিসেবে ধরলে ২০৪টি একাঙ্ক। মানবজীবনের এমন কোনও ঘটনা নেই, অনুভব নেই, অভিজ্ঞতা নেই যা তাঁর বিপুল সৃজনের মধ্যে আভাসিত হয়নি। বিবিধ বিচিত্র উপলব্ধির অভিজ্ঞতাকে মন্মথ কাজে লাগিয়েছেন অত্যন্ত সচেতন পদক্ষেপে। ১৯২৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বরে স্টার রঙ্গমঞ্চে তাঁর লেখা প্রথম একাঙ্ক 'মুক্তির ডাক'-এর প্রযোজিত রূপের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার হিসেবে মন্মথর প্রথম আবির্ভাব। অনভ্যস্থ দর্শকরুচির প্রতিবন্ধকতায় সেদিন 'মুক্তির ডাক' মঞ্চে জনপ্রিয় হতে না পারলেও চমকে দিয়েছিল অনেককে। বিষয় বিন্যাসে, ভাব ব্যঞ্জনায়, স্বচ্ছ সচ্ছন্দ সরল কাব্যিক সংলাপে, চরিত্রের নাটকীয় সংঘাত সর্বোপরি আঙ্গিকের অভিনবত্বে 'মুক্তির ডাক' সেদিন বাংলার নাটক-সৃজনের ইতিহাসে একটি নবতর ধারার জন্ম দিয়েছিল। ছাপার আকারে নাটিকাটি যখন পাঠক ও নাটক-পিপাসু মানুষের হাতে পৌঁছেছিল তখন তীক্ষ্ণ তীব্র সমালোচনার পাশাপাশি প্রশংসা পাওয়া গিয়েছিল অনেক বেশি। সমবয়সী নজরুল ইসলাম, প্রমথ চৌধুরীর মত মানুষেরা উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন মন্মথর সৃষ্টি সম্ভাবনায়। লিখিত অভিনন্দনবার্তা পাঠিয়ে উভয়েই উৎসাহিত করেছিলেন তরুণ নাট্যকারকে। সেই প্রেরণাকে পাথেয় করে মন্মথ যে সৃজনের ধারাবাহিক পথরেখাটি ধরে চলা শুরু করলেন তাতে ক্লান্তি ছিল না। ফলে সেক্ষেত্রে সৃজনের উৎসমুখ স্বতঃস্ফূর্তই ছিল। থেমে যায়নি। ১৯২৩ থেকে গণনাট্যের ধারা প্রবাহিত হবার আগের সময়কালটিকে 'মন্মথ রায়ের যুগ' বললে খুব একটা অত্যুক্তি হয় না। যদিও এই পর্যায়-কালের মাঝামাঝি সময়ে বুদ্ধদেব বসু, শিবরাম চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বনফুল, পরিমল গোস্বামী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত তাঁদের একাঙ্ক রচনার মধ্যে দিয়ে এই সময় কালের একাঙ্কের ভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করেছিলেন—তবুও রচনার সংখ্যাধিক্যে. বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, ঘটনাবিন্যাসের নিপুণতায়, অনবদ্য নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত সৃষ্টির দক্ষতায় মন্মথকে অগ্রজের সম্মান দেওয়া যায়।

১৯৭৩ সালের শেষের দিকে 'মুক্তির ডাক'-এর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন উপলক্ষে বাংলা সাহিত্য একাডেমী যখন মন্মথ রায়কে একাঙ্কের প্রথম প্রবর্তকের সম্মান ও 'মুক্তির ডাক'-কে প্রথম বাংলা একাঙ্কের সম্মানে ভূষিত করে গুণীজনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রচার করে তখন তা নিয়ে বিতর্কের সূচনা হয়। প্রতিবেদনটির অনুলিপি এখানে রাখা হল। লক্ষণীয় বিষয় হল, প্রতিবেদনটিতে যুগ্ম আহ্বায়ক কথাটির তলায় কারো নাম দেওয়া নেই। অথচ ঐ প্রতিবেদনের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন ড. অজিত কুমার ঘোষ ও বিনয়রঞ্জন সরকার।

একাঙ্ক নাটকের সুবর্ণজয়ন্তী

আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, ১৯২৩ সালের বড়দিনে কলিকাতার স্টার থিয়েটার নাট্যকার মন্মথ রায় রচিত একাঙ্কে সম্পূর্ণ একটি নাটক 'মুক্তির ডাক' অভিনয় দ্বারা বাংলা নাট্যসাহিত্যে এবং নাট্যাভিনয়ক্ষেত্রে এক অভিনব ইতিহাস সৃষ্টি হয়। বাংলা নাটকের ঐতিহাসিক পরম্পরায় 'মুক্তির ডাক' প্রথম নাটক যাহা সম্পূর্ণ নতুন একাঙ্ক নাট্য প্রকরণ-এর সন্ধান দিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, সমালোচকরা প্রথম থেকেই 'মুক্তির ডাক' নাটকটিকে 'বাংলার প্রথম একাঙ্ক-নাটক' বলে অভিহিত করিয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে বাংলা একাঙ্ক নাটক সত্যই সাফল্যজনক অভিনীত হইতেছে। একথা শুধু অস্বীকার্য নয়, আজও তাহার একাঙ্ক নাটক অভিনীত হইতেছে। ইদানীং অপেক্ষাকৃত আকারে ছোট এবং [redacted] অভিনীত। উপরন্তু, একাঙ্ক নাটক শুধু আজ ইতি নয়, [redacted] বিভিন্ন অভিনয় একাঙ্ক নাটক আজ অন্য সাফল্য লাভ করিয়াছে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে 'মুক্তির ডাক' আমাদের নাট্যশালাতে যে একাঙ্কের সম্ভাবনা দেখাইয়াছিল, ঐ স্মরণে, আমরা সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করিতে চাই। নাট্যকার মন্মথ এবং প্রযোজক ও অভিনেতাদের স্মরণে এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মীদের সহযোগিতায় আগামী ২৪শে ডিসেম্বর হইতে আমরা এই উৎসবে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির নাট্য-উৎসবে যোগদানে একাঙ্ক নাটকের ঐতিহ্যকে অভিনন্দিত করিতে, আপনাদের এই আহ্বান এবং আমন্ত্রণ।

অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য এই আমাদের যুক্ত স্বাক্ষরে আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করি। যোগাযোগ সূত্র :

যুগ্ম-আহ্বায়ক
প্রযত্নে / [illegible] বাংলা নাট্য একাডেমী
১ মুক্তারাম ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ফোন: ৩৪৭২১১

[illegible]

এর বিরুদ্ধে 'অভিনয়' পত্রিকার পক্ষ থেকে অন্য বক্তব্য প্রচার করা হয়। তারা নানা বিদগ্ধ মানুষের লেখা উদ্ধৃত করে একটি প্রচার পুস্তিকা তৈরী করে প্রচার করতে থাকে--'বিভ্রান্তির বিপক্ষে' নাম দিয়ে :

বিভ্রান্তির বিপক্ষে

প্রথম বাংলা একাঙ্ক সম্পর্কে বাংলা নাটকের ঐতিহাসিক গবেষকদের অভিমত :

ডঃ অজিত কুমার ঘোষ (একাঙ্ক সঞ্চয়ন, ১৯৬০)... 'রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা সাহিত্যে সার্থক একাঙ্কিকা খুব বেশি লেখা হয়নি। তবে একেবারেই লেখা হয়নি তা নয়। অমৃতলাল বসুর 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' (১৮৮৬) বিদেশী নাটকের দ্বারা প্রভাবিত একটি নিখুঁত একাঙ্ক নাটক রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।...দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জন্ম' একখানি শিল্পরসোত্তীর্ণ একাঙ্ক নাটক। একাঙ্ক নাটক রচয়িতাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নামই সর্বপ্রথম উচ্চারণ করা উচিত। 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় একাঙ্ক নাটক।' ডঃ ঘোষ 'নাট্যতত্ত্ব পরিচয়' (১৯৭৩)-এ লিখেছেন—'...দু-একটি খাঁটি একাঙ্ক নাটকেরও নাম করা যায়, যথা অমৃতলালের চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে এবং দ্বিজেন্দ্রলালের পুনর্জন্ম। রবীন্দ্রনাথের 'ব্যঙ্গকৌতুক ও হাস্যকৌতুক'-এর মধ্যেও আমরা কয়েকটি উপভোগ্য একাঙ্কিকার সন্ধান পেলাম।'

মন্মথ রায়ের গ্রন্থাবলী (বসুমতী, ১৯৭২)-র ভূমিকায় ডঃ ঘোষ লিখছেন : মন্মথ রায়ের নাট্য সাধনার ৫০ বর্ষ পূর্ণ হলো। তাঁর ছাত্রাবস্থায় রচিত 'মুক্তির ডাক' নামে একাঙ্ক নাটকটিই হল তাঁর প্রথম প্রকাশিত নাটক।... নাটকটি নাট্যকারের শুধু যে প্রথম একাঙ্ক নাটক তা নয়, আধুনিক একাঙ্ক নাটকের পথিকৃৎরূপে এই নাটককে নিখুঁত বলা যায়...তবে অপরিণত বয়সের রচনা বলেই নাট্যকার স্থানে স্থানে অতিনাটকীয় উপাদান এনে ফেলেছেন'। (!!)

ঐ গ্রন্থাবলীতে সন্নিবেশিত নাট্যকারের জীবনীতে মন্মথ রায় নিজে 'মুক্তির ডাক'-কে বাংলার প্রথম সার্থক একাঙ্ক নাটক বলেছেন।

ডঃ সুকুমার সেন (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় সং)...জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম একাঙ্ক প্রহসন 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'। (প্রথম অভিনয় ২০.৯.১৮৭২-এর পর বহুবার সাধারণ মঞ্চে অভিনীত)।

প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)— ...'মুক্তির ডাক একখানি যথার্থ drama'

মনোমোহন ঘোষ ('একাঙ্কিকা'র ভূমিকায়, ১৯৫৫) ...১৯২৩ সালে কলকাতার স্টার থিয়েটার কর্তৃক তাঁর প্রথম একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' অভিনীত হয়।

সাহিত্য কোষ (নাটক) আলোক রায় সম্পাদিত, (১৯৬৩) ...'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক প্রহসন 'কিঞ্চিৎ জলযোগ।'

আশুতোষ ভট্টাচার্য (বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস)...গিরিশচন্দ্রের 'বেল্লিক বাজার' এক অঙ্কে সম্পূর্ণ একটি সামাজিক প্রহসন। ...মন্মথ রায় 'রোমান্টিক পরিবেশ পরিত্যাগ করিয়া সংহত ও বাস্তব সমাজ জীবন হইতে একাঙ্ক নাটকের উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহা আধুনিক যুগে অধিকতর সার্থক হইতে পারে।'

দিলীপ মিত্র (একাঙ্ক নাটকের কথা—১৯৬৪) ...'প্রাক আধুনিক পর্বে বাংলা একাঙ্ক নাট্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় রবীন্দ্রনাথ। ...অমৃতলালের একাঙ্ক জাতীয় রচনাগুলি উন্নততর প্রতিভার সৃষ্টি। পূনর্জন্ম (১৯১১) রীতির বিচারে একাঙ্ক ও রসের বিচারে উন্নত সুসৃষ্ট। ...এরা বাংলা একাঙ্কিকার অসামান্য উদ্‌গাতা।'

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়। বাংলা একাঙ্ক নাটকের সুবর্ণজয়ন্তী। অমৃত ১৩ বর্ষ ৩০ সংখ্যা) ...'১৯ শতকের অভিনয়ে পঞ্চাঙ্ক নাটকের আগে পরে একাঙ্ক নাটকের প্রচলন ছিলো। ...এ যুগের অন্ততঃ দুটি নাটককে (অমৃতলালের চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে ও দ্বিজেন্দ্রলালের 'পূনর্জন্ম'-কে মোটামুটি ভাবে একাঙ্ক নাটক বলা চলে। ...রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক নাটিকাগুচ্ছের কয়েকটিতে একাঙ্ক নাটকের ধর্ম রক্ষিত হয়েছে।...

...১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর প্রথম বাংলা একাঙ্ক নাটকের সর্বপ্রথম মঞ্চ প্রযোজনার তারিখ হিসেবে অবশ্য পালনীয়। (শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের অবগতির জন্য জানাচ্ছি কিঞ্চিৎ জলযোগ ও চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে যথাক্রমে ২৬।৪।৭২ এবং ১৬।৪।৮৪-তে ন্যাশনাল থিয়েটার এবং স্টারে মঞ্চস্থ হয়—মুক্তির ডাকের ৫৮ বছর আগে!)

বাংলার সচেতন নাট্যকর্মীরা যখন যুক্তিবাদকে মর্যাদা দিয়ে একটা জীবনমুখী ঐতিহ্যের স্বার্থে সংগ্রামে সামিল হয়েছেন তখনই আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম নাটক ও নাট্য প্রয়াসের সঙ্গে সংস্পর্শহীন কিছু দেউলিয়া বুদ্ধিজীবী সংবাদপত্রে বিবৃতি এবং প্রচারপত্রের মাধ্যমে বাংলার গৌরবময় নাট্য-ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত ও বিকৃত করার এক জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন। জাতির সংগ্রামী নাট্য-ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে এরা মন্মথ রায়ের একটি অতিনাটকীয় ও কুরুচির নাটক 'মুক্তির ডাক' (১৯২৪)-কে বাংলা সাহিত্যের তথা মঞ্চের প্রথম একাঙ্ক নাটকরূপে স্বীকৃতি দেবার নির্দেশ দিয়ে এক ফতেয়া জারী করেছেন।

এদেশের পারস্পরিক পিঠচুলকানীর দৌরাত্ম্যে যাকে এতোদিন বাংলার 'প্রথম সার্থক একাঙ্ক' করে তোলা হয়েছিল, তাকেই নাট্যকার এবং তাঁর পারিষদবর্গ 'প্রথম একাঙ্ক' বলে প্রচার সুরু করলেন গত ১৯৭২-এর ডিসেম্বর থেকে। 'প্রথম একাঙ্কের নির্দেশক'-কে সম্বর্ধনা জানানোর চাতুরি দেখানো হলো, অথচ একবার ভেবে দেখার অবকাশ মিললো না প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটকের রচয়িতা বা নির্দেশককে তাঁদের প্রাপ্য সম্মানের কতটুকু তাঁরা দিয়েছেন! ওপরের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হবে যারা দু-দশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অমৃতলাল-দ্বিজেন্দ্রলালকে সার্থক একাঙ্কের স্রষ্টা বলেছেন তাঁরাই আজ সুর পাল্টে কায়েমী স্বার্থের তল্পিবাহক মন্মথ রায়কে তুলে ধরতে মিথ্যার

প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। কেউ কেউ বলছেন, জটিল জীবন সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে সামাজিক বিষয় নিয়ে মুক্তির ডাকের আগে কোন একাঙ্ক রচিত হয়নি। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' ও 'বেল্লিক বাজার' কি সামাজিক সমস্যার নাটক নয়? 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' কি জীবনযন্ত্রণার আধুনিক নাটক নয়? অন্যদিকে ১৯২৩-এ রুশবিপ্লব ও মহাযুদ্ধোত্তর কালে ভারতের যুবশক্তি যখন জালিয়ান-ওয়ালাবাগের বদলা নেবার সংকল্পে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিচ্ছে, তখন বাংলার এক ছাত্র-খেলোয়াড় লিখলেন 'মুক্তির ডাক'-এর মতো নাটক, যে নাটক শ্রেষ্ঠ—সম্রাট—বারবণিতার পরিবারের নারী-পুরুষের ন্যক্কারজনক ব্যাভিচার সমস্যার মাঝে বুদ্ধদেবকে সর্বরোগহর রূপে হাজির ক'রার মাদারীর খেল্ দেখিয়ে ভাবালুতার অবিশ্বাস্য জগতে বিচরণ করেছে। নানা জাতীয় সমস্যার (!) হঠকারী আয়োজনে একাঙ্কের ধর্ম এখানে দলিত-মথিত ও ধর্ষিত হয়েছে। তাই 'সমাজতান্ত্রিক' নাট্যকারের 'জয়োস' পুষ্ট শহুরে সমাজতন্ত্রের 'মতিবিবি-বারবধূ'রা মুক্তির ডাকের মেকি মাইলষ্টোন ; আজকের সংগ্রামী নাট্যকর্মীদের সমানাধিকারের সমাজতন্ত্রের সাথে এর কোনও সংযোগ থাকতে পারে না।

মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীর ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ইতিহাস বিকৃতি ঘটিয়ে আমাদের গৌরবময় নাট্য ঐতিহ্যকে পদদলিত করে তথাকথিত জ্ঞানীগুণীজনের দেওয়া যে সুবর্ণ জয়ন্তীর ফতোয়া তা প্রতিটি সচেতন নাট্যকর্মী প্রত্যাখ্যান করবেন বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

২৫।১২।১৯৭৩ — সম্পাদকমণ্ডলী
১৩১ হরিশ মুখার্জী রোড — 'অ ভি ন য়'
কলিকাতা ২৬

'বাংলা সাহিত্য একাডেমী'র প্রতিবেদনে যাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন, তাঁদের কাছে 'অভিনয়' পত্রিকার তরফে পত্র পাঠানো হয় পূর্বের ঐ প্রতিবেদনটি সহ। পত্রটি নিম্নরূপ :

'বাংলা একাঙ্ক নাটকের সুবর্ণ-জয়ন্তী' শিরোনামে বাংলা সাহিত্য একাদেমী প্রচারিত প্রতিবেদনে আপনি অন্যতম স্বাক্ষরকারী। একাদেমীর দাবি খণ্ডন করে নভেম্বর-ডিসেম্বর '৭৩ সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তার একটি সহমুদ্রণ আপনার কাছে পাঠানো হল। বাংলার নাট্য সাহিত্যের সঠিক ইতিহাস রচনার স্বার্থে আপনার কাছে অনুরোধ উক্ত সম্পাদকীয়-র পরিপ্রেক্ষিতে আপনার সযুক্তি বক্তব্য আমাদের দপ্তরে ১০ই মার্চের মধ্যে পাঠিয়ে বাধিত করুন। আপনার বক্তব্য যথাযোগ্য মর্যাদাসহ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করতে আমরা আগ্রহী।

এই চিঠি পেয়ে বেশ ক'জন পূর্বে বাংলা সাহিত্য একাডেমীতে দেওয়া স্বাক্ষর ফিরিয়ে নেন। নানা তিক্ত বাদানুবাদের পর বিষয়টি ধামা চাপা পড়ে যায়। পরবর্তীকালে ঐ তিক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে অনেক নাট্য সমালোচক, নাট্যবোদ্ধা নীরব থেকেছেন কিংবা প্রসঙ্গ টি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। স্রষ্টার সৃজনেই তাঁর আসল পরিচয়। মন্মথ একাঙ্কের পথিকৃৎ না পুরোধা—এসব নিয়ে কূটতর্কে না জড়িয়ে একথা বলাই বোধহয় ঠিক যে দীর্ঘ ছয়

দশক ধরে একাঙ্কের আধারে যে বিচিত্র বর্ণময় রামধনু রঙ তিনি ছড়িয়েছেন তার তুলনা বোধহয় তিনি নিজেই। ঐতিহাসিক তথ্যকে তুলে ধরা শুধু সত্যি ঘটনা পরিবেশনের খাতিরেই। 'মুক্তির ডাক'-এর প্রথম অভিনয়ের (২৫.১২.২৩) পঞ্চাশ বছর পরে ঐ দিনটিকে মনে রাখার জন্যই ১৯৭৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর দেবনারায়ণ গুপ্তের পরিচালনায় 'মুক্তির ডাক'-এর পুনরাভিনয় হয়। সেই সঙ্গে সম্বর্ধনা জানানো হয় নাট্যকার মন্মথকেও। সেই প্রসঙ্গে যে পুস্তিকা ছাপা হয়েছিল (চরিত্রলিপি সমেত) সেটিও এই আলোচনায় সংযোজিত হল :

১৯২৩ সাল, ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিন। একটি ছোট্ট নাটিকা মঞ্চস্থ হোল—স্টার থিয়েটারে। নাটিকাটির নাম—"মুক্তির ডাক"। নাট্যকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩ বৎসর বয়স্ক এম. এ. ক্লাসের ছাত্র শ্রীমন্মথ রায়। নাটিকাটি মঞ্চস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন স্বাদ বহন করে আনলো—নাট্যজগতে। একটি দৃশ্যের এই নাটিকার কাহিনী, ঘটনা সবকিছুই স্বল্পকালের। সংলাপেও নতুনত্বের আমেজ। ইতিপূর্বে ছোট ছোট প্রহসন বা নাটিকা লেখা হয়েছে বটে, কিন্তু তার ঘটনাকাল দীর্ঘ এবং একাধিক দৃশ্য সম্বলিত। যাকে নাট্য-রসিক বলা চলে না, আবার স্বয়ং সম্পূর্ণ নাটকও বলা চলে না। নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী নাটক এবং প্রহসন বিভিন্ন গোত্রীয়। "মুক্তির ডাক প্রহসন নয়—নাটক। পূর্বে দুই-একটি একদৃশ্যে সম্পূর্ণ প্রহসন অভিনীত হইলেও—একদৃশ্যে সম্পূর্ণ নাটক হয়নি। "মুক্তির ডাক"-ই বাংলার প্রথম একাঙ্ক নাটক। তাই একাঙ্কিকার আজ অর্ধ-শতাব্দীকাল পূর্তি উপলক্ষে, আমরা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার আয়োজন করেছি। অর্থাৎ "মুক্তির ডাক"-এর অভিনয়ের আয়োজন করেছি। আর সেই সঙ্গে সম্বর্ধিত করছি—সেদিনের সেই তরুণ নাট্যকার এবং আজকের প্রবীণতম নাট্যকার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় মহাশয়কে।

আজকের অভিনয়ে অংশ গ্রহণকারী শিল্পীগণ :

শ্রীবুদ্ধ —	শ্রী	গোপাল সিংহ রায়
বিম্বিসার —	,,	অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
সুন্দরক —	,,	সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য
সুচিত্র —	,,	প্রেমাংশু বসু
গায়কভিক্ষু —	,,	অলক বাগচী
ভিক্ষুগণ —	,,	রবীন বসু, কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়, বীরেন দাস, বলাই মুখোপাধ্যায়, কানু চক্রবর্তী
রক্ষীদ্বয় —	,,	কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়, সুশীল বসু
অম্বা —	শ্রীমতী	বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়
পদ্মা —	,,	ঝুমা মুখোপাধ্যায়
দাসী —	,,	মেনকা দাস

নির্দেশনা ঃ দেবনারায়ণ গুপ্ত সুরকার ঃ শচীন বসু

Megaphone Records

মন্মথ রায় প্রণীত

শকুন্তলা

শ্রেষ্ঠশিল্পী
সমন্বয়ে অভিনীত ও
রেকর্ড জগতের অভিনবত্ব

৩ খানা রেকর্ডে সমাপ্ত
মূল্য
১৩৷৹

প্রযোজক
শ্রীদুর্গাদাস
বন্দ্যোপাধ্যায়

দি মেগাফোন কোম্পানী
৭৭/১ হ্যারিসন রোড। কলিকাতা

গ্রামাফোন ডিস্ক নাটক □

শকুন্তলা

যে লব্ধ প্রতিষ্ঠ নাট্যকার মন্মথ বাবুর "খনা" ও
রামপ্রসাদ রেকর্ড জগতের যুগান্তর
আনিয়াছে, সেই নাট্যকার
—শ্রীযুত মন্মথ রায় রচিত—

শকুন্তলা

সঙ্গীত রচনা অখিল নিয়োগি সুর সংযোজনা ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।
আগষ্ট মাসের শেষ ভাগেই প্রকাশিত হইবে।

ইহার বিশেষত্ব কি?

শকুন্তলা—ভারতের সর্ব্বোত্তম রেকর্ডিং
শকুন্তলা—রেকর্ড জগতের নবতম আশ্চর্য্য
"শকুন্তলায়" নেপথ্য সঙ্গীতের অভিনবত্ব, এযাবৎ অন্য কোন রেকর্ড
কোম্পানি কল্পনা করেন নাই। "শকুন্তলায়" বাঙ্গালার সাফল্যবান
নিম্নলিখিত প্রথিতযশা নট-নটীদের অভাবনীয় সম্মেলন—
শ্রীযুত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত রবি রায়,
ললিত মিত্র, সন্তোষ দাস, রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি এবং
তৎসহ রহিয়াছেন নাট্য-সম্রাজ্ঞী শ্রীমতী তারাসুন্দরী,
নীহারবালা, শ্রীমতী চারুশীলা, চারুবালা, (চরি)
শ্রীমতী ফুল্লনলিনী, শ্রীমতী তারা, গীতা দেবী,
আঙ্গুরবালা (টেঁপি) শেফালিকা প্রভৃতি।
আমাদের শেষ অনুরোধ—রেকর্ড পালা কিনিবার পূর্ব্বে
"শকুন্তলা" শুনিতে ভুলিবেন না
মাত্র ছ খানি ১০ ইঞ্চি ডবল সাইডেড্ রেকর্ডে সমাপ্ত
মূল্য—১০্ টাকা মাত্র

দি মেগাফোন কোম্পানি

রেকর্ড কোম্পানীগুলি রেকর্ড প্রকাশের আগে সংবাদপত্রে এইভাবে বিজ্ঞাপন দিত।

মন্মথ রায় : গ্রামাফোন ডিস্ক এর নাটক

চলচ্চিত্র, গ্রামাফোন ডিস্ক, বেতার (এবং অধুনা দূরদর্শন)-এর জন্য নাট্যরচনার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। বহু সচ্ছল পরিবারে কলের গান সে যুগে সহজেই জায়গা করে নিতে পেরেছিল। কারণ রক্ষণশীল পরিবারে যখন নারীরা 'চিক'-এর আড়ালে বসে যাত্রাপালা বা নাটক দেখতেন, তখনই কলের গান এর মাধ্যমে সে যুগের নামীদামী অভিনেতৃদের কণ্ঠ শোনা তাদের পক্ষে বেশ রোমাঞ্চকরও ছিল। বাংলা চলচ্চিত্র তখন সবে কথা বলতে শুরু করেছে (১৯৩১ / জামাইষষ্ঠী)। সেসময় সমগ্র বাংলা দেশ জুড়ে গ্রামাফোন কোম্পানিগুলি তাদের ব্যবসা বাড়িয়ে তুলেছিল। তিন এবং চারের দশকেই এইসব রেকর্ড নাটক জনপ্রিয় হয় খুব। আকাশবানীর শব্দতরঙ্গ যেখানে পৌঁছত না সেখানে গ্রামাফোন ডিস্কগুলি সেই উদ্দেশ্য পূরণ করতো। অভিনয়ে, গীতিময়তায়, বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগে ও নাটকীয়তায় এই ডিস্কগুলি ছিল সে যুগে অসম্ভব জনপ্রিয়।

মন্মথ রায়ের গ্রামাফোন ডিস্ক নাটকের সংখ্যা খুব কম নয়। ১৯৩৪ সাল থেকে স্বাধীনতার কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই মাধ্যমটির জন্য অসংখ্য নাটক তিনি লিখেছেন। এই রেকর্ড নাটকগুলির জন্য তিনি বিষয় হিসাবে বেছেছেন পৌরাণিক, ঐতিহাসিক কাহিনীর পাশাপাশি বিখ্যাত ব্যক্তির জীবন কাহিনী যা সে যুগে মানুষকে আবেগাপ্লুত করতো। এক্ষেত্রেও লক্ষ্যণীয় যে শ্রোতার প্রত্যাশা পূরণের বিষয়েও তিনি ছিলেন সচেতন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'কে যেমন রেকর্ড নাটকের রূপ দিয়েছেন তেমনি সে যুগে অভিনীত নিজের লেখা জনপ্রিয় নাটকগুলিকেও গ্রামাফোন ডিস্কের মাধ্যমে শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেবার ব্যাপারেও যত্নবান হয়েছেন।

প্লেয়ার, রেকর্ড প্লেয়ার এর অনেক আগেই 'কলের গান'-এর প্রচলন ছিল। সঙ্গীতের পাশাপাশি 'নাটক' রেকর্ড করার প্রথা চালু করেছিলেন জে. এন. ঘোষ। তিনি 'মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানি' নাম দিয়ে এর জন্য একটি প্রতিষ্ঠান খুলেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের নাট্যবিভাগে প্রথম ডিস্ক-নাটক রচনার দায়িত্ব তিনি দিয়েছিলেন মন্মথ রায়কে। সে যুগে ডিস্ক নাটকগুলির চাহিদা ছিল প্রচুর। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী মত খ্যাতনামারা ছিলেন এগুলির পরিচালক। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, তিমিরবরণ প্রমুখ। ধীরেন দাস গান রচনা ও সুরারোপ এই দুটি কাজই কখনো কখনো করেছেন। বেশিরভাগ সময় শারদীয়ার আগে প্রকাশিত হয়ে এগুলি শারদীয়া সংখ্যার মত বাজার মাতিয়ে রাখত। দুপিঠের এক একটি রেকর্ডের দাম ছিল আড়াই টাকা।

রেকর্ড পালাকারকে সুললিত গদ্য ব্যবহারের সঙ্গেই মাঝে মাঝে সঙ্গীতের প্রয়োগ ঘটাতে হ'ত। নাট্যকার মন্মথ অভিনয়যোগ্য বাণী প্রয়োগ করে চমৎকার নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সঙ্গীত পরিচালক এবং শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালক চিন্তা করলেও এগুলি ব্যবহারের কথা পালাকার সংলাপ রচনার সময়েই লিখে দেন।

বেশ কয়েকটি পালায় মন্মথ অভিনয়ও করেছিলেন। এছাড়া ডিস্ক নাটকগুলির সূচনা মুহূর্তে বেশ কটি ক্ষেত্রে তিনি নাটকের স্থানগুলির পরিচয় দিয়েছেন। যেমন 'রামপ্রসাদ' পালায় ছটি খণ্ড শুরুর পূর্বে শোনা যায় প্রথম খণ্ড গৃহ, দ্বিতীয় খণ্ড দুর্গাচরণ মিত্রের গৃহ, তৃতীয় খণ্ড রামপ্রসাদের গৃহ, চতুর্থ খণ্ড পথ, পঞ্চম খণ্ড রামপ্রসাদের গৃহ, ষষ্ঠ খণ্ড গঙ্গাতট ও বিসর্জন।

।।। খনা ।।।

মন্মথরায়ের প্রথম ডিস্ক নাটক হল খনা। ১৯৩২ সালে লেখা এ নাটকটি পরে ১৯৩৫ সালে নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ হয় (১১.৭.৩৫)।

প্রথমেই 'খনা'র কথা বলতে হয়। মেগাফোন গ্রামাফোন কোম্পানির প্রথম নাট্যার্ঘ 'খনা', মন্মথ রায়ের 'খনা' নাটকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। অক্টোবরে শারদীয়া উৎসবকে কেন্দ্র করেই ১৯৩৪ সালে মন্মথ রায় রচিত এবং প্রযোজিত এই নাটকের রেকর্ডটি বেরোয়। রেকর্ডটির নম্বর ছিল JNG ১৫৪—১৬০। ঘটনার ক্রমানুযায়ী চোদ্দটি স্থানে নাট্যরচনাটি বিধৃত। ৭ খানি ডাবল্ সাইডেড ব্লু-লেবেল রেকর্ডে এটি প্রকাশিত হয়। রেকর্ডটির প্রথমাংশ শুনে বোঝা যায়নি। দ্বিতীয়াংশ, রাজকুমার মিহিরের রাজ্যাভিষেক, তৃতীয়াংশ, সমুদ্রতীরে মিহির ও খনা, চতুর্থ ঃ উজ্জয়িনীতে বরাহের বাসভবন, পঞ্চম : উজ্জয়িনীর পথ, মিহির, খনা, সন্তানহারা পাগলিনী, ষষ্ঠ : ও সপ্তম : বিক্রমাদিত্যের বিচারসভা, অষ্টম : বরাহের বাসভবন, নবম ও দশম : মিহিরের শয়নগৃহ, একাদশ থেকে চতুর্দশ : বরাহের বাসভবন।

এই ডিস্কনাটকে অভিনয় করেছিলেন :

বিক্রমাদিত্য	:	রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (রঙমহল)
মেঘবর্ণ	:	মনীন্দ্রনাথ ঘোষ (নাট্যনিকেতন)
সুনন্দা	:	তারাসুন্দরী
মিহির	:	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (নিউ থিয়েটার্স)
খনা	:	নীহারবালা (নাট্যনিকেতন)
বরাহ	:	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (নাট্যনিকেতন)
কামন্দক	:	ভূমেন রায় (রঙমহল)
উত্তম সেন	:	রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
উন্মাদিনী	:	শ্রীমতী তারা
এক চক্ষু লোক	:	অয়স্কান্ত বক্সী (নাট্যনিকেতন)
সর্পদংশন ভীত লোক	:	ললিত মিত্র (নাট্যনিকেতন)
ভৈরব	:	সুবল ঘোষ
বৈতালিক দ্বয়	:	ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় (মেগাফোন কোম্পানী), জ্ঞান দত্ত।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নামের তালিকার পাশে বন্ধনীর মধ্যে সে যুগের নাট্যালয়ের নাম লেখা ছিল। গ্রামাফোন ডিস্কের ওপর দেওয়া এই নামের তালিকা থেকে একথা মনে করা যায় যে এই অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সে সময় সেই নাট্যালয়ের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। মঞ্চের কাছে এই ঋণ স্বীকার বিষয়টি লক্ষ্য করার মত। বিখ্যাত অভিনেতৃদের সমৃদ্ধ অভিনয়ে এই নাটকগুলি জনসাধারণের মন ভরিয়ে দিত। 'খনা'-য় চারটি গান ব্যবহৃত হয়েছিল। যন্ত্রসঙ্গীতের দায়িত্ব ছিলেন মেগাফোন কোম্পানি।

১ম গান : দীঘির বুকে কলসী ভরিয়া........
২য় গান : বুকের সে ধন হারিয়ে গেছে......
৩য় গান : পাবে মনের মানিক........নয়ন মোর।
৪র্থ গান : কেন কাঁদে উপোষীর......কোথায় আমার চোখের মনি।

এই গ্রামাফোন ডিস্কটির মূল্য লেখা ছিল ১৭ ।। টাকা। সে সময়ে এই 'খনা' রেকর্ডটি লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিল।

।। রামপ্রসাদ ।।

মেগাফোনের JNG 181 থেকে 183 সংখ্যক রেকর্ডে পাওয়া গেছে 'রামপ্রসাদ'। রচয়িতা মন্মথ রায়। শুধু রচয়িতাই নয় এ পালায় তিনি নাম ভূমিকায় অভিনয়ও করেছিলেন। রামপ্রসাদের গানগুলি অবশ্য গেয়েছিলেন ভবানী সেন। নাটকগুলির ঘটনা ছটি স্থানে ঘটেছিল। রেকর্ডে এইভাবে তা ভাগ করা হয়েছিল : ১ম খণ্ড গৃহ, ২য় খণ্ড দুর্গাচরণ মিত্রের গৃহ, ৩য় খণ্ড রামপ্রসাদের গৃহ, ৪র্থ খণ্ড পথ, ৫ম খণ্ড রামপ্রসাদের গৃহ, ষষ্ঠ খণ্ড গঙ্গাতট ও বিসর্জন। এই রেকর্ডটি সঙ্গীতের ব্যবহারে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। পরপর ৬টি গানের পরিচয় বিবৃত হল :-

১ম গান	:	অন্ন দে........
২য় গান	:	আমায় দে মা তবিলদারী........
৩য় গান	:	মা আমার ঘুরাবি কত........
৪র্থ গান	:	সুরা পান করিলে আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।
৫ম গান	:	আশার আসা ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।
৬ষ্ঠ গান	:	রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায় যা হবার তাই হলো।

তৃতীয় গানটি রামপ্রসাদের কন্যা এবং ষষ্ঠ গানটি ব্যবহৃত হয় রামপ্রসাদের মৃত্যুদৃশ্যে অন্য চরিত্রের মুখে। ঐ গানটি দিয়েই রেকর্ড পালাটির সমাপ্তি ঘটে।

এ রেকর্ডের সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকা (৫. ৬. ৩৫) বলেছিল :– "তিনখানি

মাত্র রেকর্ডে বাংলার যুগযুগান্তের শ্রদ্ধাচর্চিত সাধক রামপ্রসাদের বিচিত্র ধর্মময় জীবনী, তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত সহকারে সন্নিবেশিত বানী— চমৎকার। এ রেকর্ডের গান ও কথা অতি চমৎকার।"

।।। শকুন্তলা ।।।

'শকুন্তলা' সেই চিরাচরিত কাহিনী "তরুণ বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মন্মথ রায়ের অভিনব দান" লেখা মেগাফোনের JNG ২১৩–JNG ২১৮–সংখ্যক রেকর্ড। এটির বিজ্ঞাপনে ছিল–'৬খানি ১০ ইঞ্চি ডবল সাইডেড রেকর্ড।' মূল্য ১০ টাকা। পরিচালক : দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীতরচনা : অখিল নিয়োগী। সুরকার ও নেপথ্য সঙ্গীত পরিচালনা : ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।

দি মেগাফোন কোম্পানি এই রেকর্ড প্রকাশের আগে পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল এইভাবে : "শকুন্তলা–ভারতের সর্ব্বোত্তম রেকর্ডিং। শকুন্তলা–রেকর্ড জগতের নবতম আশ্চর্য"। শকুন্তলায় নেপথ্য সঙ্গীতের অভিনবত্ব, প্রথিতযশা নট-নটীদের সম্মেলনের বিষয়টিও বিজ্ঞাপনে গুরুত্ব পেয়েছিল।

চরিত্র লিপি

বনদেবতা	:	ভবানীচরণ দাস (মেগাফোন)
দুর্বাসা	:	রবি রায় (রঙমহল)
কণ্ব	:	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (নাট্যনিকেতন)
মারীচ	:	সন্তোষ দাস (রঙমহল)
তাপস	:	অয়স্কান্ত বক্সী (রঙমহল)
শার্ঙ্গরব	:	রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (রঙমহল)
দুষ্মন্ত	:	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (নিউ থিয়েটার্স)
শারদ্বত	:	দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
গৌতমী	:	তারাসুন্দরী
সর্বদমন	:	শেফালী মালা (মির্নাভা)
অদিতি	:	চারুশীলা
তাপসী	:	পুষ্পরানী
প্রিয়ংবদা	:	চারুবালা (রঙমহল)
অনসূয়া (কথা)	:	সীতা দেবী
অনসূয়া (গান)	:	তারাসুন্দরী
শকুন্তলা	:	নীহারবালা
জেলেনী	:	চারুশীলা।

জনপ্রিয়তায় এ রেকর্ড তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

।। মীরকাশিম ।।

১৯৪৩ সালে মেগাফোনের JNG ৫৬৭২--৫৬৭৯--সংখ্যাক রেকর্ডে ১০ আগষ্ট মন্মথ রায়ের 'মীরকাশিম' নাটকটি গৃহীত হয়।

পরিচালনা	:	শৈলেন চৌধুরী
সঙ্গীত পরিচালক	:	রঞ্জিত রায়
মীরকাশিম	:	নির্মলেন্দু লাহিড়ী
নন্দকুমার	:	অহীন্দ্র চৌধুরী
হে সাহেব	:	ভূমেন রায়
খোজা পিদ্রুস	:	নরেশ মিত্র
ফতেমা	:	পূর্ণিমা রায়।

এছাড়া ছিলেন রানীবালা, প্রভাদেবী প্রমুখ।

এই রেকর্ড-নাটকটি পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষের মনে দেশাত্মবোধের সঞ্চার করেছিল। আবহসঙ্গীতের ব্যবহার ভাল। যুদ্ধক্ষেত্রের কোলাহল, রণ দামামার সঠিক প্রয়োগ, অস্ত্রের ঝনঝনা, আর্তনাদ, হাহাকার এত সঠিকভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল যে রেকর্ড নাটকটি শোনার সময় শব্দের মধ্যে দিয়ে শ্রোতার চোখের সামনে ছবি তৈরি হত। সারা দেশ জুড়ে যখন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম--আইন অমান্য চলছে, নাট্যমঞ্চগুলিও যখন দেশাত্মবোধক নাট্য প্রযোজনার মধ্যে দিয়ে দেশের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার নজির সৃষ্টি করছে, তখন রেকর্ড কোম্পানিগুলিও চুপ করে থাকেনি। মনোরঞ্জন, ব্যবসায়িক অভীপ্সার পাশাপাশি দেশাত্মবোধের প্রকাশও ঘটিয়েছিল। সঠিক সময়ে মেগাফোন কোম্পানি পরাধীন ভারতবাসীর মনে দেশাত্মবোধের উন্মাদনা সঞ্চারে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং অবশ্যই এ কাজে তাদের বড় সহায়ক হয়েছিলেন মন্মথ।

।। চাঁদসদাগর ।।

১৭ জুলাই ১৯৫৪-এ 'হিজ মাস্টার ভয়েস' রেকর্ডে গৃহীত হয় চাঁদসদাগর। রেকর্ড পালাটির নম্বর ছিল ২৭৫৫২। এটির অভিনয়াংশে ছিলেন গ্রামাফোন থিয়েট্রিকাল ক্লাব। প্রযোজনা করেছিলেন ধীরেন দাস। ধীরেন দাস লখীন্দরের ভূমিকায় ছিলেন। চাঁদ সদাগর ও বেহুলার ভূমিকায় কণ্ঠদান করেছিলেন যথাক্রমে অহীন্দ্র চৌধুরী এবং সরযূবালা। চাঁদসদাগর নাটক হিসেবে যেমন জনপ্রিয় হয়েছিল, পালা-রেকর্ড হিসেবেও তেমনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

।। বিদ্যুৎপর্ণা ।।

'বিদ্যুৎপর্ণা' সি. এ. পি অর্থাৎ ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার্স-এর একটি মঞ্চ সফল নাটক। মধু বসুর পরিচালনায় এবং তিমিরবরণের সঙ্গীত পরিচালনায় এটি ডিস্ক রেকর্ডে

গৃহীত হয়। এইচ. এম. ভি-র এই রেকর্ড পালাটির সংখ্যা ছিল এন ১৭০৩৩ নৃত্য-গানে-অভিনয়ে এই মঞ্চসফল নাটকটি রেকর্ডপালা হিসেবেও অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছিল। অভিনেত্রী হিসেবে এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন সাধনা বসু ও মঞ্জু দে। তারা যথাক্রমে বিদ্যুৎপর্ণা ও মঞ্জরীর চরিত্রে কণ্ঠদান করেছিলেন। রেকর্ড-এর মাধ্যমটিতে দৃশ্যত অবশ্যই নৃত্যের ভূমিকা নেই, তবু সুপরিচালক শব্দযন্ত্রের সাহায্যে নৃত্যের পরিমণ্ডল তৈরি করেছিলেন। তালবাদ্য ও সঙ্গীতের ব্যবহারে অসাধারণ মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। ইন্দ্রজিৎ, ভদ্রভট্ট ও মোহান্তর ভূমিকায় কণ্ঠ দিয়েছেন তিন সুযোগ্য অভিনেতা, যাঁরা মঞ্চ এবং পালার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী কালে চলচ্চিত্রেও সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁরা হলেন ঃ–মধু বসু, প্রীতি মজুমদার ও অহীন্দ্র চৌধুরী। এই রেকর্ড পালায় তিনটি গান ছিল ঃ–

১ম গান	:	বিরহ রাতে কমল কাঁদে........
২য় গান	:	কুসুম দিল মোরে........
৩য় গান	:	দাও চন্দন রূপলেখা........

প্রথম গানটি সাধনা বসু ও মঞ্জু দে, দ্বিতীয় গানটি মঞ্জু দে এবং তৃতীয়টি গেয়েছিলেন সাধনা বসু। সঙ্গীত রচনা করেছিলেন তিমির বরণ।

।। লায়লী মজনু ।।

'লায়নী মজনু'র পরিচালনা ও সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন ধীরেন দাস। মঞ্চের অভিনয়ে এবং সঙ্গীতে সেই সময়ে এই মানুষটির নাম বারবার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় আজও। সঙ্গীত রচনা করেছেন নজরুল। মজনু ও লায়লার ভূমিকায় ছিলেন ধীরেন দাস ও সরযূবালা। পালারেকর্ডের শুরুতে কাহিনীর 'স্থান' ঘোষণা করেছেন মন্মথ রায় নিজে। মুসলিম পরিবেশকে নাট্যকার সুন্দর সংলাপের সাহায্যে পরিস্ফুট করেছেন। ১৯৩৫ এ গৃহীত এইচ. এম. ভি-র এই রেকর্ডটির নম্বর হল এন ৭৩৯৫ - এন ৭৪০০, অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন গ্রামাফোন ক্লাবের সদস্যরা। এই রেকর্ড পালার একটি গান 'তোমার কাজল চোখে লেখা' তখনকার দিনে মানুষের মুখে মুখে ফিরত।

'লায়লী-মজনু'র চির নবীন প্রেম কাহিনী এই রেকর্ড পালাটির মধ্যে অমর হয়ে আছে। ৬টি ১০ ইঞ্চি ডবল সাইডেড রেকর্ডে এটি গৃহীত হয়েছিল।

চারত্রালাপ

লায়লী	:	সরযূবালা
ঐ (গান)	:	হরিমতী
মজনু	:	ধীরেন দাস
কাসেম খাঁ	:	অহীন্দ্র চৌধুরী

সৈয়দ ওমর	:	নির্মলেন্দু লাহিড়ী
পরীবাণু	:	নিভাননী
মৌলভী	:	রবি রায়
নৌফেল	:	শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
সালেম	:	সন্তোষ সিংহ
সিতারা	:	মায়া মুখোপাধ্যায় (টকী)
সাকী	:	ইন্দুবালা।

রেকর্ডপালাটি প্রকাশের আগে এইভাবে এটি বিজ্ঞাপিত করা

।। সুরথ উদ্ধার ।।

গ্রামাফোন থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানির নামে অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় এইচ. এম. ভি-র এন ৯৮০৭—৯৮১৪ সংখ্যক রেকর্ড নাটক হচ্ছে 'সুরথ উদ্ধার।' রেকর্ডটির ১ম ও ২য় অংশ পাওয়া পায়নি। মন্মথ রায় এ পালায় একজন গ্রামবাসীর ভূমিকায় কণ্ঠও দিয়েছিলেন সামগ্রিক নাট্যরচনার সঙ্গে সঙ্গে। সুরথ ও তাঁর স্ত্রী জয়ন্তীর ভূমিকায় ছিলেন যথাক্রমে রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সরযূবালা। মহাধনাধ্যক্ষ এক খল মন্ত্রীর ভূমিকায় ছিলেন পরিচালক অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী। জনতা চরিত্র শব্দে ব্যঞ্জনায় অপূর্ব হয়ে উঠেছিল। এ নাটকে নারীর স্বামী প্রেম, নারীর মহিমাময়ী রূপটি রচনা ও অভিনয়ের গুণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। সুরথ যখন রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন—রাজসভা থেকে বিলাসকক্ষ সাঙ্গীতিক পরিবর্তনের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে। এই অংশে যন্ত্রসঙ্গীতের সুপরিকল্পিত ব্যবহার অপূর্ব।

'বাঘাযতীন', 'কাফন চোরা', এবং 'ক্ষুদিরামের ফাঁসী' সম্পর্কে অত্যন্ত স্বল্প তথ্য সংগ্রহের কারণ পুরোনো দিনের এই রেকর্ডগুলি দেখবার সৌভাগ্য হলেও শোনবার মত অবস্থায় এগুলি ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দমঠ' মন্মথ রায়ের রেকর্ড পালার নাট্যরূপে হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ধীরেন দাস-এর প্রযোজনায় গ্রামাফোন ক্লাব এর বিভিন্ন ভূমিকায় কণ্ঠ দিয়েছিলেন। রেকর্ডপালার সংখ্যা এন ২৭৬০৪-২৭৬১১ মোট আটটি।

।। কারাগার ।।

'কারাগার' তো সে সময় মঞ্চে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। এইচ. এম. ভি-র রেকর্ড নাটক হিসেবেও 'কারাগার' অর্জন করেছিল এক বহুল জনপ্রিয়তা। চন্দনা ও কংকনের

সংলাপের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার মন্মথ রায় সামাজিক সমস্যার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। কংসের কারাগার যেন পরাধীন ভারতভূমি। যদুবংশীয় মানুষেরা পরাধীন ভারতেরই প্রজা। কংসের নির্মম অত্যাচারে তারা ভয়কাতর। এই মনুষ্যত্বহীন ভয়কাতরতার প্রতি প্রবল ধিক্কার এ রেকর্ডপালার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। নাট্যকার সে যুগের পরাধীন ভারতবাসীর বিদ্রোহ-বিক্ষোভকে অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে চিত্রিত করেছেন আবেগদীপ্ত সংলাপের সাহায্যে। মানবতাবাদের বেদীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন সর্বজাতিক সংগ্রামের এক রূপ। সে যুগে এ রেকর্ডপালার মধ্যে দিয়ে নাটকেরই মতন দেশাত্মবোধের আবেগকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বিপ্লবের জমি তৈরির কাজটি করেছেন নাট্যকার। শব্দ ও যন্ত্রসঙ্গীতের সুচিন্তিত ব্যবহারও লক্ষ্য করার মত। কংস চরিত্রে কণ্ঠ দিয়েছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, বসুদেব চরিত্রে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, কংকন– ধীরেন দাস, দেবকী–রাজলক্ষ্মী ও চন্দনা চরিত্রে সরযূবালা। তাদের অনবদ্য অভিনয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল চরিত্রগুলি।

এ রেকর্ডপালায় ব্যবহৃত পাঁচটি গানই ভীষণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গানগুলি হল :–

১ম গান : জয় জয় ভগবান পাথরের বুকে আনো নবজীবনেরও গান।
২য় গান : কঠোরের ঘুম ভেঙ্গে জাগো।
৩য় গান : রূপ সায়রে সোনার ফসল
৪র্থ গান : আরতি নাও মরমে
৫ম গান : কারা পাষাণ.....জাগো নারায়ণ কাঁদিছে নদীতলে আর্ত জনগণ।

এছাড়া সোনেলা, হিন্দুস্তান রেকর্ডস, কলম্বিয়া প্রভৃতি কোম্পানিও মন্মথর নানা নাট্য রচনা রেকর্ডপালায় ধরে রেখেছেন। সোনেলা (নাট্য পরিষদ) কিউ এস ১৭০ সংখ্যক রেকর্ডে করলেন 'মদনমোহন'। হিন্দুস্তান রেকর্ডস দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় করলেন অভিনয় সমৃদ্ধ 'কবি কালিদাস' এইচ ৯৩৬ সংখ্যক এই রেকর্ড পালাটির সঙ্গীত পরিচালনা করলেন দুর্গা সেন। এইচ ১৫৬০ - ১৫৬৬ সংখ্যক রেকর্ডপালাটি হল 'শ্রীশ্রী সারদামনি'। যার বন্ধনীর মধ্যে 'লীলা-নাটক' কথাটি বিধৃত হয়ে আছে। এই ধর্মীয় 'লীলা' শব্দ প্রয়োগ যে অব্যর্থ হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। রামকৃষ্ণের ভূমিকায় ছিলেন গুরুদাস, গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন পংকজ মল্লিক, সারদামনির ভূমিকায় কণ্ঠ দিয়েছিলেন মলিনা দেবী। এই রেকর্ডপালার প্রত্যেকটি পিঠের শুরুতে মন্মথ রায় ও ধীরেন দাস 'স্থান'-এর পরিচয় দিয়েছেন। এই রেকর্ড-এর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ধীরেন দাস এর নাম পাওয়া গেছে।

।। সাবিত্রী ।।

১৯৪৩ এর ১৬ জুলাই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় 'হিজ মাস্টারস্ ভয়েস' রেকর্ড-এ ২৭০৪--২৭১২ সংখ্যক নয়টি রেকর্ডে গৃহীত হয়েছিল 'সাবিত্রী'। সেই সাবিত্রী সত্যবানের পুরোনো কাহিনী তবু নাট্যরচনায় তাকেই আধুনিক-মননে, চরিত্রায়নে, সংলাপে মন্মথ রায় মর্যাদা দিলেন। অভিনয়ে ছিলেন ঃ--

অশ্বপতী	বীরেন্দ্র কিশোর ভদ্র
দুম্মৎ সেন	অহীন্দ্র চৌধুরী
সাবিত্রী	সরযূবালা
সত্যবান	ধীরেন দাস
অশ্বপতীর স্ত্রী	রাজলক্ষ্মী (বড়)
শৈব্যা	রানীবালা
যম	জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

অন্যান্য চরিত্রে কণ্ঠ দিয়েছিলেন মিহির ভট্টাচার্য, ধীরাজ ও উষা। এই রেকর্ডে ব্যবহৃত তিনটি গান জনপ্রিয়তা পেয়েছিল ঃ--

১ম গান : কুসুম কুমার শ্যামল তনু
২য় গান : বনবিহারিনী চপল হরিনী
৩য় গান : ঘোর ঘনঘটা ছাইল গগনে।

এ রেকর্ড পালায় নাট্যকার সংলাপের সাহায্যে চমৎকার নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন। ঝনঝন করে রেকাবী ফেলে দেওয়ার শব্দ এবং কাঠ কাটার শব্দ প্রয়োগে পরিচালক বাস্তবতার ছোঁয়া এনেছেন।

এছাড়াও 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' নামে শৈলেন চৌধুরীর পরিচালনায় নাট্যকারের আর একটি রেকর্ড পালারও সন্ধান পাওয়া গেছে। সর্বত্রই কি পুরান, কি জীবন কাহিনী বা মৌলিক রচনার সংলাপে, নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টিতে মন্মথ রায় রেকর্ড পালা জগতেও রেকর্ড নাট্যরচয়িতা হিসেবে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন।

মন্মথ রায়ের রেকর্ডপালা

পালার নাম	কোম্পানির নাম	রেকর্ড নম্বর	অভিনেতা-অভিনেত্রী
খনা	মেগাফোন	জে এন জি ১৫০-১৫৮	রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাসুন্দরী, নীহারবালা, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
রামপ্রসাদ	,,	জে এন জি ১৮১-১৮৩	রামপ্রসাদ : মন্মথ রায়, গানে : ভবানী সেন
শকুন্তলা	,,	জে এন জি ২১৩-২১৮	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রবি রায়, তারাসুন্দরী, নীহারবালা
মীরকাশিম	,,	জে এন জি ৫৬৭২-৫৬৭৯	শৈলেন চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, ভূমেন রায়, নরেশ মিত্র, পূর্ণিমা, রানীবালা, প্রভাদেবী
চাঁদসদাগর	এইচ, এম, ভি	২৭৫৫২	ধীরেন দাস, অহীন্দ্র চৌধুরী, সরযূবালা
বিদ্যুৎপর্ণা	,,	এন ১৭০৩৩	সাধনা বসু, মঞ্জু দে, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রীতি মজুমদার, মধু বসু
লায়লী মজনু	,,	এন ৭৩৯৫-৭৪০০	সরযূ, হরিমতী, ধীরেন দাস, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নিভাননী, রবি রায়, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ
সুরথ উদ্ধার	,,	এন ৯৮০৭-৯৮১৪	অহীন্দ্র চৌধুরী, সরযূবালা, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
সাবিত্রী	,,	২৭০৪-২৭১২	বীরেন্দ্র কিশোর ভদ্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, সরযূবালা, ধীরেন দাস, রাজলক্ষ্মী (বড়), রানীবালা, মিহির ভট্টাচার্য, ধীরাজ ভট্টাচার্য, উষা
আনন্দমঠ	—	এন ২৭৬০৪-২৭৬১১	
কারাগার	,,	—	বীরেন্দ্র কিশোর ভদ্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ধীরেন দাস, রাজলক্ষ্মী, সরযূবালা
বাঘাযতীন	,,	—	—
কাফন চোরা	,,	—	—
ক্ষুদিরামের ফাঁসী	,,	—	—
মদন মোহন	সোনেলা	কিউ এস ১৭০	—
কবি কালিদাস	হিন্দুস্থান রেকর্ডস	এইচ ৯৩৬	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশ্রী সারদামনি	,,	এইচ ১৫৬০-১৫৬৬	গুরুদাস, মলিনা
সাধক বামাক্ষ্যাপা	—	—	—

CHITRANGADA

SUPPLEMENT TO

CINE ADVANCE

'CHITRANGADA' MAKES FILM HISTORY

CALCUTTA :—Unprecedented in the history of the Indian motion picture is the phenomenal release of Ashoke Films' presentation of Tagore's literary classic CHITRANGADA at the Metro Cinema of Calcutta, this evening.

Never before in the history of this [illegible] since its inception way back in 1935 [illegible] Indian language has ever been put on the screen. But then this epoch-making [illegible] CHITRANGADA [illegible] demands [illegible] befitting release worthy of its status and prestige. [illegible] greatest poet of our [illegible] Tagore [illegible]





THE SIGNIFICANCE OF CHITRANGADA



CHITRANGADA

A Poem On Celluloid

সিনে অ্যাডভান্স-এ চিত্রাঙ্গদার সমালোচনা

সেলুলয়েডে মন্মথ

'চলচ্চিত্র' নির্মাণের ক্ষেত্রে চিত্রনাট্যের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্যামেরা ও শব্দের দ্বারা পর্দায় যা ফুটে উঠবে চিত্রনাট্য হল তার লিখিত ইঙ্গিত। চিত্রনাট্যের মাধ্যমেই চলচ্চিত্র পরিচালক কলাকুশলীদের নিয়ে জীবন্ত করে তোলেন তার সৃজনমাধ্যমটিকে। বিখ্যাত চিত্রনাট্যবিদ্ আইজেনস্টাইন-এর মতে চিত্রনাট্যকারকে তিনটি বিষয় ভালভাবে জানতে হবে—নাট্যরচনাতত্ত্ব, অভিনয় কৌশল এবং মন্টাজ সৃষ্টি করার সূক্ষ্ম কলা কৌশল। বৃটিশ চলচ্চিত্র সমালোচক রজার ম্যানভেল-এর মতে চিত্রনাট্যকারদের দায়িত্ব তিনটি— বিষয়বস্তু নির্বাচন, বৃত্তগঠন, কাহিনীকে চিত্রের ভাষায় রূপান্তরিত করা। তিনি মনে করেন "The Film is fictional medium, but it is not novel ; it is a dramatic medium, but it is not a drama." চিত্রনাট্যকারকে ছবির ভাষাতেই কল্পনা করতে হবে। রজার ম্যানভেল তাই মনে করেন চিত্রনাট্যকারের দুটি লেখনী—চিত্র লেখনী (ক্যামেরা) এবং শব্দ লেখনী (মাইক্রোফোন)। এ দুটির সঙ্গে যার পরিচয় নেই তিনি ভাল চিত্রনাট্যকার হতে পারেন না। হলিউডের চিত্রনাট্য রচয়িতা লসন তাঁর "Theory and Technique of play-writing and screen-writing" গ্রন্থে মঞ্চনাটক ও চিত্রনাট্য রচনার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য আছে তা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন নাটকের চেয়ে চিত্রনাট্যে দেশকালকে কাহিনীবৃত্তের মধ্যে ধরার ক্ষমতা অনেক বেশি। ক্যামেরার দ্রুত সঞ্চরণ ক্ষমতা এর অন্যতম কারণ। একজন চিত্রনাট্যকার খুব সহজেই পারেন এক কে বহুর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে কিংবা বহুকাল বহুদেশের ঘটনাকে একটি নির্দিষ্ট বৃত্তে সংহত করতে। দ্বিতীয়তঃ চিত্রনাট্যে দ্বন্দ্ব সমান্তরাল অথচ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কার্যধারায় ক্রমবিকশিত হয়। এখানেও তার সহায়ক হয় ক্যামেরা। সে যে গতিতে দেশকালের ব্যবধান মুছে ফেলতে পারে, মঞ্চে সে গতি কোনও দিনই আসবে না। এছাড়া চিত্রনাট্যকার ক্যামেরার বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়কে দেখাবার যে বিশেষ সুযোগটি পান নাট্যকার তা পান না। চিত্রনাট্যকার সার্থক হন তখনই যখন তিনি ব্যঞ্জনাময় চিত্র ও শব্দের সমন্বয়ে ইমেজ—এর সম্পূর্ণ তাৎপর্যকে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারেন। চিত্রনাট্য চিত্রে-নাট্য নয় বলেই তার সংলাপ হবে সংক্ষিপ্ত ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ।

আমাদের দেশে 'চিত্রনাট্য'—এই শব্দটিতে পৌঁছতে কম সময় লাগেনি। ইংরাজির প্রভাবে বেশ কতগুলি শব্দ প্রথম থেকে অবশ্য চালু ছিল। কি নির্বাক যুগ কি সবাক যুগ চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে Scenario বা Film script যাকে বাংলায় বহু নামে ডাকা হয়েছে যেমন 'ফিল্মের জন্য নাটক', 'সিনেমার উপযোগী নাটক', 'চিত্রকাহিনী', 'চিত্রকথা', 'চিত্রনাটক', 'চিত্রনাট্য' তার ব্যবহারই ছিল। নির্বাক যুগে চিত্রনাট্যের 'সাব টাইটেল' দেবার ব্যবস্থা ছিল। প্রথম বাংলা পূর্ণাঙ্গ সবাক কাহিনীচিত্র 'জামাইষষ্ঠী' প্রদর্শিত হয় ১৯৩১ সালের ১১ই এপ্রিল। সবাক যুগের গোড়ার দিকে মঞ্চ নাট্যরীতি অনুযায়ী চিত্রনাট্য রচনা হত। মন্মথ রায় নিজে চিত্রনাট্যের পাঠ্যমূল্য এবং সাহিত্যমূল্য

স্বীকার করেছেন। তিনি মনে করেছেন সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি রসসৃষ্টি হয় তবে চিত্রনাট্যও রসসৃষ্টি করতে পারে। কারণ তিনি জানেন চিত্রনাট্য যে পরিমাণে শিল্প কর্ম, সেই পরিমাণেই তা 'Complete whole with a begining, middle and end' এবং তার উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি করা। কাজেই চিত্রনাট্যও সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে। আইজেনস্টাইন যাকে বলেছেন—Screen play should be as any other form of literature. রবীন্দ্রনাথের মতে ছায়াচিত্র এখনও পর্যন্ত সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেছে। কথাগুলির মধ্যে নানান ব্যঞ্জনা থাকলেও চিত্রনাট্য যে এক জরুরী মাধ্যম সে বিষয় কোনো সংশয় থাকে না।

সত্যজিৎ রায় চিত্রনাট্যকে ছবির কাঠামো বলেছেন—যা ইমেজ ও ধ্বনির দ্বারা পর্দায় ব্যক্ত হবে, চিত্রনাট্য তারই ইঙ্গিত। চিত্রনাট্য এককথায় ছবির স্বরলিপি। তাই যাঁদের ছবির যান্ত্রিক অংশ সম্পর্কে ধারণা কম বা একেবারেই নেই তাঁরা ভালো চিত্রনাট্যকার হতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২ সালে নিজে 'নটীর পূজা' চলচ্চিত্রায়িত করে সফল হননি। কারণ তিনি নাটকের মত ক্যামেরাকে একস্থানে অনড় রেখে চিত্রগ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বাংলা চলচ্চিত্র বরাবরই কাহিনী নির্ভর। কাহিনীর জন্য বরাবরই এই মাধ্যমটি উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প বা কখনো কবিতার কাছে হাত পেতেছে। অনেকসময় শুধুমাত্র চিত্রকাহিনীও রচিত হয়েছে। সে চিত্রকাহিনী বা চিত্রনাট্যের জন্য যাদের ওপর নির্ভরশীলতা গড়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে শুধু যদি নাট্যকারদের কথা ভাবা যায় তো তাঁরা হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, যোগেশ চৌধুরী, নিশিকান্ত বসুরায়, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রমোহন মৈত্র, জলধর চট্টোপাধ্যায়, বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য এবং অবশ্যই মন্মথ রায়।

মন্মথ রায়ের সাতটি নাটক চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল। নাট্যসাহিত্যের মতই চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গেও তাঁর নামটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর নাটক সরাসরি যেমন চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে, তেমনি তিনি চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন, এবং মাঝে মাঝে সংলাপ রচনার কাজও। একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে চিত্রনাট্যকারের ভূমিকা অনেকটা সংযোজনকারির। কারণ চলচ্চিত্রায়ণের মধ্যে অনেকগুলি পর্যায় আছে ; যেমন অভিনয়, চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, আবহ, আলোকপ্রক্ষেপণ, শব্দগ্রহণ, সবকটি পর্যায় সম্বন্ধে জ্ঞান যার করায়ত্ত তিনি অবশ্যই একজন ভাল চিত্রনাট্যকার হবেন।

মন্মথ রায়ের চিত্রনাট্য বা চিত্রকাহিনী রচনার তিনটি পর্ব রয়েছে। ১৯৩৪-১৯৩৮ ; ১৯৩৮-১৯৪৭ এবং ১৯৪৭-১৯৬০।

প্রথম পর্ব : চাঁদসদাগর, মহুয়া, খনা।

দ্বিতীয় পর্ব : অভিনয়, কুমকুম, রাজনর্তকী, মীনাক্ষী, যোগাযোগ, অলকানন্দা,

ঝড়ের পরে, পথ হারার কাহিনী।

তৃতীয় পর্ব : চিত্রাঙ্গদা, ক্ষুধিত পাষাণ।

শুভ ব্রাহ্মস্পর্শকে এই তিনটি পর্বে না রাখার কারণ হল এটি একটি ছোট ছবি।

সবাক যুগের সেই প্রাথমিক পর্বে চিত্রনাট্য কেমন করে লিখতে হবে এ জাতীয় গ্রন্থ বা প্রকাশিত চিত্রনাট্যের দু'-একটি ইংরাজি গ্রন্থের নমুনা ছাড়া চিত্রনাট্যকার বা চলচ্চিত্রকারদের সামনে কিছুই ছিল না। তাই মন্মথ রায় চিত্রনাট্য রচনার কাজটি করেছেন যতটা সম্ভব চিত্রনাট্যের পরিভাষার প্রাথমিক জ্ঞানেব মাধ্যমে এবং তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে। তাঁর 'চাঁদসদাগর' চিত্রনাট্যটির কিছু অংশ হুবহু তুলে দিলে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হবে।

'চাঁদ সদাগর চিত্রনাট্য'

Camera **Scene 1**

L.S. Action or dialogue Sunrise. Fade in:

L.S. Soldiers of Chand Sadagar marching over sandy shore.

M.S. Chand's one Follower standing,

Chand :- কোনও ভয় নেই : জানবে যে চাঁদ অপরাজেয়

এই মহাজ্ঞান মনি

এই মনি আমার সহায়, অগ্রসর হও--

L.S Soldiers advancing forward from camera.

Cut.

Scene 2

Fade in:

Title : নাগলোক সর্পকুল ও মনসা

C.S. Dissolves into Manasa looking & moving out.

Cut.

Scene 2A

L.S Girls sporting in water on a boat, one girl is pushed down into water.

M.S. Girl Floating on water.

C.S. One girl seeing from behind a tree & Laughing.

L.S Boat on Water, sport going on.

Cut.

Scene 2

C.S Manasa sitting on দোলা Neta following her.

[Music]

Scene 2 and 2A Contd :

M.L.S Action & Dialogue, one girl & one boy sporting in water.

C.S Boy swimming and taking girl with him. [Music]
Scene 2

off voice Astik-মা-মা—

M.S Neta talking with Astik near দোলা
Neta : তুমি কি চম্পক নগর থেকে ফিরে আসছ?
চাঁদ সদাগর তোমার মার পূজা করবে?

Astik হ্যাঁ, সে পূজা করবে।
Neta : এবার তবে ঘুম ভাঙ্গাব, এবার তবে ঘুম ভাঙ্গাব।

M.L.S Manasa sleeping, Neta informs her.

Neta : মা ওঠো আস্তিক সংবাদ এনেছে, চাঁদ সদাগর তোমার পূজা করেছে।
(Getting up)
Manasa : এ্যাঁ, পূজা করেছে? চাঁদ আমার পূজা করেছে?
Astk : হ্যাঁ, চাঁদ তোমার বুকে পদাঘাত করেছে।
Manasa : পদাঘাত?

Cut.

এই চিত্রনাট্যের অংশটি থেকে বোঝা যায় এর সংলাপ সংক্ষিপ্ত, সহজ, সরল এবং প্রত্যক্ষ।

চাঁদসদাগর

মন্মথ রায়ের প্রথম ছবি। চাঁদসদাগর মঞ্চে সাফল্যের পর স্বাভাবিকভাবেই চলচ্চিত্রেও তার প্রয়োজন অনুভূত হল। ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের সত্ত্বাধিকারী ছিলেন বাবুলাল চোখানী। অহীন্দ্র চৌধুরী যখন ম্যাডান কোম্পানিতে ছিলেন তখন থেকেই বাবুলাল চোখানীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। এই ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের প্রযোজনায়, নিতাই মতিলালের সুরে ১৭. ৩. ৩৪ এ ক্রাউন টকী হাউসে চাঁদসদাগর মুক্তি পায়। এ ছবির পরিচালক ছিলেন প্রফুল্ল রায়। এ ছবির গান লিখেছিলেন নরেন্দ্র দেব, অখিল নিয়োগী, বসন্ত চট্টোপাধ্যায়। আলোকশিল্পী ছিলেন বিভূতি দাস। শব্দযন্ত্রী চার্লস ক্রীড।

Crown Talkie House

— NOW SHOWING —

BHARAT LAKSHMI PICTURES SUPER PRODUCTION

(All Previous Records Broken)

MANMATHO ROY'S

CHAND SADAGAR

(TALKIE)

The Ever Green Story of Bengal.

THE MAYOR'S OPINION :--

" It is a new Chapter in the Film History of India"

Featuring AHINDRA CHAUDHURY | Direction PRAFULLYA ROY

SATURDAY AND SUNDAY AT 3, 6-15 & 9-30 P.M.

OTHER DAYS AT 6-15 & 9-30 P.M.

COME AND SEE Expectant Thousands Crowding the Street

চাঁদসদাগর ছবির বিজ্ঞাপন

নাগপঞ্চমীর দিন গর্ভস্থ সন্তানের কল্যাণে গোপনে চাঁদের পত্নী সনকা মনসার পূজা করছিলেন। এমন সময় চাঁদ সেখানে এসে বিগ্রহের নীচে ঘট দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ঘট চূর্ণবিচূর্ণ করলেন, পূজার ফুল পদদলিত করলেন। তারপর সেনাপতিকে ডেকে বাণিজ্য যাত্রার আয়োজন করতে বললেন। চাঁদ বাণিজ্যে যাবার পর লখীন্দরের জন্ম হল। সে তার মায়ের কোলে বড় হতে লাগল। ওদিকে চাঁদ দেবীর কোপে তার সপ্তডিঙ্গা মধুকর হারিয়ে এক বন্দরে গিয়ে মালবাহক হয়ে কোনরকমে জীবিকা উপার্জন করতে লাগলেন।

দীর্ঘ বিশ বছর পর বেহুলার পিতামাতা তাদের কন্যাকে নিয়ে চম্পক নগরে শিবরাত্রির দিন যেখানে প্রকাণ্ড মেলা বসে, সেখানে মেলা দেখতে এলেন। লখিন্দর বেহুলাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। চাঁদ এইসময় দেশে ফিরে এলেন এবং বেহুলার সঙ্গে লখীন্দরের বিবাহ স্থির করলেন। এক গনৎকার গননা করে বলেছিল বিবাহের রাত্রে সর্পদংশনে পাত্রের মৃত্যুযোগ আছে। সেইজন্য চাঁদ সাঁতালি পর্বতে এক লৌহবাসর তৈরী করে সেইখানে পুত্রের বিবাহ দিলেন। কিন্তু পুত্র বাঁচল না। লৌহবাসরে কাল-নাগিনীর দংশনে তার মৃত্যু হল।

বেহুলা মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে চললো। কেটে গেল ছয়

ছয়টি মাস। গলিত মাংসাবৃত দেহ নিয়ে ভেসে চলার কালে মনসা বেহুলাকে দেখা দিয়ে বললেন, চাঁদ যদি মনসার পূজা করেন তবেই লখীন্দর বাঁচবে।

এদিকে ছয়মাস অপেক্ষা করে যখন চাঁদ লখীন্দরের শ্রাদ্ধ করতে যাবেন তখন লখীন্দরের কঙ্কাল হাতে ফিরে এল বেহুলা, বললো 'বিধাতা আমায় বিধবা করেনি বাবা, বিধবা করলে তুমি।' একথা শুনে চাঁদের মন ভেঙ্গে গেল। তিনি বললেন, যে হাতে তিনি তাঁর ইষ্টদেবতার পূজা করেছেন, সে হাতে কেমন করে অন্য দেবতার পূজা করবেন? তখন মনসা আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে বাম হাতেই তাঁর পূজা করতে বললেন। চাঁদ বাম হাতে একটি পদ্ম নিয়ে মনসার পায়ে দিলেন। দেখতে দেখতে লখীন্দরের কঙ্কাল পদ্মে পরিনত হল আর পদ্ম হতে লখীন্দর পুনর্জীবন লাভ করলেন।

চরিত্রলিপি

চাঁদ সদাগর	:	অহীন্দ্র চৌধুরী
লখীন্দর	:	ধীরাজ ভট্টাচার্য
আস্তিক	:	পুষ্কর বাগচী
ধন্বন্তরী	:	ননীগোপাল মল্লিক
নেড়া	:	নরেশ ঘোষ
দুর্যোধন	:	সত্যেন্দ্র ভদ্র
কালু সর্দার	:	জহর গঙ্গোপাধ্যায়
ধনা	:	কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
মনা	:	সন্তোষ দাস
বৈতালিক	:	সত্যচরণ চক্রবর্তী
মনসা	:	দেববালা
নেতা	:	নীহারবালা
সনকা	:	পদ্মাবতী
অমলা	:	উষারানী
বেহুলা	:	শেফালিকা (পুতুল)
সুনন্দা	:	সুহাসিনী
ছলনা	:	নীহারবালা (ছোট)
পালা	:	ইন্দুবালা।

'গানের সুরের আসনখানি'-তে পংকজ কুমার, মন্মথ রায়ের চাঁদ সদাগরের সংলাপ রচনাকে বৈশিষ্ট্যহীন ও চিত্রনাট্য রচনাকে অগোছাল বলে উল্লেখ করলেও চাঁদ সদাগর চলচ্চিত্রটি জনগণের মন জয় করেছিল। প্রথম দিনের টিকিট বিক্রি হয়েছিল ১৫০০ টাকার মতন, সুদীর্ঘকাল সম্ভবত বাহান্ন সপ্তাহ ছবিটি চলেছিল বলে, অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এটি সে সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য নজীর।

এই ছবিটি সম্বন্ধে ADVANCE (১৩. ৩. ৩৪) লিখেছিল : 'Mr. Roy should

have introduced the benefit of the masses.'

চাঁদ সদাগরের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। লখীন্দরের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য, মনসার ভূমিকায় দেববালা, বেহুলার ভূমিকায় শেফালিকা, সনকার ভূমিকায় পদ্মাবতী, নেতার ভূমিকায় নীহারবালা, অভিনয়ে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। নাট্যকার সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ছবিখানি সম্পর্কে সমালোচকগণ যাই বলুক কেন—ছবিখানি ভাল হয়েছিল।' ফরোয়ার্ড ১৯.৩.৩৪- এ সম্পর্কে যে তথ্য হল "........The street in front of the house was awfully crowded. Even the traffic was interfered with for some time."

চলচ্চিত্রে পরিচালক নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের অধিকারী হলেও এর জন্যে চিত্র নাট্যকার মন্মথ রায়ের অবদানকে খর্ব করার কোন কারণ নেই।

ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের
—বিজয়-বৈজয়ন্তী—
চাঁদ সদাগর
গত ১৭ই মার্চ্চ বেলা ৩টায় কলিকাতার মেয়র, ডেপুটি মেয়র,
সাংবাদিক ও বিশিষ্ট নাগরিকগণের সমক্ষে—
—ক্রাউন টকি হাউসে—
সর্ব্বপ্রথম মুক্তিলাভ করিল।
প্রথম দিনের বিক্রয় ১৫০০্ টাকার উপরে

৩টার ম্যাটিনী প্রদর্শনীর বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ প্রায় ৫০্
মেয়র স্থাপিত দেশবন্ধু স্মৃতি ভাণ্ডারে অর্পিত হইয়াছে।

চাঁদ সদাগর - ছবি বিজ্ঞাপন

মহুয়া

মন্মথ'র দ্বিতীয় চিত্রকাহিনী। সম্পাদনা : নিউ থিয়েটার্স। কাহিনী : মন্মথ রায় পরিচালক : হীরেন বসু : সুরকার : কিষন চাঁদ বড়াল : আলোকচিত্রী : সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায় শব্দযন্ত্রী :- লোকেন বসু, বানী দত্ত : ১লা সেপ্টেম্বর চিত্রা চিত্রগৃহে এটি মুক্তি পেয়েছিল।

দিন শেষের অস্তমান সূর্যকিরণে রাঙা আকাশ। এমন সময়ে বামাকান্দার ক্ষীণকায় খালে এক সারি ডিঙ্গি দেখা দিল। ডিঙ্গিতে রয়েছে বিশত্রিশ জন অরণ্যবাসী বেদে। নৌকা থেকে নেমে তারা গাঁয়ের পথ ধরল। তাদের সঙ্গে আছে সুন্দরী মহুয়া। আজ গ্রামের জমিদার নদেরচাঁদকে ভানুমতির খেলা দেখিয়ে তার অনেক পুরস্কার পাওয়ার কথা। সেদিন ঝুলনের রাত--সে রাতে মহুয়া ও নদেরচাঁদ উভয়ে উভয়কে দেখে মুগ্ধ হল। পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসল।

মহুয়া আসলে নাকি বেদের মেয়ে নয়। বহুদিন আগে যখন বামাকান্দার জমিদার কীর্তিধ্বজ বেঁচে ছিলেন, তখন এই বেদের দলের সর্দার হুমড়ো গ্রামে এসে তার একমাত্র শিশুকন্যাকে হরণ করে নিয়ে যায়। কন্যাহারা জমিদার মৃত্যুকালে তাঁর সব সম্পত্তি দিয়ে যান নদেরচাঁদকে এবং বলে যান যদি সেই কন্যা কোনদিন ফিরে আসে তো সব সম্পত্তি তার হবে। দীর্ঘ ষোল বছর পর এখবর হুমড়োর কানে গেল। সে তখন তার বিশ্বাসী অনুচরদের এবং মহুয়াকে সঙ্গে করে সেখানে এল। তার আশা সে হবে জমিদার। কিন্তু তার সে আশা পূর্ণ হল না। অবশেষে মহুয়াকে নিয়ে হুমড়ো ফিরে গেল জয়ন্তী পাহাড়ে।

এদিকে নদেরচাঁদ মহুয়াকে ভুলতে পারল না। অনেক কষ্টে সে তাকে উদ্ধার করল বেদেদের কবল থেকে। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে হিংস্র বেদের দল ছুটলো তাদের পেছনে। তিনবছর পর তারা যখন নদেরচাঁদদের ধরল তখন নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে আত্মঘাতিনী হল মহুয়া আর নদেরচাঁদ প্রাণ দিল হিংস্র বেদেদের হাতে।

চরিত্রলিপি

নদেরচাঁদ	:	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
হুমড়ো	:	অহীন্দ্র চৌধুরী
সুজন	:	ভূমেন রায়
মানিক	:	বোকেন চট্টোপাধ্যায়
রতন	:	অহী সান্যাল
পালক	:	ফুল্ল নলিনী
মহুয়া	:	মলিনা

ছবিটি নিউ থিয়েটার্সের প্রথম 'অরণ্যচিত্র' (Jungle picture) । মন্মথ রায় সাক্ষাৎকারে বলেন ছবিটি ভালো হয়েছিল। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, ভূমেন রায় ভালো অভিনয় করেছিলেন। মৈমনসিংহ গীতিকার সেই পরিচিত কাহিনী হলেও নাটকীয় মুহূর্ত, চরিত্রচিত্রন ও সংলাপ রচনায় নাট্যকার মন্মথরায়ের অবদান সে যুগে চমকিত করেছিল অনেককে।

শুভব্রাহ্মস্পর্শ

ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের ছোট একটি হাসির ছবি। ২৯ ডিসেম্বর ১৯৩৪ খৃঃ ছায়াচিত্রগৃহে মুক্তি লাভ করে। কাহিনীকার : অখিল নিয়োগী : পরিচালনায় : মন্মথ রায়, চিত্রগ্রহন : বিভূতি দাস।

চরিত্রলিপি

কর্তা	:	চিত্তরঞ্জন গোস্বামী
মানিক	:	জহর গঙ্গোপাধ্যায়
উড়ে চাকর	:	আশু বোস
গিন্নী	:	ইন্দুবালা
মিনু	:	ডলি দত্ত

অত্যন্ত নির্মমভাবে এ ছবিটি সমালোচিত হয়। ছবিটি সম্পর্কে 'দিপালী' লিখেছিল : "The story provides good material for a side spliting comedy, but unfortunately neither the scenario writer nor the director has been able to take full advantage of the same" (11.1.1935)

এই কথাচিত্রে জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন গোস্বামী ও ইন্দুবালা সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন।

অভিনয়

'অভিনয়' চলচ্চিত্রটি প্রসঙ্গে মধু বসু তাঁর 'আমার জীবন'-এ বলেছেন : "তখন (১৯৩৭) নাট্যকার মন্মথ রায় আমাদের ওখানে প্রায়ই আসা যাওয়া করত।........আমি ও সাধনা অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে প্রায়ই সিনেমায় যেতাম। ছবিটার নাম মনে নেই তবে নাটকীয়তার চূড়ান্ত ছিল তাতে— গল্পটা আমার ও সাধনার দুজনেরই ভাল লেগেছিল। একদিন মন্মথকে এই গল্পের কাঠামোটা বললাম. তাকে বললাম এই কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে আমাদের পরবর্ত্তী ছবির জন্য একটা গল্প তৈরী করে ফেল। সে ছবির নামও দেওয়া হয়ে গেল—'অভিনয়'।......১৯৩৭ সালের মে মাসের শেষের দিকে শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের সঙ্গে 'অভিনয়' এর কন্ট্রাক্ট সই হয়ে গেল।" (আমার জীবন / মধু বসু)

শ্রী ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স মন্মথ রায়ের কাহিনী অবলম্বনে 'অভিনয়' চলচ্চিত্রায়িত করলো। পরিচালনা : মধু বসু : সুরকার : হিমাংশু দত্ত : গীতিকার : হেমন্ত গুপ্ত : আলোকচিত্রী : সম্পাদক : বিভূতি দাস : শিল্পনির্দেশক : সুধাংশু চৌধুরী : শব্দযন্ত্রী : চার্লস ক্রীড : সম্পাদক : শ্যাম দাস : পরিবেশক সংস্থা : এম্পায়ার টকী ডিস্ট্রিবিউটরস্। ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ সালে রূপবানীতে এটি প্রথম মুক্তি পায়।

কিষণগড়ের তরুণ জমিদার হীরকের হাতে দেদার টাকা। হঠাৎ একদিন তার হাতে

এসে পড়ল 'জাগ্রত ভারত' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা। তার কভারে রয়েছে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী মনীযা চৌধুরীর ছবি। হীরক বন্ধুদের জানালো, মেয়েটি তার চেনা। মেয়েটির বাবা পীতাম্বর চৌধুরী ছোট বেলায় তাকে পড়াতেন। বন্ধুরা বিশ্বাস করল না। হীরক তখন বাজি ধরে মনীযাকে বিয়ে করে প্রমাণ করল সে মিথ্যে বলেনি। স্রোতের মত দিন যায়। হীরকের মনে পলি পড়ে। নীড় বাঁধবার ব্যাকুলতা তার ছিল কিন্তু মমতা ছিল না। তাই মনীষা স্বামীর কাছে সবকিছু পেল না। ফলে দুজনের মধ্যে গড়ে উঠল ব্যবধানের দীর্ঘ প্রাচীর। মনীষার জন্মদিনে মনীষার বাবার লেখা নাটক শকুন্তলা অভিনীত হবে। শকুন্তলা করবে মনীষা, আর দুষ্মন্ত হীরক। নিমন্ত্রণ পত্র গেল রতনগড়ের রাজা ও তার মেয়ে রত্নার কাছে। এই রত্নার সঙ্গে একদিন হীরকের বিয়ের কথা হয়েছিল। ভুল বোঝাবুঝির ফলে সে বিয়ে হয়নি। বহুদিন পর দুজনের দেখা হওয়ায় পুরোনো ভালবাসা পল্লবিত হল। মনীষা উপলব্ধি করল ব্যাপারটা এবং স্বামীর ঘর ত্যাগ করল. তার আত্মহত্যার মিথ্যা খবর সে চারিদিকে রটিয়ে দিল নতুন পরিচয় নিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে বাঁচবার তাগিদে। ইতিমধ্যে মেট্রোপলিটন থিয়েটারের নতুন নাটক কচ ও দেবযানীতে নবাগতা ইন্দ্রানীর নাম ফিরতে লাগল লোকের মুখে মুখে। কাগজে ইন্দ্রানীর ছবি দেখে চমকে উঠল হীরক। ছুটে গেল কলকাতায়। মঞ্চে দেবযানীকে দেখেই সে বুঝলো ইন্দ্রাণীই তার স্ত্রী মনীষা। নানাভাবে তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে হীরক ব্যর্থ হল। অবশেষে অনেক টাকা দিয়ে সে মেট্রোপলিটনের কর্তা হয়ে বসল। আবার 'শকুন্তলা'র অভিনয় হলো। এতে মনীষা শকুন্তলা ও বাসব রায় ছদ্মনামে হীরক দুষ্মন্ত চরিত্রটিতে অভিনয় করল। শকুন্তলায় শেষ রজনীর অভিনয়ের দিন লোকে লোকারণ্য। পীতাম্বরও এসেছেন। বাসব ও ইন্দ্রানীর অভিনয়ের খাতিতে ঈর্ষিত হয়ে রত্না হীরককে ধিক্কার দেয়। মনীষার ইচ্ছা নাটকের শেষে সে পিতার কাছে নিজের পরিচয় দেবে—বলবে সে আত্মহত্যা করেনি। তারপর মনীষা ও হীরক পীতাম্বরকে নিয়ে চলে যাবে কিষণগড়। নাটক শেষে মনীষার ড্রেসিংরুমে এসে দাঁড়ায় রত্না—মনীষার কাছে হীরককে ভিক্ষা চায় সবকিছুর বিনিময়ে জানায় সে তার বাগদত্তা বধূ। মনীষা ধীর পায়ে ড্রেসিংরুম ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

চরিত্রলিপি

মনীষা	:	সাধনা বসু
পীতাম্বর চৌধুরী	:	অহীন্দ্র চৌধুরী
হীরক রায়	:	ধীরাজ ভট্টাচার্য
রতনগড়ের রাজা	:	বিভূতি গাঙ্গুলী
রাজকুমারী রত্না	:	প্রতিমা মুখোপাধ্যায়
অজয় মল্লিক	:	প্রীতি কুমার মজুমদার
থিয়েটার ম্যানেজার	:	তুলসী লাহিড়ী

বুকিং ক্লার্ক	সত্য মুখোপাধ্যায়
কুঞ্জ বাবু	ললিত মিত্র
ফিল্ম ডিরেকটর	ভানু রায়
ইন্সিওরেন্স এজেন্ট	নবদ্বীপ হালদার
ভজা	বিজয় মজুমদার
অভিনেতা	রবি রায়
হীরকের ম্যানেজার	প্রভাত সিংহ
অভিনেত্রী লাবণ্য,	সুলেখা চট্টোপাধ্যায়

EMPIRE TALKIE DISTRIBUTORS' MOST SENSATIONAL ACQUISITION

"ABHINAYA"

BREAKING ALL RECORDS AT

RUPABANI

—:o:—

SHREE BHARAT LUXMI PICTURES' unsurpassed screen triumph, ABHINAYA steps into its 4th glorious week from this Saturday at Rupabani. The enthusiastic crowds are besieging the house day after day to see this picture again and again because the film aims as much at the heart as at the eye. It is built on an original story by Mr. Manmatha Roy, a noted figure in modern Bengali literature. The writer has given in this story compelling emotional rhetoric, a full measure of incident, plausibility and wit. He displays great artistry in varied portrayal of characters and dramatically gripping conceptions of situations.

Mrs. Sadhona Bose plays the feminine lead and shows her innate sense of characterization. Sj. Ahindra Chowdry, Dhiraj Bhattacharjee, Tulsi Lahiri, Satya Moukerjee, Prid Mazumdar, Bibhuti Gauguly are included in the cast.



SADHONA BOSE

'দি ম্যুভি মিরর' এর সমালোচনা



অভিনয় ছবিতে মনীষা ও হীরকরূপী সাধনা বসু ও ধীরাজ ভট্টাচার্য

বিভিন্ন পত্রপত্রিকা সে সময়ে 'অভিনয়' ছবিখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল। আনন্দবাজার পত্রিকা (১০.৯.৩৮) লিখেছিল : 'অভিনয়' ছবিখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করিয়া পারিতেছি না....চলচ্চিত্রের উপযোগী এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর কাহিনী আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি।......ইহা শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচায়ক.......এই কাহিনীকে অতি নিষ্ঠার সহিত পর্দার ওপর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন শ্রীযুক্ত মধু বসু।"

'দীপালি' (৮.৯.৩৮) লিখেছিল "ভারতীয় চিত্রের মধ্যে 'অভিনয়' এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল।"

'স্বদেশ' (৯.৯.৩৮) এ লেখা হল : "সহজ সরলভাবে ছবিখানি আরম্ভ হয়ে শেষ হয়ে গেল : কোথা দিয়ে যে পৌনে তিন ঘণ্টা কেটে গেল বুঝতেও পারলাম না।"

'আজাদ' লিখেছিল : (৯.৯.৩৮) : "অনায়াসে যে কোন বিলাতী ছবির সঙ্গে অভিনয়এর তুলনা করা যেতে পারে।"

পরিচালনা, অভিনয়, সেট নির্মানের প্রভৃত প্রশংসা করে Filmland লিখেছিল—"Its Excellence is so great that it out-shines not only all Indian Pictures...... but many foreign pictures too, lack in brilliance before it."

Hindusthan Standard লিখেছিল : 'The treatment accorded to the story very favourably compare with American movies."

ধূমকেতু (২৩ ভাদ্র ১৩৪৫) লিখল :—'অভিনয়' চিত্রের গল্পাংশ খুবই জোরালো। এবং তা হয়েছে বলেই ছবি হিসেবে তার মূল্য গিয়েছে বেড়ে। ....যেটাকে আধুনিক

সাহিত্যে দুঃসাহস বলা হয়, সেটাকে মন্মথবাবু কারুর মুখ চেয়েই নিজের মুখ বন্ধ করেননি। মনীষা স্বামী ত্যাগ করে এল অন্তত একথা লিখতে তার হৃৎকম্প হয়নি।'

'অভিনয়' প্রসঙ্গে মধু বসু লিখেছেন "দীর্ঘ আলোচনার পর দেখা গেল যে শেষ তিন চারটি দৃশ্যই যত গণ্ডগোল করছে—অর্থাৎ গল্পটা মিলনান্তকভাবে শেষ হতে পারে না। মন্মথ ও আমি আগে যা ভেবেছিলাম তাই ঠিক। গল্পের ধারা যেভাবে গেছে তাতে ট্রাজেডীতেই শেষ হওয়া উচিত। পরদিন আমি ও মন্মথ আবার আলোচনা করলাম—একটা কাঠামো ঠিক হলো এবং মন্মথ সেইভাবে দৃশ্যগুলি লিখল।" (মধু বসু / আমার জীবন)

সামান্য অদবলবদল করলে চলচ্চিত্রে তার সামগ্রিক রূপ কিভাবে একেবারে পরিবর্তিত হয়ে যায় তার উদাহরণ হিসাবে ঘটনাটি এখানে তুলে ধরা হল। প্রথমে যেটি তোলা হয়েছিল সেটির কাহিনী ছিল এইরকম :

মনীষা বিরাট ধনী তরুণ হীরক চৌধুরীর স্ত্রী। ভুল বোঝাবুঝির ফলে মনীষা হীরকের কাছ থেকে চলে এসে মঞ্চে অভিনয় করে। হীরক চৌধুরী নিজের ভুল বুঝতে পেরে মনীষার কাছে ফিরে আসে। দুজনের মধ্যে ঠিক হয় যে মনীষার আজই অভিনেত্রী জীবনের শেষরাত্রি। আজ অভিনয়ের শেষে দুজনে আবার নিজের বাড়ীতে ফিরে যাবে—এবং মনীষার পিতা পীতাম্বর চৌধুরীর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করবে। তিনি তাদের আশীর্বাদ করবেন।

গল্পের পরিবর্তিত রূপটি হল এইরকম। মধু বসুর জবানীতেই তুলে দেওয়া হল "অবশ্য সংলাপগুলি সঠিক আমার মনে নেই, তবে মোটামুটি এইরকম। হীরক আর মনীষার মধ্যে স্থির হয়েছে আজই অভিনয় শেষে ওরা ফিরে যাবে।........মেকআপ রুমে এসে ঢুকলো রাজকুমারী রত্না। এসে দাঁড়াল মনীষার কাছে। মনীষা জানতে চাইল সে কে এবং কি চায়?

রাজকুমারী রত্না বলল	:	আমি চাই হীরককে।
মনীষা বলল	:	তার মানে? আমি তাকে ভালবাসি—তাকে আমি ছাড়তে যাব কেন?
রাজকুমারী বলে	:	আপনি অভিনেত্রী আপনার জীবনে এরকমের প্রেম বহু এসেছে এবং আসবেও, শুধু হীরককে আমায় ভিক্ষা দিন। আমি তার বাগদত্তা।
মনীষা বলে	:	আপনার বাজে কথা শুনবার আমার সময় নেই। পথ ছেড়ে দিন আমার তাড়া আছে। বলে দরজা দিয়ে বেরুনর চেষ্টা করে।
রাজকুমারী রত্না বাধা দিয়ে বলে	:	দাঁড়ান, আমার কথা শুনে যান। আমি হীরকের বাগদত্তা নই—আমি তার ভাবী সন্তানের মা হতে চলেছি।

মনীষার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এতদিন কল্পনায় যে আকাশ কুসুম সে রচনা করেছিল তা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

রাগে দুঃখে উত্তেজনায় মনীষা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। বাইরে করিডোরে হীরক মনীষার জন্য অপেক্ষা করছিল।

মনীষাকে দেখে হীরক বলল : এত দেরী কেন? চল—

মনীষা : কোথায় যাবো?

হীরক : সেকি। সব ভুলে গেলে? অভিনয়ের শেষে আমরা দুজনে গিয়ে তোমার বাবাকে প্রণাম করবো?

মনীষা : তুমি কি আমার কথা সত্যি বলে ধরে নিয়েছিলে?

হীরক : তার মানে? কি বলছ তুমি?

মনীষা : (হেসে) আমি তো তোমার সঙ্গে অভিনয় করছিলাম—

অভিনয়—কি নিখুঁত অভিনয়। (সাধনার অভিনয়ে সে অভিব্যক্তি অপূর্ব প্রকাশ পেয়েছিল।)

হীরক স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মনীষা গাড়ীর ভেতরে বাবার কাছে ছুটে যায় তাঁর কোলে মুখ লুকায়, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। পীতাম্বর চৌধুরী সস্নেহে কন্যার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেন : আমি জানতাম মা তুই আসবি। আমি জানতাম. হীরক এসে দেখে পীতাম্বর বাবুর গাড়ী আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে।" (আমার জীবন : মধু বসু)

এই অংশটুকু নতুন করে আবার শুটিং করা হয়েছিল। তারপর সম্পাদনা করে ছবিটি দেখা কালে সবাই উপলব্ধি করলেন ছবিটির রূপই বদলে গেছে।

খনা

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের ছবি 'খনা'। এটির সংলাপ রচয়িতা মন্মথ রায়। এটি ১২ নভেম্বর ১৯৩৮ সালে উত্তরায় প্রথম মুক্তি পায়। প্রযোজক : বি . এল. খেমকা। পরিচালক : জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরকার : ধীরেন দাস। গীতিকার : নীহারবিন্দু সেনগুপ্ত। আলোকচিত্রী : দ্রোণাচার্য। শিল্প নির্দেশক : মতিলাল। শব্দযন্ত্রী : এ গফুর। সম্পাদক : সুকুমার মুখোপাধ্যায়। পরিবেশনা : কাপূরচাঁদ ফিল্মস্।

সাগরের জলে ভেসে আসা অজ্ঞাতকুলশীল অনাথ মিহির সুনন্দার স্নেহের ছায়ায় বেড়ে ওঠে। সিংহলের রাজকন্যা খনার গণনায় মিহিরের পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত নেই কিন্তু শুভদিন না আসা পর্যন্ত সে তা প্রকাশ করেনা তাতে অমঙ্গল হবে মিহিরের কিন্তু মিহির তো সে কথা জানেনা। সে 'অজ্ঞাত কুলশীল' এ গ্লানি সহ্য করতে পারেনা। খনা শুধু তাকে বলে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত মিহিরের পিতা, আর তার জন্মভূমি ভারতবর্ষ।

মিহিরকে স্বামীত্বে বরণ করে খনা সিংহলের সিংহাসন ত্যাগ করে রওয়ানা হয় সাগরের অপরপারে ভারতবর্ষে তার শ্বশুরের ভিটার উদ্দেশ্যে। বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনীতে পৌঁছে সকলকে তাক লাগিয়ে দেয় মিহির। জ্যোতিষার্ণব বরাহের মতে যে গণনা অসম্ভব তাকে সম্ভব বলে প্রমাণিত করে সে। বরাহ বৃদ্ধ বয়সে এই অপমান সহ্য করতে পারেন না, অস্থির হয়ে ছুটে যান তাদের গৃহে। খনা তাঁকে প্রবোধ দেয়, বলে তিনি যেন তাঁদের পুত্র ও পুত্রবধূ রূপেই দেখেন। বরাহ অবাক হন। এদিকে কামন্দক যখন উত্তেজিত হয়ে মিহিরের ঘরে আগুন দেয় তখন খনা বরাহকে জানায় মিহির তাঁরই পুত্র।

সম্রাট বিক্রমাদিত্য বরাহকে একটি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করে পাঠালে বরাহ তার উত্তর দিতে অসমর্থ হয়ে খনার সাহায্য নিলেন। ছদ্মবেশী সম্রাট তা জানতে পারলেন। বিদ্যায় ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হল খনার স্বর্ণমূর্তি। কামন্দক একথা বরাহকে উল্টোভাবে বোঝাল মিহির সংবাদের সত্যমিথ্যা যাচাই না করে খনাকে বলল যে সে তাদের কুগ্রহ। তারই জন্য পিতার এত অপমান। কামন্দকও জানান যে সে এই পরিস্থিতিতে পড়লে জিভ কেটে ফেলত।

এমন সময় বিক্রমাদিত্য শোভাযাত্রা করে এলেন তাঁর নবরত্ন সভায় খনাকে নিয়ে যাবেন বলে। এলেন সিংহলের মন্ত্রী ও সেনাপতি তাদের শূন্য সিংহাসনে খনাকে অভিষিক্ত করার জন্য। কিন্তু লাঞ্ছনায় অপমানে—অভিনন্দন আর প্রশস্তির ঊর্দ্ধে চলে গেছেন খনা—সে শেষ পর্যন্ত তার জিভ কেটে ফেলেছে।

চরিত্রলিপি

বরাহ	:	অহীন্দ্র চৌধুরী
খনা	:	ছায়াদেবী
মিহির	:	সুশীল রায়
ধরনী	:	দেববালা
মদনিকা	:	অরুণা
তরলিকা	:	আঙুরবালা
কামন্দক	:	অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
ভৈরব	:	ধীরেন মুখোপাধ্যায়
বিক্রমাদিত্য	:	সমর ঘোষ
সিংহলরাজ	:	কালী ঘোষ
সিংহলরানী	:	মনোরমা
কবি কালিদাস	:	প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'খনা' ছবিটি প্রসঙ্গে দীপালি (১৮ নভেম্বর, ১৯৩৮) লিখেছে : The story has been neatly told on the screen and the climaxes of the picture

have been ably handled. The Kamandak and Madanika episode should not have been dragged to such a length.

'বাতায়ন' (১৯.১১.৩৮) ছবিটির বিজ্ঞাপন অংশে বলেছে : "রস সৃষ্টির দিক থেকে খনার কাহিনীটি বেশ সার্থক। জনসাধারণের মনকে আকৃষ্ট করবার প্রচুর উপকরণ এর মধ্যে আছে।"

'বাঙলা' বলেছে (১৮.১১.৩৮) : "অনেক প্রতিষ্ঠানের অনেক ছবির চেয়ে দর্শকোপভোগ্য হইয়াছে এবং সেযুগে প্রচুর দর্শক আকর্ষণ করিয়াছে।"

অহীন্দ্র চৌধুরী, ছায়াদেবী, সুশীল রায়, সমর ঘোষ, বীরেন মুখোপাধ্যায়, দেববালা ভাল অভিনয় করেছিলেন। চিরপরিচিত কাহিনী হলেও চিত্রনাট্য রচনার ব্যাপারটি তখনও পর্যন্ত পরীক্ষিত হচ্ছিল। পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ চলচ্চিত্রকাররা নিজেরাই চিত্রনাট্য রচনা করে নিয়েছেন। এঁদের পূর্বসূরী হিসেবে ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দেবকী কুমার বসু, প্রমথেশ বড়ুয়ার নামও করতে হবে। কিন্তু যে সমস্ত নাট্যকাররা চিত্রনাট্য রচনায় উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিধায়ক ভট্টাচার্য, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং নিতাই ভট্টাচার্যের নাম যেমন স্মরণীয় তেমনি তিন ও চারের দশকে মন্মথ রায়ের নামও মনে রাখতে হবে।

কুমকুম

সাগর মুভিটোনের ছবি। কাহিনী : মন্মথ রায়। পরিচালক : মধু বসু। সুর : তিমিরবরণ। গীতরচনা : হেমন্ত গুপ্ত। আলোকচিত্রী : জয় গোপাল পিল্লাই। শিল্প নির্দেশক : সুধাংশু চৌধুরী। শব্দযন্ত্রী : শান্তি প্যাটেল। নৃত্য পরিচালনা : সাধনা বসু। সম্পাদক : গোবিন্দ বনভালী। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ সালে রূপবানীতে প্রথম মুক্তি পায়। এ ছবির হিন্দী ভার্সানটি মার্চ মাসে ১৯৪০ সালে ইম্পিরিয়াল ছবিঘরে মুক্তিলাভ করে।

সূর্যশংকর সরল, বন্ধুবৎসল, অমায়িক ভদ্রলোক। পতিপ্রাণা স্ত্রী আর ছোট মেয়ে কুমকুমকে নিয়ে তাঁর সংসার। দেশসেবা ছিল তাঁর ব্রত। শ্রমিক ছিল তাঁর প্রাণ। 'শ্রমিক সাহায্য ভাণ্ডার' নামে এক ফাণ্ড করে তিনি লাখ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। সেই টাকায় শ্রমিকদের কিছু ব্যবস্থা করার আগেই তাঁকে রাজনৈতিক কারণে জেলে যেতে হয়। জেলে যাবার আগে তিনি তাঁর আশ্রিত বন্ধু জগন্নাথের হাতে দিয়ে যান লক্ষ টাকার চেক, ব্যাংকের অন্যান্য চেক ও কাগজপত্র, নাটক 'মহাক্ষুধা'র পাণ্ডুলিপি এবং স্ত্রী ও শিশুকন্যার ভার।

বছরের পর বছর জেলে কাটানোর সময়ই একদিন খবর পান স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়। জেল পালিয়ে ঘরে এসে দেখেন স্ত্রী মারা গিয়েছেন আর ছোট কুমকুম তার মৃতা মায়ের বুকে

পড়ে কাঁদছে। বন্ধু জগন্নাথ পলাতক। সেই বন্ধুকে খুঁজে বার করার জন্য ফেরারী আসামী সূর্যশংকর কন্যার হাত ধরে জনারণ্যে হারিয়ে যান।

দীর্ঘদিন পর কলকাতা শহরের বিখ্যাত ধনী ও ধন-সাম্যবাদী নেতা লোকপূজ্য জগদীশ প্রসাদকে চিনতে পারেন সূর্যশংকর। জগদীশ তাঁকে দেখে ভীত হয় কিন্তু আমল দেয় না। উপরন্তু পুলিশে দেবার ভয় দেখায়। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ঘরে ফেরেন সূর্যশংকর।

'যুবসংঘ' ক্লাব দীনদরিদ্রের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করে। সেই ক্লাবের সভাপতি জগদীশ প্রসাদ। সম্পাদক প্রদীপ জগদীশের পুত্র চন্দনের বন্ধু। তারা দুজনে একদিন বস্তীতে গেল দরিদ্রের জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হতে। সেখানে কুমকুমকে দেখে চন্দন তাকে ভালবেসে ফেললো এবং বন্ধু প্রদীপের সহায়তায় তাদের বিবাহও হল। সূর্যশংকর এ বিয়েতে সব জেনেও রাজি হলেন কেবল প্রতিশোধ নেবার জন্য। কুমকুম বলল, বৌ হয়ে আমি ওদের বাড়ী গিয়ে, গরীবের রক্ত শুষে জমানো সব টাকা গরীবদের মধ্যেই বিলিয়ে দেব।

এ সময়ে আর একটি নারী নাম তার শিপ্রা—সে কাহিনীর মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। অতীতে চন্দনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল। বিয়ের পর কুমকুম জগদীশ প্রসাদের আলমারী থেকে প্রথমে তার বাবার পাণ্ডুলিপি সরায়, তারপর নিজের অলংকার এবং আর যা কিছু মূল্যবান জিনিষ সব সরিয়ে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। চন্দন সব জানল কিন্তু প্রতিবাদ করল না। প্রেম দিয়ে তাকে জয় করবার চেষ্টা করল।

চরিত্রলিপি

কুমকুম	:	সাধনা বসু
চন্দন	:	ধীরাজ ভট্টাচার্য
জগদীশ	:	রবি রায়
সূর্যশংকর	:	ভূজঙ্গ রায়
প্রদীপ	:	প্রীতি মজুমদার
শিপ্রা	:	পদ্মাদেবী
প্রিয়া	:	কিরণদেবী
শুক্লা	:	বিনীতা গুপ্তা
স্টেজ ডিরেকটার	:	বেচু সিংহ
তিলোত্তমা	:	লাবণ্য দেবী
প্রাঃ সেক্রেটারী	:	অবনী মিত্র
পঞ্চপাণ্ডব	:	মনি চট্টোপাধ্যায়
		শশধর চট্টোপাধ্যায়
		যশেবন্ত আগামী
		ললিত রায়
		সুশান্ত মজুমদার

অনেকে মনে করেন এই কুমকুম ছবিতেই সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রচারিত হয়েছে। The Illustrated Weekly of India (17.3.40) অত্যন্ত প্রশংসা করে লিখেছে, পরিচালক মধু বসু অসাধারণ।

অবশ্যই তার কিছুটা দাবি করতে পারেন নাট্যকার, কাহিনীকার মন্মথ রায়।

সে যুগের অনেক পত্রপত্রিকায় 'কুমকুম' ছবিটি সম্পর্কে প্রশংসা সহ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 'বাতায়ন'-এ (৯.২. ৪০) লেখা হয় : "কুমকুম : কুমকুম সারা শহরে ঘরে ঘরে, পথে পথে, জনতার মুখে মুখে কুমকুম। ....সব দিক থেকেই কুমকুম যে বাংলা চিত্রজগতে নব অধ্যায়ের সূচনা করবে একথা বললে অতিশয়োক্তির অপরাধ হবে না।"

'দীপালি' (৮.২. ৪০) লিখল :—"সাহিত্যের মত রঙ্গালয় ও ছায়াচিত্র ও জাতির জীবনের মুকুর.....ছায়াচিত্রের ও জনসেবার একটি দিক আছে।........আধুনিক যুগে ক্যাপিটালিজম্ ও লেবারে যে সংঘাত বাধিয়াছে, ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত গণস্বার্থের যে বিরোধ শুরু হয়েছে......শ্রমিক ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা আজ সমগ্র জাতির সম্মুখে যে মর্মান্তিক প্রশ্ন তুলিয়াছে, 'কুমকুম' যেন সেই প্রশ্নের প্রতীক।

'Bombay Chronicle"' (15.3.40) এ খাজা আহমেদ আব্বাস লেখেন :-'In her very first Hindusthani film Sadhana Bose takes a place in the first rank of our screen artistes......'

The Illustrated Weekly of India 17.3.40, The Sunday standard 10.3.40, The Times of India, Bombay 15.3.40 ছবিটির প্রভূত প্রশংসা করেছিল।

কাহিনীর মধ্যে ধনীদের দ্বারা দরিদ্র শোষনের চিত্র আছে বলেই হয়ত ছবিটা উপভোগ্য হয়েছিল। মধু বসুর সঙ্গে সঙ্গে তাই এর অনেকটা প্রশংসা কাহিনীকার নাট্যকার মন্মথ রায় অবশ্যই পাবেন।

ওয়াদিয়া মুভিটোনের ছবি। 'রাজনর্তকী'ই প্রথম ভারতীয় ছবি যা তিনটি ভাষায় ওঠে। বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজি। ভারতে প্রস্তুত প্রথম সবাক ইংরাজি ছবি হবার গৌরবও এই ছবিটির রয়েছে। ছবিটির প্রযোজক : জে. বি. এইচ ওয়াদিয়া। কাহিনী : মন্মথ রায়। পরিচালনা : মধু বসু। সুর : তিমিরবরণ। গীতরচনা : অজয় ভট্টাচার্য। আলো : যতীন দাস, প্রবোধ দাস। শিল্পনির্দেশনা : সুধাংশু চৌধুরী। শব্দযন্ত্রী : রায় রাম, বরুচা, মিনু থামপল। নৃত্য পরিকল্পনা : সাধনা বসু। সম্পাদনা : শ্যাম দাস। ১৯৪১ সালের ৮ই মার্চ বাংলা 'রাজনর্তকী' 'উত্তরা'—ছবিগৃহে প্রথম মুক্তি পায়।

কাশী শ্রীধাম থেকে প্রভুপাদ মহাপ্রভুর পদধূলি বহন করে আনছেন। যুবরাজের অভিষেকের দিনে তা সেবকজনের মধ্যে বিতরণ করা হবে। মনিপুর রাজনর্তকী মধুছন্দা যুবরাজের নয়নমনি। রাজনর্তকী মধুছন্দা যুবরাজকে ভালবাসেন গভীরভাবে। তিনি

রাধামোহনের মন্দিরে পূজারিনীর বেশে দয়িত যুবরাজের কল্যাণ কামনায় পূজা দিতে গেলে, পূজারীর আদেশে সেখানে প্রবেশ করতে পারেন না। পাহাড়ী ঝর্নার ধারে মধুছন্দার দেখা হয় ক্ষ্যাপা বাউলের সাথে। রাজনটী সেখানেই নারায়ণকে পূজা নিবেদন করেন।

ইতিমধ্যে মণিপুর রাজপুত্রের জন্য ত্রিপুরারাজ্যের কন্যার বরমাল্য বয়ে আনে দূত। হয় বরমাল্য গ্রহণ নয় যুদ্ধ—এ সংবাদও সে বহন করে আনে। বৃদ্ধ রাজা মনিপুর রাজপুত্রের অভিষেক এবং বাগদান সম্পন্ন করার আয়োজন করেন। রাসপূর্ণিমার দিনে যুবরাজ যখন মুগ্ধচিত্তে রাধাবেশী রাজনটীর নৃত্য দেখছেন সে সময় হঠাৎ সেখানে রাজ সেনাপতি টায়া'র আবির্ভাব ঘটে। তিনি তাকে রাজাদেশ জানান এবং বলেন প্রভুপাদ যে পদধূলি বহন করে আনছেন তা যেন যুবরাজ সযত্নে নিয়ে আসেন। যুবরাজ অনুরোধ এড়িয়ে যান। রাজা এসে তাকে ভর্ৎসনা করেন। এমন সময়ে সেখানে প্রভুপাদের আবির্ভাব ঘটে। তিনি রাজনটীর রাসলীলা দেখে মুগ্ধ হয়ে আশীর্বাদ করতে গেলে রাজা তাকে জানান যে ঐ কন্যা একজন সামান্য নটী। তিনি ঘৃণায় সরে আসেন।

যুবরাজ রাজনটীকে জীবনসঙ্গিনী করবেন—এই প্রতিশ্রুতি দেন এবং বৃদ্ধ রাজাকে বলেন ত্রিপুরারাজের যুদ্ধের স্পর্ধাকে গ্রহণ করতে। প্রভুপাদ দেশের এবং যুবরাজের প্রাণের স্বার্থে নটীকে অনুরোধ করেন যুবরাজকে ত্যাগ করতে। নটী রাজি হয়ে তিনি নিদারুণ দুঃখে যুবরাজকে ফিরিয়ে দেন। যুবরাজ ক্ষুব্ধ হয়ে রাজদরবারে রাজনটী মধুছন্দাকে নৃত্য করবার জন্য আদেশ দেন। মধুছন্দা সে আদেশ রক্ষা করে। প্রভুপাদ বুঝতে পারেন মধুছন্দার প্রেম পবিত্র-স্বর্গীয়। তাই তিনি তাকে মহাপ্রভুর পদধূলি অর্পণ করেন। মধুছন্দার এই সম্মানে মনিপুরবাসী ক্ষিপ্ত হয়—তারা উন্মাদের মত ছুটে আসে তাকে হত্যা করতে, কিন্তু পারে না। জয় হয় প্রেমের, জয় হয় মধুছন্দার।

চরিত্রলিপি

মধুছন্দা	:	সাধনা বসু
কাশীশ্বর	:	অহীন্দ্র চৌধুরী
চন্দ্রকীর্তি	:	জ্যোতিপ্রকাশ
জয়সিংহ	:	মন্মথ রায়
প্রিয়া	:	প্রতিমা দাশগুপ্তা
রিয়া	:	বিনীতা মজুমদার
আচংফা	:	প্রীতি মজুমদার
মহাকাল	:	বিভূতি গঙ্গোপাধ্যায়
টায়া	:	মনি চট্টোপাধ্যায়
ত্রিপুরদূত	:	প্রভাত সিংহ
ক্ষ্যাপা	:	মৃণাল ঘোষ

রতন	বেচু সিংহ
পূজারী	হেম গুপ্ত
রাজপ্রহরী	অবনী মিত্র
রাজঘোষক	প্রতাপ মুখোপাধ্যায়
বৈরাগী	বিজয় দাস
আয়ি	রাজকুমারী
জনৈক বৃদ্ধ	আহম্মদ

'রাজনর্তকী'তে "মন্মথ রায় জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। চলচ্চিত্রে এটি তাঁর প্রথম অভিনয়। এ ছবিটি তিন সংস্করণে হয়েছিল। ডাবিং পদ্ধতিতে নয়। বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজির তিন সংস্করণের জন্যে প্রত্যেকটি শট তিনবার করে নিতে হয়েছিল। প্রথমে হিন্দি সংস্করণের কাজ শুরু হয়। বোম্বাই এর অপেরা হাউসে ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ সালে মুক্তি লাভ করে। বোম্বাই ও মাদ্রাজের কিছু কাগজ হিন্দি রাজনর্তকী দেখে নানা কথা লেখে। Times of India (20.2.41) লেখে :- 'Rajnartaki is a beautiful picture'. The Evening news of India, "Bombay" (20.2.41) 'Sadhana Bose in the tittle role is a dream of grace and beauty come to life.......'

The Hindu, Madras (28.2.41) লেখে :–"................Director Madhu Bose has given us one of the most remarkable of Indian productions."

বাংলা 'রাজনর্তকী' দেখে আনন্দবাজার লিখল (২২. ৩. ৪১) "রাজনর্তকী....একসঙ্গে এই ছবিখানির তিনটি সংস্করণ বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভালো হইয়াছে।

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, কলকাতা (২১. ৩. ৪১) লিখল :–"Rajnartaki is definitely a remarkable producton in the annals of the Indian movies."

'রাজনর্তকী'র ইংরাজী সংস্করণের নাম হল "The Court Dancer"। এটি ১৯৪১ সালের ২ অক্টোবর বোম্বাই ও কলকাতার মেট্রো চিত্রগৃহে একই দিনে মুক্তিলাভ করে। এটি ভারতে তৈরী প্রথম সবাক ইংরাজি ফিল্ম। কলম্বিয়া পিকচার্স কর্তৃক আমেরিকায় প্রথম প্রদর্শিত হয় (১৯৪০)।

আনন্দবাজার পত্রিকা (3.10.41), The Motion picture Magazine Bombay (October,1941), Evening News, Bombay (5.10.41). The Times of India, Bombay (8.10.41), The Sunday Statesman, Calcutta 5.10.41 Amrita Patrika, Calcutta (5.10.41) ছবিটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে।

মীনাক্ষী

নিউ থিয়েটার্সের ছবি। কাহিনী : মন্মথ রায়। পরিচালক : মধু বসু। সুর : পংকজ মল্লিক। গীতরচনা : হেমন্ত গুপ্ত। আলো : বিমল রায়। শিল্প-নির্দেশনা : সৌরেণ সেন। শব্দযন্ত্রী : বানী দত্ত। সম্পাদনা : হরিদাস মহলানবীশ। পরিবেশনা : প্রাইমা ফিল্মস। ১২ই জুন ১৯৪২ সালে 'চিত্রা' চিত্রগৃহে ছবিটি প্রথম মুক্তি পায়।

কাহিনী

মাঝ রাতে ফ্ল্যাটে ফিরে অমিতাভ রায়ের নেশা কেটে যাবার পর দেখেন তার তেরো নম্বর ফ্ল্যাটে সুন্দরী তরুনী। মেয়েটির নাম মীনাক্ষী। জানা গেল মেয়েটির ষাট বছরের বৃদ্ধ কাকা নামজাদা চোখের ডাক্তার শুভংকর চক্রবর্তীর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে বিয়ের নামে বলি দেবার ব্যবস্থা করেছে। তাই সে পালিয়ে এসেছে। ঘটনাচক্রে প্রমাণ হয় মীনাক্ষীর সব কথা সত্যি। সে আশ্রয় পায় অমিতাভের ফ্ল্যাটে। হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হয় মীনাক্ষীর কাকা, কিন্তু অমিতাভের তাড়া খেয়ে সে পালাতে বাধ্য হয়। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় একই বাড়িতে রাত কাটানো নিয়ে। তাই বাড়ির সামনের একটি বেঞ্চে তারা রাত কাটানোর ব্যবস্থা করে। বেঞ্চটার নাম দেয় 'ভালবাসা'। তাদের মনেও বোধহয় এই ভালবাসার ছোঁয়া লাগে। ইতিমধ্যে আবার মীনাক্ষীর কাকা আসে—টাকা দাবি করে। ভয় দেখায় পুলিশে খবর দেবার। অমিতাভ ভুল বোঝে। মীনাক্ষীকে অপমান করে চেক লিখে দেয়। মীনাক্ষী তা ছিঁড়ে ফেলে ও নিখোঁজ হয়। কার্তিকপুরে এসে সে ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াবার চাকরি নেয়। জমিদার গিন্নীর কাছে পায় মাতৃস্নেহ। হঠাৎ একদিন তাকে অবাক করে দিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ায় অমিতাভ। মীনাক্ষী জানতে পারে অমিতাভ ঐ বাড়িরই ছেলে। তার মনে নেমে আসে বিষাদের ছায়া। মীনাক্ষীর পুরোনো চোখের অসুখ—চোখে দেখতে না পাওয়ার উপসর্গ দেখা দেয়। তাই কাউকে কিছু না বলে সে কার্তিকপুর ত্যাগ করে। এসে দাঁড়ায় সেই বেঞ্চ 'ভালবাসা'র সামনে এবং মনের দুঃখে সে মূর্ছা যায়। এদিকে হঠাৎই ডাক্তার শুভংকর এসে তাকে উদ্ধার করে লেক নার্সিংহোমে নিয়ে যায়।

এদিকে মীনাক্ষীকে হারিয়ে অমিতাভ কলকাতায় ফিরে মেতে ওঠে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রায়। ঘনিষ্ঠতা হয় একটি মেয়ের সঙ্গে—মেয়েটি লেক নার্সিংহোমের নার্স, নাম উল্কা। প্রায় অন্ধ মীনাক্ষীর চোখ অপারেশনের পর ভাল হয়। দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার পর সে দেখে তাকে নিয়ে যাবার জন্য দাঁড়িয়ে অমিতাভ আর নার্স উল্কা।

চরিত্রলিপি

মীনাক্ষী	:	সাধনা বসু
ডাঃ শুভংকর	:	অহীন্দ্র চৌধুরী
রাধা গোবিন্দ	:	পরেশ মিত্র

অমিতাভ	:	জ্যোতিপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
যুধিষ্ঠির	:	কৃষ্ণচন্দ্র দে
দুর্গা	:	দেববালা
ভুলো	:	প্রীতি মজুমদার
উল্কা	:	পান্না
অরুণা	:	সন্ধ্যারানী
ইন্সপেকটর	:	সন্তোষ সিংহ
মদনিকা	:	রেনু রায়
পত্রিকা ম্যানেজার	:	সত্য মুখোপাধ্যায়
পণ্ডিত	:	হরিমোহন
অন্নপূর্ণা	:	রাজলক্ষ্মী (বড়)
হারাধন	:	বোকেন চট্টোপাধ্যায়
ম্যানসনের ম্যানেজার	:	বেচু সিংহ
কেষ্টধন	:	কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়

এছাড়া তুলসী চক্রবর্তী, আশু বসু, কুমার মিত্র, সিধু গঙ্গোপাধ্যায়, মীরা দত্ত, অপর্না দাস, উমা মুখোপাধ্যায়, মঙ্গল চক্রবর্তী, বিজয়, কার্তিক দে, মাঃ মিনু চৌধুরী প্রভৃতি অভিনয় করেন।

যোগাযোগ

এম.পি. প্রোডাকসনের ছবি 'যোগাযোগ'। কাহিনী : মন্মথ রায়। চিত্রনাট্যকার : প্রেমেন্দ্র মিত্র। পরিচালনা : সুশীল মজুমদার। গীতিকার : প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলেন রায়। আলোকচিত্রী : অজিতসেন। শব্দযন্ত্রী : জে. ডি. ইরানী। সম্পাদক : সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়। পরিবেশনা : ডিল্যুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটরস্। ছবিটি ১৯৪৩ সালের ১৭ এপ্রিল শ্রী, পূরবী, ও পূর্ণ ছবিঘরে প্রথম মুক্তি পায়।

জমিদার দীনদয়াল সান্যাল স্ত্রীর স্মৃতির রক্ষার জন্য স্থাপন করেছেন মমতাময়ী দাতব্য চিকিৎসালয়। ভুজঙ্গ তার সহকারী। কিন্তু ভুজঙ্গর মতলব দীনদয়ালকে সরিয়ে নিজেই হাসপাতালের কর্তা হয়। দীনদয়ালের একমাত্র পুত্র জয়ন্ত কলকাতায় ডাক্তারী পড়ে। পড়ার চেয়ে আড্ডা দেয় বেশি, খরচও করে বেশি। বাবার কাছে যা পায় তাতে তার চলেনা। ফলে মতলব করে সে বাবাকে চিঠি লেখে। চিঠিতে জানায় বিবাহবাসর থেকে দেনা-পাওনার গোলমালে বরকে বরকর্তা উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মেয়েটিকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। সেই বৌ অসুস্থ। তার চিকিৎসার জন্য টাকা চাই। কিন্তু এতে উল্টো বিপত্তি হল। বাবা টাকা না পাঠিয়ে জানালেন তিনি নিজেই বৌকে দেখতে এবং আর্শীবাদ করতে কলকাতায় আসছেন।

জয়ন্ত বিপদে পড়ে তার পরিচিত নার্স প্রতিভার কাছে যায়। প্রতিভা প্রথমে রাগ করলেও পরে টাকার বিনিময়ে একবেলা জয়ন্তর বৌ সেজে অভিনয় করতে রাজি হয়ে যায়। বৌ দেখে দীনদয়াল ভীষণ খুশি। অসুস্থ বৌকে একা ফেলে তিনি কলকাতা ছেড়ে যেতে চান না। শেষ পর্যন্ত প্রতিভাকে সঙ্গে নিয়েই তিনি দেশে ফেরেন। দেশে ফিরে সংসারের ভার তুলে দেন তারই হাতে। তাছাড়া ভুজঙ্গকে বলেন, প্রতিভাকে হাসপাতালের কাজ শেখাতে। ভুজঙ্গ এই প্রস্তাবে খুশি হয় কারণ সে প্রতিভার রূপে মুগ্ধ। জয়ন্তর বিয়ের ব্যাপারেও ভুজঙ্গর সন্দেহ দেখা দেয়। তাই সে তিনকড়িকে কলকাতায় পাঠায় এ ব্যাপারে খোঁজ নিতে। তিনকড়ি কলকাতা থেকে ফিরে এসে ভুজঙ্গকে সবকিছু জানাবার পর সে মরিয়া হয়ে ওঠে প্রতিভাকে পাবার জন্যে। হাসপাতালের ম্যানেজিং বোর্ডকে জানায় দীনদয়াল উন্মাদ—তার হাতে এত রোগীর জীবন মরণের ভার দেওয়া যায় না। এদিকে প্রতিভা সব বুঝতে পেরে জয়ন্তকে টেলিগ্রাম করে। জয়ন্ত দেশে এসে মেডিকেল বোর্ড দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে প্রমান করে দীনদয়াল উন্মাদ নয়। ভুজঙ্গর ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে যায়। প্রতিভা ভাবে তার দুদিনের খেলাঘর বুঝি ভেঙ্গে যায়। এবার তার বিদায়ের পালা। বিদায় নিয়ে সে স্টেশনে যায়। কিন্তু না, ফিরে যেতে পারেনা সে, খেলা খেলা বৌ থেকে সত্যিকারের বৌ হয়ে ফিরে আসতে হয় তাকে।

চরিত্রলিপি

দীনদয়াল	:	অহীন্দ্র চৌধুরী
জয়ন্ত	:	জহর গঙ্গোপাধ্যায়
প্রতিভা	:	কানন দেবী
ভুজঙ্গ	:	ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
নিস্তারিণী	:	দেববালা

এছাড়া অভিনয় করেন ইন্দিরা রায়, সন্ধ্যারানী, মনোরমা, রবি রায়, রবীন মজুমদার, পূর্ণিমা, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, হীরেন বোস।

'যোগাযোগ' ছবিটি প্রসঙ্গে 'সবারে আমি নমি' গ্রন্থে কাননদেবী যা বলেছেন তা থেকে জানা যায় এ ছবির নায়ক ছিলেন জ্যোতিপ্রকাশ। তাঁর মৃত্যুর পরে জহর গাঙ্গুলী এই চরিত্রটি করেন। "যেদিন 'যোগাযোগ'-এর সেই শেষ না হওয়া ছবি প্রোজেকশনে দেখানো হোলো, সেদিন স্টুডিওর সবাই যত মুগ্ধ হয়েছে তার চেয়ে বেশি হায় হায় করেছে। এমন ছবি সার্থক সমাপ্তিতে পৌঁছতে পারল না। কিন্তু সকলের সব আশঙ্কাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে শুধু 'হিট' নয়, 'সুপার হিট' ছবির তালিকায় স্থান পেয়েছিল এ ছবি।" শুধু অভিনয় নয়, গানও ছিল এ ছবির প্রধান আকর্ষণ। এ ছবিতে কাননদেবী রবীন মজুমদারের সংস্পর্শে আসেন। তিনি এ ছবিতে কানন দেবীর নায়ক ছিলেন। কিন্তু আফশোষ এ ছবি শেষ হয়নি। এ ছবি থেকে মন্মথর শৃংখলা ও শিল্পবোধের পরিচয়

পাওয়া যায়। সময়কালে তো বটেই, পরবর্ত্তীকালেও ছবিটির পুনর্মুক্তিতে একটি ইংরাজী পত্রিকা লেখে ঃ–"....and the whole house hummed with tune of "If you don't like me don't like me don't give your heart."–ভাল না লাগে তো দিওনা মন' গানটি সেযুগে মন ভরিয়ে দিয়েছিল দর্শকদের।

এ ছবিতে পরিচালক সুশীল মজুমদারের কৃতিত্বও অনস্বীকার্য। ছবিটির হিন্দি রূপ বোম্বের এক ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে বিক্রি করে মুরলী চট্টোপাধ্যায় প্রচুর অর্থ পান। কানন দেবী তাঁর 'সবারে আমি নমি'–গ্রন্থে লিখেছেন "লাভের একটা মোটা অংশ আমিও পাই"। কাহিনীকার মন্মথ রায় প্রসঙ্গে সকলেরই নীরবতা লক্ষণীয়।

'যোগাযোগ' সে যুগের একটি 'হিট' ছবি। রূপমঞ্চে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'সাজাহান' নামে। পরে ছবি হলে নাম হয় 'যোগাযোগ'। ছবি জনপ্রিয় হলে এই কাহিনী নিয়ে মন্মথ রায় একটি পূর্ণাঙ্গ লেখেন ঃ–"মমতাময়ী হাসপাতাল"। হিন্দিতে এই কাহিনী নিয়েই গড়ে ওঠে হিন্দি চিত্র 'হসপিটাল'।

মন্মথবাবুর এই কাহিনী সম্পর্কে অস্বাভাবিকতা ও অবাস্তবতার অভিযোগ উঠেছিল। তার উত্তরে অবশ্য মন্মথ রায় বলেছিলেন, 'অবাস্তবতা ও সাফল্য একসঙ্গে আসে কি করে!' এ ছবি দর্শকদের আনন্দ দিয়েছিল প্রচুর।

অলকানন্দা

রূপাঞ্জলি পিকচার্সের ছবি। প্রযোজক : সরোজ মুখোপাধ্যায়। কাহিনী ও সংলাপ : মন্মথ রায়। চিত্রনাট্যকার : দেবকী বসু। পরিচালনা : রতন চট্টোপাধ্যায়। সুরকার : ধীরেন্দ্র মিত্র। গীতিকার : রবীন্দ্রনাথ, লতিকা চট্টোপাধ্যায়, যুথিকা মুখোপাধ্যায়, শান্তিদেবী, বটকৃষ্ণ বসু। আলোকচিত্রী : ধীরেন দে। শিল্প নির্দেশক : শুভ মুখোপাধ্যায়। শব্দযন্ত্রী : নৃপেন পাল। নৃত্যপরিকল্পনা : পিটার গোমস্। সম্পাদক : রবীন দাস। পরিবেশনা : অ্যাসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটারস্। ছবিটি ১৯৪৭ সালের ৮ আগষ্ট, মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে প্রথম মুক্তি পায়।

বোস এণ্ড কোম্পানির মালিক আনন্দময় বসুর কারবার দেখতেন তার কপট বন্ধু ও অংশীদার যুধিষ্ঠির রায়। আনন্দময় শিলং এর মনোরম বাড়ি 'অলকানন্দা'য় থাকতেন স্ত্রী অলকাকে নিয়ে। ১৯২১ এর তীব্র অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় আনন্দময়ের জেল হয়ে গেল কয়েক বছর। জেল থেকে যখন ছাড়া পেলেন তখন বন্ধু যুধিষ্ঠিরের কারসাজিতে কোম্পানির ভরাডুবি হয়েছে, বাড়ি অলকানন্দাও বিক্রি হয়ে গেছে। এই সময়েই অলকার মৃত্যু হয়। তার শেষকৃত্য সেরে চার বছরের মেয়ে নন্দিতাকে বুকে করে আনন্দময় বেরিয়ে পড়েন।

তারপর বিশ বছর কেটে গেছে। 'অলকানন্দা' এখন শিলং এর সেরা হোটেল। সুপরিচিত ঔপন্যাসিক মৃদঙ্গ রায়ই বর্তমানে তার মালিক। একদিন এই আদর্শবাদী

ঔপন্যাসিক বাস্তবের সন্ধানে নিরুদ্দিষ্ট হলেন। ইতিমধ্যে মানস রক্ষিত নামে একটি ভাগ্যান্বেষী যুবক শিলং এ এসে হাজির হল। তার চেহারার সঙ্গে মৃদঙ্গ রায়ের সাদৃশ্য ছিল। ফলে সে হোটেলে বেড়াতে আসা অভিনেত্রী রাকাদেবীর নজরে পড়ল। এদিকে আনন্দময়ও তার মেয়ে নন্দিতাকে নিয়ে অলকানন্দায় এসে উঠেছেন। মৃদঙ্গ রায়ও ছদ্মনামে সেখানে এসেছেন তার নতুন উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। নন্দিতা ছিল তার উপন্যাসের ভীষণ ভক্ত। তাই যেদিন তার নকল মৃদঙ্গ রায়ের সঙ্গে আলাপ হল সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। এদিকে রাকা ও মানসের সম্পর্কও নিবিড় হতে লাগল। রাকা সুসাহিত্যিক মৃদঙ্গ রায়ের সর্ম্বধনার জন্য এক সভা ডাকল। সভায় নাচ গানের পর রাকা দেবী যখন নকল মৃদঙ্গ রায়কে তার শ্রদ্ধাঞ্জলি উপহার দিতে যাচ্ছে এমন সময় কলকাতা থেকে মৃদঙ্গ রায়ের ম্যানেজার এসে হাজির। ফলে সবকিছু জানাজানি হয়ে গেল এবং নন্দিতা ও মৃদঙ্গ, মানস ও রাকার মিলনে কোন বাধা থাকল না।

এতে অভিনয় করেছেন

অহীন্দ্র চৌধুরী, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমীলা ত্রিবেদী, পূর্ণিমা, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ কুমার, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, রবি রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, ডাঃ হরেন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, আশু বোস, চিত্রা, সত্য ঘোষ, জীতেন গঙ্গোপাধ্যায়, ক্ষিতীশ, বৃন্দাবন।

'অলকানন্দা' চিত্রকাহিনীতে যতটা সম্ভাবনা ছিল তার রূপান্তর ঘটেনি। না হলে নিছক কৌতুক চিত্র না হয়ে এটি একটি ভালো ছবি হতে পারত।

ঝড়ের পরে

এভারেস্ট ফিল্মস্ এর ছবি। কাহিনী : মন্মথ রায়। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অপূর্ব মিত্র। সুরকার : অনিল বাগচী। গীতিকার : তড়িৎ ঘোষ, চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক। আলোকচিত্রী-সুধীর বসু। শিল্পনির্দেশক : গোপী সেন। শব্দযন্ত্রী : পরিতোষ বসু। সম্পাদক : বৈদ্যনাথ বন্দোপাধ্যায়। পরিবেশনা : সেন্ট্রাল ফিল্মস ডিস্ট্রিবিউটারস্। ১৯৪৭ সালের ১৩ই জুন ছবিটি শ্রী, পূরবী, রূপম ছবিঘরে প্রথম মুক্তি পায়।

চণ্ডীপুর গ্রামে পশুডাক্তার বলে যাকে সবাই খেপায় আসলে তার নাম ডাঃ পশুপতি সামন্ত। তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার। ম্যালেরিয়ায় লোক যখন উজাড় হয়ে যাচ্ছে—তখন চড়া দামে কুইনাইন বিক্রি করে পশু ডাক্তার ফেঁপে উঠল। আর রং গোলা জল খেয়ে গরীবের প্রাণ যেতে লাগল। দুলাল মিত্র পশু ডাক্তারের একমাত্র সহকারী। সে এ দৃশ্য সইতে পারেনা। তাই গভীর রাতে দুলালের বাড়িতে আর একটি হাসপাতাল বসে। পশু ডাক্তারের লুকোনো ওষুধ গোপনে নিয়ে এসে সে নিজের অভিজ্ঞতা মত গরীব রোগীদের চিকিৎসা করে। তারা দুহাত তুলে দুলালকে আর্শীবাদ

করে। পশু ডাক্তার এখবর জানতে পেরে দুলালকে পুলিশে দেয়। দুলালের জেল হয়। রুগ্না মা বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে ভেবে জেল ভেঙে পালায় দুলাল। চুরি করে ওষুধ এনে মাকে সারিয়ে তোলে সে। পুলিশ আসার আগেই সে পালায়। চলন্ত ট্রেনে এক অসুস্থ ভদ্রলোককে সে বাঁচায়। কৃতজ্ঞ ভদ্রলোক ও তার মেয়ে তাকে অন্তত একদিনের জন্য তাদের বাড়িতে খেতে বলে। দুলাল রাজি হয়। কিন্তু পুলিশের দৃষ্টি সে এড়াতে পারে না—তাই দুলালকে পালাতে হয় আবার। কিন্তু যেদিন সে ধরা পড়ে সেদিন তার বিচারের প্রয়োজন হয়না কারণ ইতিমধ্যেই ধরা পড়ে যায় আসল আসামী পশু ডাক্তার।

এতে অভিনয় করেছেন

ছায়াদেবী, জ্যোৎস্না গুপ্তা, বানী, অজন্তা কর, করালী, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, রবি রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, রঞ্জিত রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, আশু বসু, নরেশ বসু, বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়, পাঁচুবাবু, মহীতোষ চট্টোপাধ্যায়, নির্মল রুদ্র, শৈলেন ভড়, ক্ষিতীশ শেঠ, রাজকুমার লাহিড়ী, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, আদিত্য মুখোপাধ্যায়।

পথহারার কাহিনী

মন্মথ রায়ের 'বিবাহ বিশারদ' কাহিনীটি 'পথহারার কাহিনী' নামে চলচ্চিত্রে রূপ দেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। এটি মুক্তি পায় ২.৬.৫০, রূপবানী, অরুণা ও ইন্দিরায়।

পরিবেশক : অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন। প্রযোজনা : নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কাহিনী : মন্মথ রায়ের 'বিবাহ বিশারদ' অবলম্বনে। পরিচালক : দেবনারায়ণ গুপ্ত। গীতিকার : শ্যামল গুপ্ত। সংগীতকার : রামচন্দ্র পাল। চিত্রশিল্পী : বংকু রায়। শব্দযন্ত্রী : সত্যেন দাশগুপ্ত। সম্পাদক : বিশ্বনাথ মিত্র। শিল্প নির্দেশক : দামোদর পিল্লাই। নৃত্যপরিকল্পনা : পিটার গোমস্।

অভিনয়ে ছিলেন

ধীরাজ ভট্টাচার্য, অহীন্দ্র চৌধুরী, শ্যাম লাহা, ফণী রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, আশু বসু, বনানী চৌধুরী, প্রীতিধারা, সুদীপ্তা, অলকা, সুহাসিনী, তারা প্রমুখ।

চিত্রাঙ্গদা

রবীন্দ্রনাথের কাহিনী। চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন মন্মথ রায়। স্বাধীনতার পূর্বে যে কোন ভারতীয় দর্শকের মেট্রোতে প্রবেশাধিকার ছিল না। বাংলা ছবির প্রদর্শন যোগ্যতাও নয়। এই ছবিটি প্রথম বাংলা ছবি যা ১৯৫৫ সালে মেট্রোতে মুক্তি পায়। ছবিটির প্রযোজক ইন্দ্রসেন রায়। পরিবেশক : ডিল্যুকস্ ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটরস্।

Cine Advance (7.4.55) 'চিত্রাঙ্গদা' সম্বন্ধে লিখেছে :- "A poem on celluloid. "Chitrangada makes film history."

এই ছবিটি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু ঐ পত্রিকাতেই বলেছেন—"Chitrangada is

one of the loveliest plays of Rabindranath. In it he has transformed one of the lesser anecdotes of the 'Mahabharata' into a work of universal significance. The theme is the corelation between youth, beauty and love, the strife that exists between these and the harmony imposed on them by the deeper resources of the human spirit.

As Tagore sees her. Chitrangada is a woman who recognizes in her youthful blossoming not only an accomplice but also a rival and competitor. It is her brief and beautiful youth that compels Arjun's surrender, but it is also the same beauty that prevents Arjun from seeing his mistress as she really is. Chitrangada is the story of a woman for whom love is not an end in itself, but a means towards harmonizing the contending elements of the flesh and the spirit. She is modern. She is eternal. She is the ideal Woman.

এ সময়ে ছবিটি প্রশংসা পেয়েছিল খুব। ছবিটি সম্পর্কে Cine Advance আরো লেখে (7.4.55) 'Never before in the history of this Amercian historic show house since its inception way back in 1935, an Indian film in an Indian language has ever been put on its screen. But then this epoch-making epic of a film Chitrangada verily demands this befitting release worthy of its status and prestige.'

মন্মথ'র সাতটি জনপ্রিয় নাটক যা সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছিল তা চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল। এছাড়া তিনি পাঁচটি চিত্রকাহিনী ও দুটি চিত্রনাট্য লিখেছেন। সাতটির মধ্যে প্রথমটি পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর ছবি। সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্রে রেখে লিখেছেন চারটি চিত্রকাহিনী। পাশাপাশি তার চারটি নাটকও চলচ্চিত্রে পরিবর্তিত করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় তিনি যে দুটি চিত্রনাট্য রচনা করেছেন সে দুটিই রবীন্দ্রকাহিনী নির্ভর। এই সূত্রে আরো পাঁচটি চিত্রনাট্যের খবর পাওয়া যাচ্ছে যা ছবি হতে গিয়েও হয়নি। সেগুলি হল :

১) রাত্রির তপস্যা।
২) চাষীর প্রেম।
৩) বৃত্রাসুর।
৪) শ্রীশ্রীমা।
৫) স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রথমটি বাঘাযতীনের জীবনকাহিনী। ১৯৫০ এর অক্টোবর সংখ্যায় এটি সংহতি পত্রিকায় প্রকাশিত। দ্বিতীয়টি নাটক। চিত্রনাট্যে নামকরণ হয় 'কৃষাণ', ১৯৫৩ এর

শারদীয়া, রঙ্গালয় পত্রিকায় প্রকাশিত। তৃতীয়টি 'বৃত্রাসুর' নাটক থেকে তিনি চিত্রনাট্য করেছিলেন সম্ভবত ১৯৫৩তেই। 'শ্রীশ্রীমা' এবং 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে দুটি ভিন্ন ছবি হবার কথা ছিল। এর মধ্যে শেষ ছবিটির পরিচালক ছিলেন সৌমেন মুখোপাধ্যায় (সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র)। পুরোনো দিনের কাগজে তার বিজ্ঞাপন পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু এ ছবিটি শুরু হলেও শেষ হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারে প্রচার প্রযোজক থাকাকালীন মন্মথ রায় অন্তত পঞ্চাশটি ডকুমেন্টরী বা তথ্যচিত্র করেছিলেন। সরকারের তথ্যচিত্রগুলি অরোরা সিনেমা কোম্পানির নাম দিয়ে তোলা হতো। মন্মথ রায়ের লেখায় পাই : "—পাঁচ টাকা ফুটে, একটা ভাঙ্গা ক্যামেরায় ছবি তুলত হত।.......তথ্যচিত্রের মধ্যে কিছুটা কাহিনী আমি আমদানী করতাম। এ ব্যাপার নিয়ে শিক্ষা-বিভাগের তদানীন্তন সেক্রেটারি ডি. এম. সেনের সঙ্গে আমার একবার বাদানুবাদ হয়। ডঃ রায় (বিধানচন্দ্র রায়) আমাকেই সমর্থন করেছিলেন।" (একটি সাক্ষাৎকার চিত্রভাষ ১৩শ সংখ্যা ১৯৭৮) দু রিলের সাঁওতাল জীবন 'টোটোপাড়া' অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এভারেস্ট জয়ের পর তেনজিং নোরগেকে নিয়েও একটি তথ্যচিত্র করেন তিনি। তাঁর 'বিদ্রোহী নজরুল ইসলাম' নামে দুরিলের একটি তথ্যচিত্র নজরুল সম্পর্কে একটি দলিল বিশেষ। এটি কাজী নজরুল ইসলাম এর জীবনী অবলম্বনে তৈরী। তথ্যচিত্রটিতে কবির চরিত্র মাধুর্য, দুর্জয়-স্বাধীনতা প্রীতি-ধরা রয়েছে। প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলে ছবিটি ষোলটি প্রিন্ট করে প্রচার করা হয়েছিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় ছবিটি দেখে মন্মথ রায়কে বলেছিলেন 'বড্ড সেন্টিমেন্টাল করেছ হে' (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার)

নাটক, চিত্রকাহিনী, চিত্রনাট্য শুধু নামের পরিবর্তনই নয়। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রের সঙ্গে নাটকের প্রভেদের মাপকাঠিটিও এই নাম পরিবর্তনের মধ্যেই নিহিত। দর্শক—চিত্রনাট্যকার—পরিচালক—প্রযোজক এইরকম একটা পরম্পরা যদি ভাবা যায় তবে ব্যাপারটা এইরকম ভাবে বলা যেতে পারে—দর্শকের মানসিকতা বুঝে চিত্রনাট্যকার কাহিনী নির্বাচন করেন। তাঁর চিত্রনাট্য বুঝে পরিচালক, চিত্রনাট্য নির্বাচন করেন। পরিচালককে বুঝে প্রযোজক তাঁকে নির্বাচন করেন এবং অর্থ বিনিয়োগ করেন—অর্থাৎ একটি ছবি ওঠা শুরু হয়। তাহলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে চিত্রনাট্যকারই সেই ব্যক্তি যিনি ছবির পরিচালক এবং দর্শক এই দুই মেরুর মধ্যে মিলন ঘটান।

১৯৩৪ থেকে '৩৮ এর মধ্যে মন্মথর যে পৌরাণিক নাটকগুলি মঞ্চে পরম আদৃত ছিল সেগুলিই চলচ্চিত্রে ধর্মীয় ছবি হিসাবে ভীষণ জনপ্রিয় হয়। মন্মথ রায়ের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব দর্শকের মানসিকতা বুঝে কাহিনী নির্বাচন। দর্শক কি চায় তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ধর্মীয় ও সামাজিক কাহিনী নির্বাচনে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করলেই সেটা বোঝা যাবে। প্রফুল্ল রায়, জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল মজুমদার—এঁরা প্রত্যেকে একটি করে এবং মধু বসু তাঁর কাহিনী নিয়ে চার·চারটি ছবি করেছেন। প্রায় প্রতিটি কাহিনীতেই আছে :—

১) নারীর স্বার্থত্যাগ :–

চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সনকা, লখীন্দরের স্ত্রী বেহুলা, মহুয়া, খনা থেকে শুরু করে মনীষা (অভিনয়), কুমকুম (কুমকুম), মধুছন্দা (রাজনর্তকী), মীনাক্ষী (মীনাক্ষী), প্রতিভা (যোগাযোগ), নন্দিতা (অলকানন্দা) প্রতিটি নারী চরিত্র পুরুষ শাসিত সমাজ বা তার প্রেমিকের কাছে ভারতীয় ঐতিহ্যের মহান নারীদের মতই নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন।

সে যুগে পত্রিকার বিজ্ঞাপনের মধ্যেও নারীর স্বার্থত্যাগের বিষয়টিকেই মুখ্য করা হয়েছে দেখা যায়। 'খনা' চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপনে আনন্দবাজার লিখেছিল : "ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে যে নারীর চরিত কথা অক্ষয় হইয়া আছে, যাঁহার মুখের বচন বেদ মন্ত্রের মতই বাঙালীর ঘরে ঘরে নিত্য উচ্চারিত, সেই সর্বগুণ বিভূষিতা নয়নানন্দময়ী নারী রত্নের প্রেম ও আত্মবলিদানের অবিস্মরনীয় আলেখ্য।"

২) মধ্যবিত্ত সুলভ রোমান্স :–

বিশেষ করে সামাজিক কাহিনীগুলির মধ্যে নায়ক নায়িকার এই রোমান্স অনেকখানি জায়গা করে নিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে দুভাবে—১. স্বকীয়া অর্থাৎ গার্হস্থ্য প্রেম, শিব দুর্গাকে কেন্দ্র করে, ২. পরকীয়া প্রেম অর্থাৎ রোমান্টিক প্রেম, রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। দুটি ক্ষেত্রেই পুরাণের সেই ধর্মীয় আবরনের মোড়ক খুলে লৌকিক রূপেও তাদের পাওয়া গেছে। সামাজিক কাহিনীর মধ্যে মধু বসু পরিচালিত ছবিগুলিতে স্বকীয়া ও পরকীয়া বা গার্হস্থ্য ও রোমান্টিক প্রেমের ব্যাপারটি ভারী সুন্দরভাবে এসেছে। এই রোমান্স আনতে গিয়ে নারীর স্বার্থত্যাগ এসেছে, আনতে হয়েছে একটি রূপকথার জগৎ আর ঘটাতে হয়েছে দর্শকের ইচ্ছাপূরণ।

৩) রূপকথার জগৎ :–

বাস্তবের রূঢ়তার মধ্যেও মানুষ বারবার ভালবেসে একটি রূপকথার জগৎ সৃষ্টি করে নিতে চেয়েছে। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার যোগসূত্র ঘটিয়ে রূপকথার পক্ষীরাজ যখন বাস্তবের দুয়ার ঠেলে সাধারণ মানুষের কাছে আসে তা বড় সুন্দর। সি.এ.পি-র নাটকগুলিতে এই প্রমান মন্মথ রায় বারবার রেখেছেন। চিত্রনাট্য রচনার ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ পৌরাণিক ছবিগুলির মধ্যেও যেমন আছে, তেমনি সামাজিক ছবিতে তাঁর নায়িকারা বাস্তব জগতের হয়েও যেন কোন রূপকথার জগতের বাসিন্দা হয়ে গেছেন।

৪) দর্শকের ইচ্ছাপূরণ :–

চলচ্চিত্র হচ্ছে এমন একটি শিল্প মাধ্যম যেখানে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। সেটি করে থাকেন প্রযোজক। যদি আমরা বিপরীত দিক থেকে দর্শক—চিত্রনাট্যকার—পরিচালক—প্রযোজক এই পরম্পরাটিকে দেখি তবে দেখব একটি চলচ্চিত্রের জন্য প্রযোজক যেমন অর্থ বিনিয়োগ করে থাকেন তেমনি সেই অর্থ মূলত দিয়ে থাকে দর্শক। এখন প্রযোজক যদি সেই অর্থ ফিরে পেতে চান তাহলে দর্শক আকর্ষনের একটি দায়িত্বও তার ওপর বর্তে যায় এবং তখনই দর্শকের ইচ্ছাপূরণের

একটা তাগিদ লক্ষ্য করা যায়। এই তাগিদ এবং দায়িত্ব তখন সমভাবেই এসে পড়ে চিত্রপরিচালক ও চিত্রনাট্যকারের ওপর। এই ইচ্ছাপূরণের জন্য কাহিনীতে যেমন আগে পাহাড়ী স্থান, সমুদ্র নিকটবর্তী স্থান তেমনি নায়ক নায়িকার মিলনও একটা বড় স্থান দখল করে থাকে। নৃত্য, সংগীতে চটুলতার সংযোজন ঘটে। যে কোন মানুষ তাঁর সময়কালকে ঘিরেই বড় হয়ে ওঠেন। পেছনের একটা টান থাকলেও সামনের দিকে এগিয়ে যাবার ইচ্ছেটা তাঁর মধ্যে মূর্ত হলে তাঁকে আমরা যুগের সামনের সারিতে স্থান দিই। মন্মথ রায় চিত্রনাট্যকার হিসেবে বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় ছবির সার্থক রূপকার। প্রথা মানার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভাঙার চেষ্টাও তিনি করেছেন। 'অভিনয়'-এর চিত্রকাহিনীর শেষাংশে কাহিনীর সামান্য পরিবর্ত্তনে, 'কুমকুম'-ছবিতে কুমকুম, চন্দন শিপ্রার চরিত্র গঠনে, 'মীনাক্ষী'-তে নায়িকা মীনাক্ষীর আবার চোখ ভাল হয়ে যাওয়ার ঘটনায় এবং নায়কের সঙ্গে মিলনে ; 'যোগাযোগ'-ছবিতে 'খেলার বৌ'থেকে সত্যিকারের বৌ হয়ে ওঠায় তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি বেশ কাজ করেছিল বৈকি। এ প্রসঙ্গে মন্মথ রায়ের প্রথম চিত্রনাট্য 'চাঁদ সদাগর' -চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গে অ্যাডভান্স (১৩.৩.৩৪)-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করছি। পত্রিকাটি লিখেছিল ঃ—"Mr. Roy should have introduced 'comedy relief' in a few scenes for the benefit of the masses."

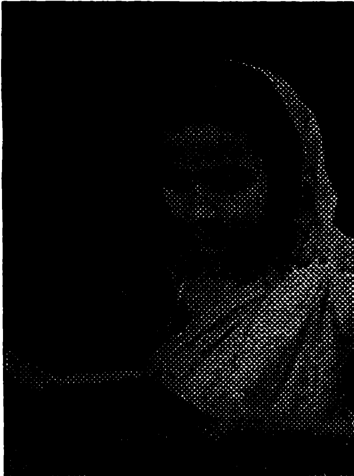
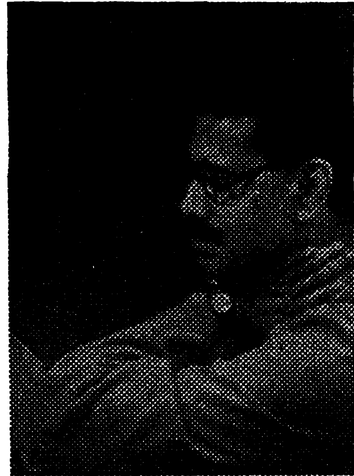
রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'ক্ষুধিত পাষাণ' চিত্রনাট্য করার প্রসঙ্গ দিয়ে এই অধ্যায়ের ইতি টানব। 'চিত্রাঙ্গদা' মূলত কাব্যনাট্য ও নৃত্যনাট্য ; 'ক্ষুধিত পাষান' একটি ছোট গল্প। কিন্তু মন্মথ রায়ের কৃতিত্বে সেই কাব্যনাট্য ও ছোটগল্প থেকেই তিনি রচনা করেছিলেন চিত্রনাট্য। ছবিটিকে "A poem on celluloid"-যে বলা হয়েছিল তার থেকে স্পষ্ট অনুভূত হয় চিত্রাঙ্গদার যে কাব্যগুণ তা চিত্রনাট্য রচনায় সফলতা পেয়েছিল।

তপন সিংহ খ্যাতির আসনে থেকেও যখন মন্মথ রায়কে 'ক্ষুধিত পাষান' এর চিত্রনাট্য করার আহ্বান জানান তখনই বোঝা যায় তিনি তাঁর চিত্রনাট্য রচনার ওপর কতখানি নির্ভর করেছেন। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-কে ছোটগল্প থেকে দীর্ঘায়িত করতে হয়েছে, নাট্যক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে হয়েছে, রূপকথার জগৎকে বাস্তবের আলোতে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে।

আমাদের দেশে চলচ্চিত্রের জন্যই কেবল স্বাধীনভাবে রচনা বেশ কম। সাহিত্য-নির্ভরতা তাই বেশি লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে চিত্রনাট্যকারদের ওপর একটি গুরু দায়িত্ব বর্তে যায়—সেটি হল চিত্রনাট্য করার ক্ষেত্রে তারা কিভাবে সাহিত্য-মাধ্যমটিকে কাজে লাগাবেন। সম্পূর্ণ গ্রহণ, কিংবা আংশিক গ্রহণ অথবা কেবলমাত্র বাণিজ্যের কথা মাথায় রেখেই কাজটি করবেন কিনা। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে একটি সৃজন-মাধ্যম থেকে অন্য সৃজন-মাধ্যমে পৌঁছতে গেলে তাকে খানিকটা পরিবর্তন করে নিতে হয়। সাহিত্যে যা আছে তা হুবহু ছবিতে রূপায়িত করা যায় না। এক্ষেত্রে চিত্রনাট্যকার সাহিত্যের মূল বক্তব্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে নিজের সৃজন-ভাবনা দিয়ে

তাকে ছবির উপযোগী করে নেন। কখনও কখনও খানিকটা পরিবর্দ্ধন ঘটে, কখনও বা পরিবর্জন। আর যারা সাহিত্য কাহিনী থেকে আংশিক গ্রহণের পথটি বেছে নেন তারা কাহিনীর মূল বক্তব্যকে অবিকৃত রেখে কাহিনীতে নতুনতর সংযোজন ঘটান— অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখেই। মন্মথ রায়ও চিত্রকাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনার দু একটি ক্ষেত্রে উভয় পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 'চলচ্চিত্র' মাধ্যমটি সম্পর্কে তিনি হয়ত গভীর অনুধ্যানী হতে পারেন নি বা আন্তরিক তাগিদ অনুভব করেননি, যেমনটি তিনি করেছেন তাঁর পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক সৃজনের ক্ষেত্রে। তবু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই—এরই মধ্যে যা আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি, তা রাজ্য সরকারের তথ্য দপ্তরের প্রচার আধিকারিকের পদে থাকার সুবাদেই হোক বা মধু বসুর সৌজন্যেই হোক—সেটি ভালোয় মন্দে মিলে হয়েছে আমাদের উপরি পাওনা। একজন মানুষকে সৃজনের বিভিন্ন দিক থেকে এমন বর্ণময় করে দেখা এটা তো কম প্রাপ্তি নয়।

মন্মথ রায়ের নাটক, চিত্রকাহিনী ও চিত্রনাট্য থেকে যে সব ছবি তৈরি হয়েছিল তা সারণিতে দেওয়া হল। মুক্তির দিন দিয়ে তাঁর কাজের ধারাটি বোঝা যাবে। পরিচয় বলে দেবে তাঁর উত্তরণের পথ। পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা-অভিনেত্রী শুধু কৌতূহল মেটানোর জন্যই নয়, কোন পরিচালক তাঁকে ব্যবহার করেছিলেন এবং কারা তাঁর সংলাপ বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন তা জানার জন্যেই এই প্রচেষ্টা।

মগ্ন মুহূর্তে তপোবালা ও মন্মথ. (১৯৩৫ সালে)

ছবির নাম	পরিচয়	মুক্তির দিন	ছবিঘর	পরিচালক	প্রধান অভিনেতৃ
চাঁদ সদাগর	নাটক	১৭.৩.১৯৩৪	ক্রাউন, টকী হাউস	প্রফুল্ল রায়	অহীন্দ্র চৌধুরী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলী, দেববালা, নীহার বালা, ইন্দুবালা, শেফালিকা।
মহুয়া	নাটক	১.৯.৩৪	চিত্রা	হীরেন বসু	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, ভূমেন রায়, মলিনা।
শুভত্র্যহস্পর্শ	চিত্রকাহিনী	২৯.১২.৩৪	ছায়া	মন্মথ রায়	চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, জহর গাঙ্গুলী, আশু বসু, ইন্দুবালা।
অভিনয়	চিত্রকাহিনী	২.৯.৩৮	রূপবানী	মধু বসু	অহীন্দ্র চৌধুরী, সাধনা বসু, ধীরাজ ভট্টাচার্য, প্রীতি মজুমদার, তুলসী লাহিড়ী, নবদ্বীপ হালদার, রবি রায়।
খনা	নাটক	১২.১৯.৩৮	উত্তরা	জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়	অহীন্দ্র চৌধুরী, ছায়া দেবী, দেববালা, আঙ্গুরবালা, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়।
কুমকুম	চিত্রকাহিনী	১০.২২.৪০	রূপবানী	মধু বসু	সাধনা বসু, অহীন্দ্র চৌধুরী, রবি রায়, প্রীতি মজুমদার, পদ্মা দেবী।
রাজনর্তকী	নাটক	৮.৩.৪১	উত্তরা	মধু বসু	সাধনা বসু, অহীন্দ্র চৌধুরী, জ্যোতি প্রকাশ, মন্মথ রায়, প্রতিমা দাশগুপ্তা।

ছবির নাম	পরিচয়	মুক্তির দিন	ছবিঘর	পরিচালক	প্রধান অভিনেতৃ
মীনাক্ষী	চিত্রকাহিনী	১২.৬. ৪২	চিত্রা	মধু বসু	সাধনা বসু, অহীন্দ্র চৌধুরী, জ্যোতি প্রকাশ, দেববালা, প্রীতি মজুমদার, কৃষ্ণচন্দ্র দে, সন্ধ্যারানী।
যোগাযোগ	নাটক	১৭.৪.৪৩	শ্রী, পূরবী, পূর্ণ	সুশীল মজুমদার (চিত্রনাট্যকার ঃ- প্রেমেন্দ্র মিত্র)	অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, কানন দেবী, দেববালা, ইন্দিরা রায়, সন্ধ্যারানী, রবি রায়।
অলকানন্দা	চিত্রকাহিনী	৮.৮.৪৭	মিনার, বিজলী, ছবিঘর	রতন চট্টোপাধ্যায় (চিত্রনাট্যকার : দেবকী বসু)	অহীন্দ্র চৌধুরী, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধানা দেবী, ত্রিবেদী, পূর্ণিমা, সুপ্রভা, প্রদীপ-কুমার, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, রবি রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, আশু বসু।
ঝড়ের পরে	নাটক	১৩.৬.৪৭	শ্রী, পূরবী, রূপম	অপূর্ব মিত্র	ছায়াদেবী, জ্যোৎস্না গুপ্তা, জহর গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, রবি রায়, তুলসী চক্রবর্তী, আশু বসু।
পথহারার কাহিনী	প্রথমে গল্প পরে নাটক	২.৬.৫০	রূপবানী, অরুণা, ইন্দিরা	দেবনারায় গুপ্ত	ধীরাজ ভট্টাচার্য, অহীন্দ্র চৌধুরী, শ্যাম লাহা, ফণী রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বনানী চৌধুরী, আশু বসু।
চিত্রাঙ্গদা	চিত্রনাট্য	১.৪.১৯৫৫	মেট্রো	হেমচন্দ্র ও সুরেন সেন	সমীর কুমার, নমিতা সেনগুপ্ত, মালা সিন্‌হা, মিতা চ্যাটার্জী।
ক্ষুধিত পাষান	চিত্রনাট্য	৬.৫.১৯৬০	মিনার, বিজলী, ছবিঘর	তপন সিংহ	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অরুন্ধতী দেবী, রাধামোহন, ছবি বিশ্বাস, পদ্মা দেবী, দিলীপ রায়।

প্রাবন্ধিক মনন

মন্মথ রায়ের বিচিত্র চিন্তা উদ্রেককারী প্রবন্ধের সংখ্যা কম নয়। বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের বহু পৃষ্ঠায় তাঁর যে প্রাবন্ধিক মননের পরিচয় রয়েছে, তার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। নাটক বিষয়ক সেমিনারের শুরুতে নাট্যালয় উদ্বোধনের মুহূর্তে, এমনকি নাট্য আকাদেমীর জন্মলগ্ন থেকেই রয়েছে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা। বিভিন্ন নাটক ও নাটক কেন্দ্রিক কর্মসূচী বিষয়ে দেওয়া তার ভাষণ (লিখিত এবং অলিখিত) বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে তাঁর সমকালীন নাট্যচিন্তা আর নাট্যবোধ।

প্রবন্ধ সমষ্টি হিসেবে রয়েছে তাঁর একটি মাত্র গ্রন্থ—'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা'। এটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৩ সালে প্রদত্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতামালা। সূচীপত্র দেখলেই তাঁর বিচিত্রতা সম্পর্কে একটি ধারণা জন্মায়। গ্রন্থ নামেই প্রথম প্রবন্ধ। দ্বিতীয়, বাংলা নাটকের গতিপ্রকৃতি, তৃতীয়, নবনাট্য আন্দোলন, চতুর্থ, আত্মরক্ষা আর এক হাতিয়ার ঃ সাহিত্য, পঞ্চম, শিশুনাটক, ষষ্ঠ, তিলোত্তমা, সপ্তম, অনন্ত প্রাণ, অষ্টম, শতাব্দীর নাট্যসাধনা।

নাটককে মূল প্রতিপাদ্য করে তারই বিভিন্ন ধারা নিয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তার বাহন এই প্রবন্ধগুলি। নাট্যকার মন্মথ রায়ের মূল্যায়নের প্রসঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতি মনস্ক চিন্তাশীল ভাবুক মন্মথ রায়ের আলোচনাও প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়ে।

মন্মথ, ভালো নাটক কেমন হওয়া উচিত তা যেমন লিখে দেখিয়ে গেছেন, খারাপ লেখাকে অপর হাতে বাধাও দিয়ে গেছেন। তাঁর ভাষণ ও প্রবন্ধগুলি নাট্যকার মন্মথ রায়কে বোঝবার পক্ষেও তাই অতীব জরুরী।

প্রথমেই আলোচনা শুরু করা যাক 'নাটক লেখা' বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধগুলি নিয়ে। মূলত যিনি নিজেকে নাট্যকার বলে ঘোষণা করতে প্রথম থেকেই আগ্রহী সেই মন্মথ রায় সম্পর্কে বনফুল বলেছিলেন, 'তিনি একজন ছোট গল্পকার যিনি নাটকের মাধ্যমে এই কাজ করেছেন। ফলে তিনি যে নাটক লেখার আগে নাটক লেখার সমস্যার কথাও ভাববেন একথা বলাই বাহুল্য। তাঁর প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে মন্মথ নিজের যৌবনের অভিজ্ঞতাকে যেমন কাজে লাগিয়েছেন, তেমনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নাট্যকারদের কাছে অতি মূল্যবান প্রজ্ঞাদানও করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'আমি সত্যসত্যই মনে করি যেকোন জীবনই একটা নাটক। ......আমি সত্যই মনে করি প্লট আমার চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে যে কোনো মানুষের জীবনে, জীবন সংগ্রামে, উত্থান পতনে। প্রথমেই নাটকের বিষয়বস্তু নির্ধারণ। তারপর প্রতিপাদ্য বিষয়টি নির্ধারণ। এই মাল মসলার ভিত্তিতে প্লটটি গড়ে তুলব আমি। প্লট বা কাহিনী পেলে আমার প্রাথমিক চিন্তা হবে কোন বা কি সংঘাতের ভিত্তিতে আমি প্লটটি দাঁড় করাব। সংঘাত একটি চাই-ই চাই। আমি মনে করি সংঘাতই নাটকের প্রাণ। সংঘাতটি নির্ধারিত হয়ে গেলে, ঐ সংঘাতের ভিত্তিতেই, বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্ভাব্যভাবে বিজড়িত চরিত্রগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে করতেই

প্লটটি ফলে ফুলে গড়ে উঠবে, দানা বাঁধবে। ......আমি নাটকে যে সংঘাত আনব তা গড়ে উঠবে কোনো একটি মতাদর্শের বিরুদ্ধতার ভিত্তিতে। সংঘাত মানেই দুটি ভিন্ন মত বা পর্ব। ......প্রতিফলন যেন অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট না হয়। ......আর একটি কঠিন ব্যাপার মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। সেটি হচ্ছে পরিমিতি বোধ। ......চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করতে গিয়ে আমি যেন তাদের অস্বাভাবিক না করি.....।......সামাজিক প্রয়োজনে নাটক লেখার আকর্ষণ আমার সবচেয়ে বেশি।

সামাজিক প্রয়োজনকে যে নাট্যকার অগ্রাধিকার দেন তিনি যে নাটক লিখতে গিয়ে সে জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খকে তুলে ধরবেন তা বলাই বাহুল্য। প্রবন্ধের নামকরণও করেন তাই 'যা দেখেছি তা দেখাব।' সাহিত্য তো জীবনের আয়না। নাট্যসাহিত্যও তা থেকে বাদ যেতে পারে না। বার্টলট ব্রেশট তাঁর সমসাময়িক হলেও তিন বছরের কনিষ্ঠ। তবু তাঁর নাট্যবোধকে তিনি স্বীকার করেছেন। ব্রেশটের চিন্তা তিনি তাঁর প্রবন্ধে ব্যবহার করে সেই মতবাদকেই পক্ষান্তরে স্বীকার করেছেন। দুজনের মননে যতটুকু সাযুজ্য দেখা গেছে তাই-ই বা কম কিসে! 'মানুষের পক্ষে টিকে থাকা কি করে সম্ভব হয়েছে? সম্ভব হয়েছে অত্যাচার নির্যাতন লুণ্ঠনের ফলে আরো বহু মানুষ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে বলে। মানুষ যে আজ টিকে আছে সে শুধু নিজের মনুষ্যত্বকে দাবিয়ে রাখতে পারছে বলে। পশুর মত আচরণ করো, তবেই টিকতে পারবে—এই হল মোক্ষম সত্য। তবু তিনি বলেন, 'আমি একজন নাট্যকার। যা দেখেছি আমি তাই-ই দেখাব। আমি দেখেছি মানুষের হাটে কেমন করে মনুষ্যত্বের ব্যবসা চলে। আমি তা দেখাব। তবু ব্রেশট আশা করেন আর মন্মথ রায় তা যখন তাঁর প্রবন্ধে তুলে ধরেন তখন দুজনের এই মিলে যাওয়া বিশ্বাসটুকুই পাঠকের কাছে হয়ে ওঠে পরম কাঙ্ক্ষিত বস্তু।' সবই বদলে যাবে, শুধু মানুষ নয়, গোটা দুনিয়া। বিশেষ করে মানুষের শ্রেণীগত ভেদাভেদ। কারণ দু রকমের মানুষ আজ ; এক, যারা অজ্ঞ, আর এক যারা শোষক। তাই আমাদের নাট্যকার তাঁরই মত বলতে চান : 'I am a play wright. I show what I have seen. In mankind's markets I have seen how humanity is traded, that I show.'... এক কদম এগিয়ে মাতৃভাষায় বলে ওঠেন, 'আমাদের দেশে আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের নাট্যলক্ষ্য তাই হোক ঃ নগ্ন সত্যের নির্লজ্জ উদঘাটন।'

'বাংলা নাটকের গতি প্রকৃতি 'প্রবন্ধে (যা নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনের ৩৭তম বার্ষিক অধিবেশনে নাট্যশাখার সভাপতির ভাষণ। ১৯৬১ সালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এই অধিবেশন হয়েছিল) বাংলা নাটকের ইতিহাস কথনের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক গবেষণার পথ যাঁরা প্রস্তুত ও প্রশস্ত করে গেছেন তাঁদের নামও সঠিকভাবে ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা নিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। পত্র পত্রিকা যাঁরা নাট্যচর্চায়, নাট্য আন্দোলনের সহায়ক হয়েছে তাঁদের কথাও উল্লেখ করেছেন। জাতীয় নাট্যশালার বহু ঘোষিত ঢক্কানিনাদকে ব্যঙ্গ করতে ভোলেননি। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের নাট্যশাখার প্রথম প্রবর্তনের বছরেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন 'সাহিত্য যদি দেশকাল জাতির দর্পণ হয়,

তবে বাংলা কথা সাহিত্যের দর্পণ খুবই উজ্জ্বল সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যের দর্পণও অনুজ্জ্বল নয়। ......ব্রেশটের নাটক ও কামুর উপন্যাস সাহিত্যের আলোচনা চক্রে একই সঙ্গে আলোচিত হয়। ঔপন্যাসিক হেমিংওয়ের সঙ্গে নাট্যকার ইউজিন ও'নীল অথবা নাট্যকার টেনেসি উইলিয়মসকে কিছুমাত্র উঁচুনীচু বিচার করা হয় না।' তিনি ক্ষোভের সঙ্গে একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই কারণেই যে বেশির ভাগ সাহিত্য পত্র পত্রিকায় নাটক প্রকাশিত হয় না। এমনকি বিপুল কলেবর শারদীয় সংখ্যাগুলিতেও নয়। যদিও নাট্যকারের বহু নাটক পত্রপত্রিকাতেই প্রথমে প্রকাশিত হয়ে পরে মঞ্চস্থ হয়েছে তবু তাঁর মত নাট্যকারের এ ক্ষোভ খুবই স্বাভাবিক যে বিপুলদেহী শারদীয় সংখ্যাগুলিতে পাঁচ-সাতটি উপন্যাস এবং দশ-পনেরোটি ছোটগল্প থাকলেও নাটক, নাটিকা একটিও থাকে না। প্রায়ই শোনা যায়, আমাদের দেশে নাকি নাটক নেই। দেশের নাটক অবহেলা করে পাশ্চাত্য নাটকের গুণপনায় অনেক শতমুখ। হয়তো এটা আভিজাত্য আকর্ষণের সহজ পথ। কিন্তু বাংলা নাট্য সাহিত্যের সাম্প্রতিক মান সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য নাটকের মানের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করবার কোন কারণ নেই।

'আত্মরক্ষার আর এক হাতিয়ার' সাহিত্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্মথ শুধু নাট্য সাহিত্যেরই নয় সাহিত্যের গোড়াটিকে ধরেই নাড়া দিয়েছেন। 'আজ আমাদের সাহিত্য, আমাদের সঙ্গীত, আমাদের চিন্তা, আমাদের কল্পনা, আমাদের স্বপ্ন সব কিছুকে গড়ে উঠতে হবে সমাজের কল্যাণে সমাজতান্ত্রিক সুরে। তবেই তাতে খুঁজে পাবো আমি আমাকে যে আমি আত্মকেন্দ্রিক নয়, সমাজতান্ত্রিক।' জাতির জীবনে যখনই পরীক্ষা এসেছে নাট্যকার প্রাবন্ধিক হয়েও তার মোকাবিলা করবার যে চেষ্টা করেছেন তাও প্রশংসনীয়। 'আমাদের সামনে আজ এক অগ্নি পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে জাতি ও সমাজের যে উৎসাহ, যে উদ্যম এবং যে দেশাত্মবোধ চাই, তা সঞ্চার করাই আজ সাহিত্যের পরমতম কর্তব্য চরমতম দায়িত্ব।' স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এ কর্তব্য পালন না করলে সাহিত্য ভ্রষ্ট হবে তার লক্ষ্যপথ থেকে, আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, তাই আহ্বান জানিয়েছেন সাহিত্যকে করে তুলতে হবে আত্মরক্ষার আর এক হাতিয়ার।

রঙ্গালয় এবং তার সঙ্গে নিজের জীবনের যোগ নিয়ে তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধ রয়েছে। 'সাধারণ মঞ্চ ও আমি' তার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় লেখা। যে প্রবন্ধে তিনি নিজেই একটু দূরত্ব থেকে ইতিহাসটুকু দেখেছেন। যেখানে তিনি নিজেই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত সেখানে সামান্য ত্রুটি মারাত্মক বলেই গণ্য হত। প্রাবন্ধিক মন্মথ রায় এক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের সূক্ষ্মতায় নিঃসন্দেহে সফল। স্বাধীন ভারতে রঙ্গালয় কেমন হওয়া উচিত তা স্বাধীন ভারতে রঙ্গালয় প্রবন্ধে সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। 'আমাদের রঙ্গমঞ্চ' নামে প্রবন্ধটিও খুবই মনোগ্রাহী হয়েছে। 'জাতীয় রঙ্গমঞ্চ' ও 'জাতীয় নাট্যশালা' প্রবন্ধ দুটিতে বহু ঘোষিত অথচ এখনও অদৃষ্ট এই বস্তুটিকে নিয়ে গিরিশবাবুর সময় থেকে শিশিরবাবু পর্যন্ত কম ভাবেন 'নি। পরবর্তীকালের তরুণ রাও ভাবতে ভাবতে বার্ধক্যে পৌঁছে গেছে। নাট্যকার মন্মথ রায় আজ নেই, তবু এই

ভাবনাকে উপাদান করে তিনিও প্রবন্ধ লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। 'প্রণতি গ্রহণ কর' এবং 'একাঙ্ক নাটকের কথা' প্রবন্ধ দুটিতে তিনি তাঁর নিজের এবং সমসাময়িক কালকে সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। একাঙ্ক নাটক সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা, সেই নাটক-ধারার শৈল্পিক সৃজনে তার ভূমিকা--একাঙ্ক নাটককে ঘিরে আপেশাদার ছোট দলগুলির নাট্যচর্চার কথাও সাবলীলভাবে প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে।

'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা' প্রবন্ধটিতে তিনি বাংলার সংগ্রামী নাটকের পরিচয় বিধৃত করেছেন। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' থেকে শুরু করে তাঁর 'কারাগার' যখন Dramatic performance Act-এর বাধায় বন্ধ হল তিনি সেইসব দিনগুলির কথা ভুলতে পারেননি। প্রবন্ধটি ১৯৬৩ সালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতামালার অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় পরিশিষ্ট বিভাগে এই Act যে কত জঘন্য তা পুরোপুরি ছেপে তাঁর ঘৃণাকে প্রকাশ করতে ভোলেননি। ইংরাজিতে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তার মধ্যে আমাদের কাছে দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ--The Indian Theatre Today এবং Bengali Stage and Outfight for Freedom. শেষের প্রবন্ধটিতে 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা'-র বিষয়টিই আলোচিত। লিখেছেন, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার সবচেয়ে বড় গৌরব দেশপ্রেম বিরোধী কোন নাটকই লিখিত বা অভিনীত হয়নি জাতীয় সংকট কালে।'

সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে নাট্যকার হিসেবে তিনি জড়িয়ে ছিলেন দুটি দশক। গণনাট্য সংঘের উদ্ভবের পরে যখন গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন বেশ নাড়া দিল তখন তাদের জন্যেও লিখেছেন 'ধর্মঘট', 'লালন ফকির', '১৮৭২', 'এদেশে লেনিন'-এর মত নাটক। তেমনি গ্রুপ থিয়েটারের সংকটের সময়ে প্রবন্ধ লিখে তাঁদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেও ভোলেননি, "সমাজ জীবন রাজনীতি এবং সমাজনীতির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। রাজনীতি এবং সমাজনীতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত আমাদের সমাজ জীবন এবং এই সমাজ জীবনকে কখনই অবহেলা করতে পারে না আমাদের নাটক ও নাট্যশালা। জাতির এবং সমাজের সুখ-দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ ও স্বপ্ন যদি নাটক ও নাট্যশালায় প্রতিফলিত না হয়, তবে সে নাটক ও নাট্যশালা লক্ষ্যভ্রষ্ট।" .....'নাটক আর বিলাস নয়, আত্মরক্ষার হাতিয়ার। আমাদের বংশধরগণ যেন একথা না বলতে পারে যে দেশ যখন পুড়ছিল আমরা তখন বসে বসে বাঁশী বাজিয়েছি।'

'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা'-র মত 'শতাব্দীর নাট্যসাধনা' নামে একটি প্রবন্ধ ছিল মিনার্ভা থিয়েটারে ১৯৭১-এর ৭ই ডিসেম্বর বাংলা সাধারণ নাট্যশালার প্রাক্ বর্ষপূর্তি উৎসবের উদ্বোধনী ভাষণে। 'বাংলা থিয়েটারে স্বাধীনতা আন্দোলন' প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য।

নিজের জীবনে তিনি নাট্যজগতে পদার্পণের ব্যাপারে প্রথমত অভিনেতা এবং পরে নাট্যকার, তাই স্মরণীয় অভিনয়কে যে তিনি সম্মান জানাবেন সে তো স্বাভাবিক। তাই তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে (স্মরণে, চিত্রিতা, শারদীয়া ১৩৬৬), শিশির

কুমার সম্পর্কে (অলিখিত এক মহানাটক, রূপমঞ্চ ১৩৬৬) এবং নাট্যাচার্য শিশির কুমার ও নাট্যশালা (অনামনে) অহীন্দ্র চৌধুরী সম্পর্কে (অহীনদা আমাদের গর্ব, চিত্রবাণী, অহীন্দ্র সংখ্যা ১৩৬৩) ছবি বিশ্বাস সম্পর্কে (অন্তহীন ছবি, রূপমঞ্চ শারদীয়া ১৯৬২) এবং ছবি একজন স্রষ্টার নাম (সূত্রধার, শারদীয়া ১৯৬২) এবং পুরনো দিনের অভিনয় সম্পর্কে 'পুরনো দিনের অভিনয়' নামেই প্রবন্ধগুলি (রূপমঞ্চ শারদীয় ১৩৬৫) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৯৯ সালে তাঁর জন্ম। এই শতাব্দীর প্রায় সমবয়সী তিনি। তাই স্বাধীনতা উত্তর যুগকেও তিনি যেমন ভালোভাবে লক্ষ্য করেছেন তেমনি, '৪৪-এর পরবর্তী যুগকেও তিনি আত্মস্থ করেছেন। নবান্ন থেকে ছোট নাটকে নতুন যুগের শুরু তা তিনি প্রবন্ধের স্থানে স্থানে ব্যক্ত করেছেন। ১৯৪৪ সালে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটি সমাজ বাস্তবতা ও মননশীলতার এক নব জীবনদর্শন। ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সাংস্কৃতিক শাখা ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এই 'নবান্ন' নাটকের অপূর্ব অভিনয় করে বাংলার নাট্য জগতে এক নতুন চমকের সৃষ্টি করে। (বাংলা নাটকের গতিপ্রকৃতি)। নতুন যুগকে তিনি যেমন চিনতে পেরেছিলেন তেমনি পুরাতনকে অস্বীকার করার মানসিকতা তার ছিল না। নতুন ও পুরাতন উভয়কেই তিনি তার মননে সঞ্চারিত করেছিলেন তাই তাঁকে নতুন ও পুরাতনের মেরুবন্ধনকারী বলা হয়। প্রাবন্ধিক মন্মথ রায়ের অবিস্মরণীয়তা এখানেই। তাই গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কে যেমন তাঁর কথাগুলি হয়ে উঠেছে ইতিহাসের সত্য এবং অগ্রজের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম। শিশির কুমারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হতে গিয়েও হয়নি। শিশির কুমারের সময়কালকে শিশিরযুগই আখ্যা দেওয়া হয়। শিশির কুমার বহু নতুন নাট্যকারকে তাঁর শ্রীরঙ্গম পর্যায়ের শেষ দিকে সুযোগ গিলেও তখন প্রযোজক হিসেবে তাঁর গৌরব রবি প্রায় অস্তাচলে। সারাজীবন ঘুঘুবীর, হালুমবীর আর বাঁশবিহারী (রঘুবীর, আলমগীর, রাসবিহারী) করে গেলেও মন্মথ রায়ের কোন নাটক তিনি করবার অবসর পাননি। অথচ অহীন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে মঞ্চে অনেকবার তাঁর যোগাযোগ ঘটেছে। 'অহীনদা' বলে আহ্বানের মধ্যেই সে পরিচয় বিধৃত। সেক্ষেত্রে শিশির কুমার 'নাট্যাচার্য' হয়েও সমসাময়িক এক শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের কাছেও যেন কিছুটা দূরেরই থেকে গেছেন। তবু তাঁদের দুজনের সম্পর্কেই মন্মথ যখনই লেখনী ধরেছেন বড় সুন্দর ভাবে তাঁদের চারিত্র বৈশিষ্ট্য চিত্রায়িত করেছেন। প্রযোজক অভিনেতা হিসেবে শিশির কুমার একটি যুগকে ধরে রেখেছেন, 'নাট্যাচার্য' বিশেষণে বিশেষিত করে তাঁর সমকাল তাঁকে সম্মানিত করেছে। অহীন্দ্র চৌধুরী হয়ত একটি যুগ নয় তবু যুগের আর এক নক্ষত্র হয়ত সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র একথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি। তাঁর 'মুক্তির ডাক' একাঙ্কের নির্দেশক ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। পরবর্তীকালে মন্মথ রায়ের বহু নাটকের এবং চিত্রনাট্যের কুশীলব তাঁকে হতে হয়েছে। তাই প্রবন্ধগুলির মধ্যে তাঁদের সহজ, সরল যোগাযোগই শুধু নয় সমকালের ইতিহাসটিও ভাস্বর হয়ে আছে। বিপরীত ভাবে অহীন্দ্র চৌধুরীর নিজেরে হারায়ে খুঁজি গ্রন্থের

শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী ১৯২৩ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯৫২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বর্ণনায় 'মন্মথ রায়'ও উজ্জ্বল হয়ে আছেন।

"যার নায়ক ও নাট্যাচার্য ছিলেন নট স্বর্ণশিরোমণি শিশিরকুমার ভাদুড়ী, মধ্যমণি ছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্ক ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, যোগেশ চৌধুরী, নরেশ মিত্র, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী তারাসুন্দরী, শ্রীমতী কৃষ্ণ ভামিনী, শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী নীহারবালা, শ্রীমতী সরযূবালা প্রমুখ।" ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, মহেন্দ্র গুপ্ত, শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা এই নবনাট্য গোষ্ঠীর পরবর্তী জ্যোতির্মণ্ডল। ছবি বিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল মহান। তাই দুটি রচনায় মানুষ এবং অভিনেতা ছবি বিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর লেখনী অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে।

পুরনো দিনের অভিনয় এবং এই ধরনের স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়েও প্রাবন্ধিক-নাট্যকার মন্মথ তাঁর মনের সহজ, সরল অর্গলদ্বার পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন আর তাই পাঠকের কাছেও সেই প্রাবন্ধিক-নাট্যকার হয়ে উঠেছেন রমণীয়, বরণীয় এবং স্মরণীয়ও বটে।

নাট্যকার নাটক লেখার সুবাদে ১৯৬৮'র জুন মাসে সোভিয়েত দেশ ভ্রমণে যান এবং ফিরে এসে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। যার মধ্যে 'অগ্রগতির একুশ বছর' (গণনাট্য, শারদীয়া ১৩৭৫) লেখাটি সোভিয়েত এবং ভারত সম্পর্কে প্রাবন্ধিক নাট্যকারের একটি সূক্ষ্ম অথচ তীক্ষ্ণ মননকে মেলে ধরেছে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডাঃ এইচ আর বচ্চন, হিন্দি সাহিত্যের কবি এল এন ভাবে এবং মারাঠী সাহিত্যিক কে কে নায়ার, যিনি ছিলেন গোর্কী সাহিত্যের যশস্বী অনুবাদক। চারজনই সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার পেয়ে সোভিয়েত দেশ দেখার আহ্বান পান। সোভিয়েত দেশ, সংখ্যা ১৪তে ১৯৬৮-তেই আর একটি রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে 'স্বপ্ন নয় সত্য' নামে। গল্পভারতী (১৩৭৫) আষাঢ় সংখ্যায় 'কি দেখলাম' এবং 'নর্থবেঙ্গল' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় 'সোভিয়েত দেশে একুশ দিন' লেখাগুলির প্রেরণা ঐ ভ্রমণ। কিন্তু প্রেরণা যখন আগ্রহী করে তোলে, ইচ্ছুক করে তোলে, কামনা বাসনার স্তর ভেদ করে মানুষ তখন তুলনা করতে বসে। রবীন্দ্রনাথ 'রাশিয়ার চিঠি'তে যা করেছেন মন্মথ রায়ও আংশিকভাবে এই রচনাগুলিতে তা তাঁর মত করেই করেছেন। নাট্যকার প্রাবন্ধিক মন্মথ রায়ের চেয়ে মানবতাবাদী একজন মানুষের পরিচয় ফুটে উঠেছে এই প্রবন্ধগুলির প্রত্যেকটি পংক্তিতে। তিনি লিখেছেন, "দেখলাম তথ্য পুস্তকের কোন কথাই অসত্য বা অতিরঞ্জিত নয়। ......সবারই মুখ আনন্দোজ্জ্বল। ......একথা বর্ণে বর্ণে সত্য যে পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ ব্যাপী সোভিয়েত ইউনিয়নে বিনামূল্যে শিক্ষা এবং বিনামূল্যে রোগের ঔষধ ও যাবতীয় চিকিৎসার অভাবনীয় সুব্যবস্থা রয়েছে। কেমন হাঁফিয়ে উঠলাম।" হাঁফিয়ে ওঠার পরই যে পংক্তিটি লিখেছেন, তাতে প্রাবন্ধিকের আত্ম-সমালোচনার সাহস ফুটে উঠেছে। এবং এ কারণেই তিনি সাধারণ মানুষের চোখে অসাধারণ হয়ে উঠেছেন। তিনি

এর পরের পংক্তি লেখেন, 'ছয় ফুট দু ইঞ্চি লম্বা হয়েও বড়ই খাটো মনে হতে লাগল।' এ তাঁর নৈরাশ্যজনিত হাহাকার নয়। মানুষ হয়ে আর একদল গর্বিত মানুষদের জন্যে এ তাঁর মাথা নোয়ানো অভিবাদন। তিনি তাঁদের অভিবাদন জানিয়েও হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসটুকু গোপন করেননি, "সোভিয়েত দেশের নাগরিকদের জীবনযাত্রায় অত্যাশ্চর্য মানোন্নয়ন যখন দেখতাম মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হতাম, মানুষ যে কত স্বল্প সময়ে কি বিরাট উন্নতি করতে পারে সেই মহাশক্তি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে অপরিসীম আনন্দ লাভ করতাম। কিন্তু সকল আনন্দ ছাপিয়ে দীর্ঘশ্বাসই পড়তো এই ভেবে যে আমরা ১৯৪৭ সাল থেকে আজ এই একুশ বছর কি করলাম, কি পেলাম। (অগ্রগতির একুশ বছর, গণনাট্য ১৩৭৫)। স্বাধীনতার ২১ বছর পরে যে কথাগুলি সত্য ছিল তার প্রায় আরও একুশ বছর পরেও প্রবন্ধটির শেষ পংক্তিগুলি আজও সমান সত্য। প্রাবন্ধিকের দীর্ঘশ্বাস হয়তো আজও পরম সত্য।' আজও আমরা খরায় অসহায়, বন্যায় অসহায়, খাদ্যাভাবে ক্লিষ্ট, খাদ্যের জন্য ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বিদেশে ঘুরছি আজও আমাদের সরকারি রেশনের চালে কাঁকর, ঔষধে ভেজাল, কালোবাজারই আজ জাতীয় বাজার, সবদিক দিয়েই আজো আমরা কত অসহায়, কত রিক্ত। ভারত কি শুধু ঘুমিয়ে থাকবে?' প্রাবন্ধিক এখানে যেন ভারতের বিবেক। রাজনীতিকদেরও তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। সাহিত্যিক এখানেই দূরদ্রষ্টা, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা।

নানা ধরনের প্রবন্ধ রচনাতেও মানুষ মন্মথ রায়ের সহজ রূপটি বারবার ফুটে উঠতে দেখা যায়। 'নজরুল ও মন্মথ রায়' (কাফেলা ১৩৭৫) রচনায় তাঁদের সৌহার্দ্যের কয়েকটি চমৎকার ছবি দেখতে পাওয়া যায়। সরকারী 'তথ্যচিত্র' পরিচালনা কালে নজরুলের জীবনী চিত্রায়িত করেছিলেন মন্মথ রায়। তিনি নিজেই লিখেছেন, 'এই ছবিতে কবির চরিত্র মাধুর্য, বৈশিষ্ট্য, দুর্জয় স্বাধীনতা প্রীতি প্রভৃতি অনেক কিছু ধরা রয়েছে।' কবি আমার প্রথম জীবন থেকেই বন্ধু ছিলেন। আমার অনেক নাটকের গান তিনি লিখেছিলেন, আমার নাটকে তাঁর গান ব্যবহার না করলে তিনি খুব অভিমান করতেন। সেই বন্ধুর উদ্দেশ্যে ছবি করে আমি খুব তৃপ্তি পেয়েছিলাম। চিত্র নাট্যকার হয়ে বহু ছবির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল। বাংলা চলচ্চিত্র তথা চলচ্চিত্র শিল্প নিয়েও তাঁর বক্তব্যগুলি আজও সত্য। বাংলা ছবি যা উঠছে তাতে তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সে সব ছবির না আছে story value, না আছে entertainment value, অন্য কোন value'র কথা ছেড়েই দিলাম। Quality Film তৈরি করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা এখন পর্যন্ত প্রধান হলেও ব্যবসায়িক জগতে পেছিয়ে পড়ছে। পেছিয়ে পড়ার মূলে রয়েছে যথাযথ বিষয় নিয়ে ছবি তৈরি না হওয়া। 'স্থানীয় ছবির বাধ্যতামূলক প্রদর্শন আমি বাঞ্ছনীয় বলেই মনে করি।' ছবি যদি anti-people না হয় সমসাময়িক ঘটনা একটা ভাল subject-matter হতে পারে। 'আমি মনে করি, জনসাধারণের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের একটা অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছবিতে থাকা উচিত art for people's sake। নাট্য আন্দোলন মানুষকে যতটা সমাজ সচেতন করে তুলেছে, চলচ্চিত্র

আন্দোলন কিন্তু ততটা পারেনি।' চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে তাই তিনি বলেছেন, 'মানুষকে গড়ে তুলতে চলচ্চিত্রের বিরাট একটা ভূমিকা আছে। মানুষের নৈতিক মান উন্নয়নে, দেশপ্রেমকে পুনরুজ্জীবিত করতে, জাতীয়তা বোধ সৃষ্টি করতে চলচ্চিত্রের এই বিরাট মাধ্যমটিকে ব্যবহার করা হোক। (চিত্রভাষ, একটি সাক্ষাৎকার, ১৯৭৮ দ্বাদশ বর্ষ, বসন্ত সংখ্যা)।

শিশুদের জন্য যেমন বেশ কিছু নাটক লিখেছেন তেমনি শিশু নাটক সম্পর্কে প্রবন্ধটিও তাঁর একটি মনস্ক রচনা, উল্লেখযোগ্য স্মারক। এটি তৃতীয় নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনে (লক্ষ্ণৌ, ১৯৬৪) নাট্যশাখার সভাপতির প্রদত্ত ভাষণ। সংক্ষিপ্ত এই ভাষণ তথা প্রবন্ধটিতে কিন্তু মূল কথাগুলি সবই আছে। অনুকরণের প্রবৃত্তি থেকেই নাটকের জন্ম। শিশুদের মনে এই অনুকরণ প্রবৃত্তি সহজাত। আর তা থেকেই শিশুদের মনে নাট্যপ্রীতিও সহজাত। 'শিশু যত বড় হতে থাকে, তার জ্ঞানচক্ষু যত উন্মীলিত হতে থাকে, জীবন ও প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় তত বাড়তে থাকে। ......ক্রমে বুঝে নিতে পারে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ। যেটা মন্দ তার প্রতি জাগে তার ঘৃণা, যেটা ভালো তার প্রতি জাগে তার অনুরাগ।' তাই নাটকের বিষয় নির্বাচনে সতর্ক থাকা তাঁদের নিতান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি চেয়েছেন সত্যিকারের মানুষ হোক এই শিশুরা। কারণ 'Child is the father of nation' তারা সাহসী হোক, বীর হোক। সেবা ও ত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হোক সেইসব শিশুরা। মায়ায় মমতায় তারা যেমন মধুর হবে, শিক্ষায় যেমন সুন্দর হবে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে তেমনি দেশশপ্রেমিক হবে তারা। 'জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে তাদের। শিশু নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচন এই দিকে লক্ষ্য রেখেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে—প্রাবন্ধিক ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সম্বন্ধে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

দুর্গাপুর যুব উৎসবে (১২মে ১৯৬৫) উদ্বোধনী ভাষণে যা বলেন, 'অনন্তপ্রাণ' নামকরণে তা গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধ নয় শান্তি এবং যৌবনই যে অনন্তপ্রাণ এই বোধ থেকেই সঞ্জাত এই ভাষণ তথা প্রবন্ধটি। পংক্তিগুলি আজও ২২ বছর পরেও পরম সত্য। 'যুদ্ধ করা মানেই হচ্ছে ধ্বংস করা এবং ধ্বংস হওয়া এবং এই ধ্বংসের প্রথম বলি যুবশক্তি। যুবশক্তিকেই সৈনিক করে পাঠানো হয় যুদ্ধে, তারাই যুদ্ধ করে, তারাই মারে, তারাই মরে—অথচ এই যুবশক্তিই হচ্ছে দেশের শ্রেষ্ঠ শক্তি, জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ফসল ফলায়, খাদ্য জোগায় এই যুবশক্তি, কলকারখানা চালিয়ে পণ্য উৎপাদন করে এই যুবশক্তি। এই যুবশক্তিই সমাজের প্রাণপুরুষ। সাহিত্য-কাব্য-চিত্রকলা-শিল্পকলা এই যুবশক্তিরই সৃষ্টি। রূপে রসে গানে গন্ধে দেশকে, জাতিকে সমৃদ্ধ করে এই যুবশক্তি। '......তাই দুনিয়ার মানুষ আজ ঘোষণা করেছেন—না, আর যুদ্ধ নয়।' '...যুদ্ধের পরিণাম আমরা দেখেছি, মানব সভ্যতা ধ্বংস করবার জন্য আমাদের জন্ম নয়, তা রক্ষা করার জন্যই আমাদের জন্ম, তবেই যুদ্ধ হবে বন্ধ। রক্ষা পাবে সভ্যতা, রক্ষা পাবে সংস্কৃতি, রক্ষা পাবে শান্তি। স্বচ্ছ চিন্তাশক্তিতে মানবতাবাদী প্রাবন্ধিক এখানে বিশ্বজনীন।

যে প্রাবন্ধিক তাঁর নানা লেখায় Art for people's sake, Art for social sake বলেছেন তাঁর নিজস্ব নন্দন তত্ত্বটি কেমন ছিল নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করাটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রেও তিনি আমাদের নিরাশ করেননি। 'তিলোত্তমা' নামে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তার সাক্ষ্য আছে। এটি সরকারি চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের শত বার্ষিকী উৎসবে (মার্চ, ১৯৬৫) প্রধান অতিথি হিসেবে প্রদত্ত ভাষণ। এখানে তিনি বলছেন, এটা ভাঙাগড়ার যুগ। ব্যষ্টির যুগ গিয়ে আসছে সমষ্টির যুগ। ব্যক্তিতন্ত্রের জায়গায় আসছে সমাজতন্ত্র। সারা দুনিয়ায় এই ভাঙাগড়া চলছে, চল্‌ছে আমাদের দেশেও। প্রচুর লোকের প্রভূততম হিতসাধনই আজ গণতন্ত্রের লক্ষ্য। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই আজ আমাদের সংবিধানের মোক্ষ। সৌন্দর্যবোধ ও রসোপলব্ধির আজ তাই নতুন দিকদর্শন, নতুন মূল্যায়ন অপরিহার্য। নন্দনতত্ত্ব আজ তাই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে উদ্ভাসিত।':

নাট্যকার রচিত

১. সিনেমায় বাংলার দান	রূপমঞ্চ	১৯৪১
২. জাতীয় রঙ্গমঞ্চ	আনন্দবাজার পত্রিকা	১৯৪২
৩. স্বাধীন ভারতে রঙ্গালয়	” ”	১৯৪৯
৪. The Indian Theatre Today	Kala Bikas-Kendra,	1956
৫. অহীনদা আমাদের গর্ব	চিত্রবাণী, অহীন্দ্র সংখ্যা,	১৯৫৬
৬. পুরনো দিনের অভিনয়	রূপমঞ্চ শারদীয়া,	১৯৫৮
৭. স্মরণে (গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে)	চিত্রিতা শারদীয়া	১৯৫৯
৮. অলিখিত এক মহানাটক (শিশির কুমার সম্পর্কে)	রূপমঞ্চ	ঐ
৯. নাট্যাচার্য শিশির কুমার ও নাট্যশালা	অন্যমনে,	ঐ
১০. নবনাট্য আন্দোলন	গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত	১৯৬১
১১. বাংলা নাটকের গতি প্রকৃতি	গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত	১৯৬১
১২. অন্তহীন ছবি	রূপমঞ্চ শারদীয়া,	১৯৬২
১৩. ছবি একজন স্রষ্টার নাম	সূত্রধার, শারদীয়া,	১৯৬২
১৪. স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা	ঐ	১৯৬৩

১৫. শিশু নাটক	ঐ	১৯৬৪
১৬. আত্মরক্ষার আর এক হাতিয়ার : সাহিত্য	গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত	১৯৬৪
১৭. Bengali stage and outfight for freedom	Amrita Bazar Patrika	25.4.65
১৮. অনন্তপ্রাণ	গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত	১৯৬৫
১৯. তিলোত্তমা	ঐ	১৯৬৫
২০. আজকের সংকট ও নাট্যদলের দায়িত্ব	গণনাট্য, প্রথমবর্ষ	১৯৬৫
২১. অগ্রগতির একুশ বছর	ঐ শারদীয়া	১৯৬৮
২২. স্বপ্ন নয় সত্য	সোভিয়েত দেশ সংখ্যা ১৪,	১৯৬৮
২৩. কি দেখলাম	গল্পভারতী আষাঢ়,	১৯৬৮
২৪. শতাব্দীর নাট্যসাধনা	ঐ	১৯৭১
২৫. সোভিয়েত দেশে একুশ দিন	নর্থবেঙ্গল পূজা সংখ্যা,	১৯৬৮
২৬. জাতীয় নাট্যশালা	যুগান্তর ৩রা সেপ্টেম্বর	১৯৭২
২৭. আমাদের রঙ্গমঞ্চ	রূপাঞ্জলি	
২৮. সাধারণ মঞ্চ ও আমি	অমৃত, ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যা	
২৯. প্রণতি গ্রহণ কর	নাট্যশালা শতবর্ষ স্মরণিকা পশ্চিম দিনাজপুর	১৯৭২
৩০. একাঙ্ক নাটকের কথা	গল্পভারতী, বিশেষ সংখ্যা,	১৯৭২
৩১. নাটক লেখার সমস্যা	গণনাট্য, শারদ সংখ্যা	১৯৮০
৩২. যা দেখেছি তা দেখাব (বার্টলট ব্রেশট)	এপিক থিয়েটার,	প্রথম সংখ্যা

মন্মথ ও সমকালীন নাট্যকার

বাংলা নাট্য সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার ক্ষেত্রে মন্মথ রায়ের অবদান সম্পর্কে আলোচনার আগে সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রযোজিত নাটকগুলির দিকে যদি দৃষ্টি দেওয়া যায় তখন দেখা যাবে তাঁর সমকালে বহু নাট্যকার এসেছেন। একটি বা দুটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের সুবাদে বহু সময়েই তাঁরা বাংলা নাটকের আলোচনায় স্থানও পেয়েছেন। তবু সকলের সঙ্গে তাঁর আলোচনা ব্যাপ্তির খাতিরেই প্রায় অসম্ভব। নাট্যকার হিসেবে যখন তিনি নবীন তাঁর আগে যে তিনজন অভিজ্ঞ নাট্যকার মঞ্চে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমেই তাঁদের সঙ্গে মন্মথ রায়ের নৈকট্য ও দূরত্ব আলোচনা করে নিলেই মন্মথ রায়ের বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠবে।

পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে নবীন মন্মথ রায়ের অব্যবহিত পূর্বেকার তিন বিশিষ্ট নাট্যকার হলেন—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। বাংলা রঙ্গমঞ্চকে এঁরা যথাক্রমে (১৮৭৭-১৯১২), (১৮৯৪-১৯২৬), এবং (১৮৯৫-১৯১৩) খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তাদের রচনা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন।

গিরিশচন্দ্র প্রথম জীবনে কৃত্তিবাসের রামায়ণকে সামনে রেখে রাবণবধ, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ বর্জন, সীতার বিবাহ, রামের বনবাস, সীতাহরণ প্রভৃতি লিখছেন। দায়ে পড়ে একান্ত প্রয়োজনে তিনি নাটক লেখা শুরু করেছেন। প্রথমে বঙ্কিম এবং মধুসূদন থেকে নাট্যরূপ দেওয়া এবং পরে শেক্সপীয়রকে সামনে রেখে অনুবাদ, ও নাটক রচনায় আদর্শও তাঁর নাট্যাদর্শও মেনেছেন। আদিম প্রবৃত্তির সংঘাত, যেমন প্রতিশোধ, পাগলামি অত্যাচার, প্রতিহিংসা, কামনা, ঈর্ষা প্রভৃতি প্রবল ভাবগুলি নিয়ে তিনি নাটক রচনা করেছেন। একদিকে কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস তাঁর ভাষার বনিয়াদ, অন্যদিকে শেক্সপীয়র তাঁর আদর্শ। হিন্দু ধর্মের গৌরবময় নবোত্থানের যুগ তখন, ইয়ংবেঙ্গল আর ব্রাহ্ম আন্দোলনের চাঞ্চল্য ক্রমশ স্তিমিত অথচ তাঁর ধর্মীয় আদর্শ রামকৃষ্ণ দেব। সঙ্গে রয়েছে বিবেকানন্দের দুর্লভ সঙ্গ। তাঁর পৌরাণিক নাটকে শুধু পুরাণ নয় ভক্তি ও ধর্মের মিশেল ছিল। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'বিল্বমঙ্গল, শেক্সপীয়রেরও উপরে গিয়াছে আমি এরূপ উচ্চভাবের গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই।' তাঁর চিন্তামণি বার্নাড শ'-এর নয়, শরৎচন্দ্রের চন্দ্রমুখী নয়, রামকৃষ্ণের সংস্পর্শ জনিত "পতিতের প্রতি কৃপা" থেকে সৃষ্ট তাঁর পৌরাণিক নাটক। নাটকে তিনি গম্ভীর বিষয় উপস্থাপনে পদ্যছন্দ ব্যবহার করেছেন যা 'গৈরিশী' নামে খ্যাত। 'ভক্ত ধ্রুব' প্রভৃতি নাটক ভক্তিরসে উদ্বেল। 'জনা' ও 'পাণ্ডব গৌরব' তাঁর পৌরাণিক নাটকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রবল অনুরাগকে, ধর্মভাব ও অলৌকিকত্বকে তাঁর নাটকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিষয় হল পৌরাণিক, রস হল অন্তরের ভক্তিরস। তাঁর স্বাভাবিক ক্ষেত্রে যা স্বতঃস্ফূর্ততা লাভ করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের বস্তুবাদী ইহসর্বস্ব মন পৌরাণিক ধর্মাদর্শ সম্বন্ধে আগ্রহপরায়ণ ছিল না। ক্ষীরোদ প্রসাদ বহুক্ষেত্রে দর্শকের কাছে জনপ্রিয় হলেও

'ভীষ্ম' নাটকের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র বা ক্ষীরোদপ্রসাদের মত মঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কোনোদিন যুক্ত ছিলেন না। লণ্ডনে ইংরাজী নাটকের অভিনয় দেখে তাঁর নাটকের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। তাঁর পাষাণী, সীতা এবং ভীষ্মকে যথার্থ পৌরাণিক নাটক বলা যাবে কিনা সে বিষয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে বিরোধ আছে। গিরিশ প্রভাবে তিনি পৌরাণিক নাটক লিখতে গিয়ে বুঝলেন অমিত্রাক্ষরে তাঁর বিশেষ দখল নেই। গদ্যের শাণিত যুক্তি, বস্তুর প্রতি নিষ্ঠা এবং তাঁর নিজস্ব অধ্যাত্মবিরোধী মন ঠিক পৌরাণিক নাটকের উপযোগী ছিল না। সেদিক থেকে ক্ষীরোদ প্রসাদের ভাষা সরল অনাড়ম্বর কিন্তু সংলাপ দীর্ঘ আর মাঝে মাঝেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রকৃতিবর্ণন ও ইচ্ছাকৃত কবিত্ব সৃষ্টির চেষ্টায়। মন্মথ রায় পৌরাণিক নাটক লিখেছেন কিন্তু তাঁর এই ধরনের নাটক হয়ে উঠেছে জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র এই দুই ভাবাদর্শের বাহক। স্বদেশ প্রেমের ঐতিহ্যে তার লালন। 'কারাগার'-কে তাই কেউ কেউ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নাটক হিসেবেও দেখেছেন। পরাধীন দেশের নাট্যকার পৌরাণিক আখ্যানের ফ্রেমে সমকালীন বক্তব্যকে প্রকাশ করার দুঃসাহসী পথটিকেই গ্রহণ করেছেন। কল্লোল যুগের সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রেখে তিনি প্রচলিত সমাজনীতির বিরুদ্ধে এবং নিষিদ্ধ ও নিন্দিত জীবনের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন।

পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে চার নাট্যকার

গিরিশচন্দ্র		ক্ষীরোদপ্রসাদ		দ্বিজেন্দ্রলাল		মন্মথরায়	
বিল্বমঙ্গল -	১৮৮৮	বভ্রুবাহন -	১৯০০	পাষাণী -	১৯০০	চাঁদ সদাগর -	১৯২৭
জনা -	১৮৯৪	ভীষ্ম -	১৯১৪	সীতা -	১৯০৮	দেবাসুর -	১৯২৮
পাণ্ডবগৌরব -	১৯০০	নরনারায়ণ -	১৯২৭	ভীষ্ম -	১৯১৪	কারাগার -	১৯৩০

গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রায় একই সময়ে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের ক্ষমতা ছিল ভিন্নধর্মী। গিরিশচন্দ্র রঙ্গালয়ের প্রতিযোগিতায় ঐতিহাসিক নাটক লিখতে বাধ্য হলেও তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা ছিল অন্যত্র। অথচ ঐতিহাসিক নাটকের পূর্ণরূপ দ্বিজেন্দ্রলালের জন্য যেন অপেক্ষমাণ ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের সামগ্রিক নাট্যরচনা নিয়ে গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন, 'আপনার উপরে আমার অগাধ আশা। ভবিষ্যতে আপনিই এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার।' তবু আমাদের মনে হয় তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের কথা ভেবেই একথা বলেছেন। মানবতার মহৎ গৌরব দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনীতে গভীরভাবে প্রস্ফুটিত। দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টি বস্তু জগতে নিবদ্ধ, সেখানে ক্ষীরোদপ্রসাদের সৃষ্টি অলৌকিক রহস্যে ভরা। মন্মথ রায় এই তিন নাট্যকারের দ্বারা ঐতিহাসিক নাট্যরচনায় প্রভাবিত হয়েও দ্বিজেন্দ্রলালের কাছাকাছি।

ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে চার নাট্যকার

গিরিশচন্দ্র		ক্ষীরোদপ্রসাদ		দ্বিজেন্দ্রলাল		মন্মথরায়	
সিরাজদ্দৌলা-	১৯০৬	প্রতাপাদিত্য-	১৯০৩	তারাবাই-	১৯০৩	মীরকাশিম-	১৯৩৮
মীরকাশিম	১৯০৬	রঘুবীর-	১৯০৩	প্রতাপ সিং-	১৯০৫	অশোক-	১৯৩৩
ছত্রপতি শিবাজী	১৯০৭	অশোক-	১৯০৮	দুর্গাদাস-	১৯০৬		
অশোক-	১৯১১	আলমগীর-	১৯২১	নূরজাহান-	১৯০৮		
				মেবার পতন-	১৯০৮		
				সাজাহান-	১৯০৯		
				চন্দ্রগুপ্ত-	১৯১১		

সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে বোধকরি মন্মথ রায় পূর্বসূরীদের দ্বারা তত্টা প্রভাবিত নন। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' বা 'বলিদানে'র মত সামাজিক নাটক যেমন তিনি লেখেননি, দ্বিজেন্দ্রলালের মত প্রহসনও নয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের সামাজিক নাটক তেমন নেই বললেই হয়। এদিক থেকে মন্মথ রায় নিজেই এগিয়ে এসেছেন। দুই ও তিনের দশকের জাতীয়বাদী নাট্যকারদের মধ্যে তিনি এক বিশিষ্ট ব্যতিক্রম, যিনি মূলত জাতীয়তার প্রবক্তা হয়েও গণনাট্যের অনন্যতা উপলব্ধি করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে সেই মর্মবস্তুকে গ্রথিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

আরও তিন নাট্যকারের সঙ্গে মন্মথর তুলনা স্বতঃই এসে পড়ে, তাঁরা হলেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯৩-১৯৬১), বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯০৭-১৯৮৬) এবং মহেন্দ্র গুপ্ত (১৯১১-১৯৮৪)। সমসাময়িকতা এঁদের নির্বাচনের একটি কারণ হলেও বিভিন্ন নাট্যরচনার দ্বারা বোধকরি এঁরাই যুগের প্রতিনিধিত্ব করবার যোগ্য। মন্মথ রায়ের নাট্যরচনার সঙ্গে এঁদের আলোচনা তাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

শচীন্দ্রনাথ কৈশোর, যৌবনের সন্ধিক্ষণে অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন। বিজলী, আত্মশক্তি, নবশক্তি, নটরাজ, ঘরে-বাইরে, কৃষক, ভারত প্রভৃতি নানা পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'বিজলী'তে তাঁর কিছু মন্তব্য তর্কাতীত না হলেও শ্রীঅরবিন্দের অনুমোদন লাভ করে। বাইরে থেকে তিনি ছিলেন ভীষণ কঠোর কিন্তু ভেতরটা ছিল তাঁর নরম শাঁস আর জলে ভর্তি। দিনের পর দিন অভুক্ত থেকেও নাট্যরচনার কঠিন তপস্যা করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁকে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের পাশে দেখা যায়। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন থেকে প্রগতি শিবিরের কাছাকাছি আসার মধ্যে দিয়ে তাঁর নাটক সৃজনে দেখি দেশাত্মবোধক নাটকের পাশাপাশি, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক। প্রচুর লিখেছেন তিনি। প্রায় ৪৫টি নাটকের মধ্যে অন্তত ১০।১২-টিকে মঞ্চ সফল আখ্যা দেওয়া যায়। সাংবাদিকতা থেকে নাট্য সমালোচনা এবং পরে নাট্যকার হবার গৌরব তাঁর। মঞ্চের সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল আবার চিত্রনাট্য লেখার গৌরবও রয়েছে। মঞ্চ ব্যবস্থা এবং মঞ্চের অভিনেতা অভিনেত্রীদের ভেবে নাটক নাট্যকারদের লিখতেই হয়। তৎকালীন অতি আধুনিক মঞ্চ ব্যবস্থা যা সতু সেন করেছিলেন বেশির ভাগ তাঁর

নাট্যরচনাকে কেন্দ্র করেই। নাট্যকারের গৌরব এখানেই। তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা' তাঁরই, গিরিশচন্দ্রের নয়। তিনি হিন্দু মুসলমানের মিলনাদর্শের প্রতি যে জোর দিয়েছিলেন সেটি সময়ের পক্ষে ছিল একান্ত উপযোগী। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে আবুল হাসান, রাষ্ট্রবিপ্লব (দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' প্রভাবিত), কামাল আতার্তুক বাংলার প্রতাপের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে চোখে পড়ে তা হল ঘনপিনদ্ধ কাহিনী। সংলাপের জোর তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের প্রাণ। গৈরিক পতাকা, ধাত্রী পান্না, দশের দাবী, নরদেবতা, সংগ্রাম ও শান্তি, এই স্বাধীনতা প্রভৃতি নাটকে তিনি দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করেছেন। সে যুগের দর্শকের কাছে তিনি শক্তিশালী সংলাপের জন্য শ্রদ্ধেয় ছিলেন। চরিত্রের আবেগ ও সংঘাত দিয়ে নাট্যক্রিয়াকে গতিশীল করার রহস্য তিনি জানতেন, আর চরিত্রের এই ভাবময়তা ও জটিলতা দর্শককে মুগ্ধ করেছে। তাঁর সামাজিক নাটকে সমস্যার অবতারণা তীক্ষ্ণ তীব্র। স্বামী-স্ত্রী (বিয়র্সনে'র এ নিউলি ম্যারেড কাপল), কাঁটা ও কমল (মোঁপাসা'র ইউজলেস বিউটি) নাটকগুলির মধ্যেও শ' এবং ইবসেন' এর নাটক পাঠের প্রভাব অনুভূত হয়।

বিধায়ক ভট্টাচার্য পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নাট্যরচনার ধার কাছ দিয়েও যাননি। তাঁর সমগ্র নাট্যরচনার অধিকাংশই সামাজিক। আধুনিক বাঙালী পরিবারের সমস্যার বাস্তব চিত্র তাঁর নাটকে প্রস্ফুটিত। সমস্যাকে ছুঁতে পারলেই সার্থকতা আসে না। তাকে শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনার মধ্যে দিয়ে বিকশিত হতে হয়। ঘটনার সংস্থাপনে তিনি বড় সুচতুরভাবে নাটকের চরিত্রগুলিকে আনতে পেরেছেন যাতে নাট্যগতি অতি সাবলীল ভাবে ভাসতে ভাসতে অন্তিমে পৌঁছে যায়। 'মাটির ঘর' প্রসঙ্গে কোনো কোনো সমালোচক তো বলেই ফেলেছেন, "আধুনিক সমস্ত নাটকের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ একথা বলিলে অতিরঞ্জন হয় না।" (বাংলা নাটকের ইতিহাস, ড. অজিত কুমার ঘোষ)। তন্দ্রা, নন্দা ও ছন্দা তিন ভাগ্য বিড়ম্বিতার জীবনে সঙ্গতি আছে আর কোথায় যেন এ বিষাদের কাহিনী একান্তই আমাদের। ব্যক্তিত্বময়ী হয়েও ভাগ্যের হাতে তারা পর্যুদস্ত। আর তাদের পিতা সত্যপ্রসন্নের ট্র্যাজেডিও অসহনীয়। সাধারণত মিলনের মধ্যে দিয়ে নাটক দেখতে অভ্যস্ত দর্শক, এ নাটক দেখে জমাট কান্না বুকে চেপে দর্শকাসন ত্যাগ করতো, আর এখানেই নাট্যকারের সার্থকতা। 'মেঘ মুক্তি'র মধ্যে আছে স্বামী-স্ত্রীর সন্দেহ পরে তার নিরসন। 'তাইতো' বাংলার বিশিষ্ট একটি কমেডি। মল্লিকা ও বল্লিকা দুই সাহসিনী আধুনিকাকে নিয়ে এক কৌতুকময় উপাখ্যান। 'বিশ বছর আগে'-তে রয়েছে ত্রিকোণ প্রেমের দ্বন্দ্ব। এক নায়িকা দুই নায়কের দ্বন্দ্ব। বিশ বছর আগের শোচনীয় ঘটনার পর নায়ক আবার ঘটনাস্থলে এসেছে। এ নাটকের ঘটনা যেন পরিণতির দিকে অনিবার্য ভাবে যায়নি, তবু তাঁর সংলাপের গুণ ছিল ঈর্ষনীয়। 'ক্ষুধা' নাটক নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবন নিয়ে যেন এক নিখুঁত ফোটোগ্রাফ। ছোট্ট সরস, সহজ ও সরল সংলাপ দিয়ে তিনি চরিত্রগুলিকে যেন নির্মাণ করেছেন। তাই তিনি 'মধু সংলাপী' বিশেষণে বিশেষিত হয়েছেন।

মহেন্দ্র গুপ্ত মূলত ঐতিহাসিক নাট্যরচনার খ্যাতি অর্জন করলেও নানা ধরনের নাটকই লিখেছেন। ইতিহাসের উপাদান থাকলেও ব্যক্তি-দ্বন্দ্বময়তায় এবং সূক্ষ্ম ভাবাবেগের ক্রিয়া চাঞ্চল্যে তাঁর নাটক বিশেষ অভিব্যক্ত নয়। তাঁর রানী ভবানী, রানী দুর্গাবতী, মহারাজা নন্দকুমার, টিপু সুলতান, পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ সাধারণ্যে প্রবল আবেগ সৃষ্টি করেছিল। সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। অভিনেতা ও নির্দেশক রূপেও তাঁর নাটকেরই প্রধান চরিত্রে তাঁকেই মানুষ দেখতে পেত। 'টিপু সুলতান'-এ স্বাধীনচেতা স্বদেশ হিতব্রতী টিপু জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় উজ্জ্বল। এ নাটকে হিন্দু-মুসলমান মিলনের আদর্শ আছে। ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি সুচিত্রিত কিন্তু স্ত্রী চরিত্রগুলি তেমন উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠেনি। 'পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ' নাটকে নাট্যরস খানিক কম হলেও বিচার ও কর্তব্যপ্রাণতায় নায়ক চরিত্র সুন্দর। রণজিতের মা, রাজকৌড় এবং পত্নী খড়্গসিংহের বিমাতা ঝিন্দন বাঈ-এর মহত্ত্বের দৃশ্যায়ন খুবই আকর্ষণীয়। নাট্যকার ঐতিহাসিক তথ্য নিষ্ঠার চেয়ে আবেগকে প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি। ইংরেজের সঙ্গে যাঁরাই সংগ্রাম বা বিবাদ করেছেন সবাই দেশহিতব্রতী ও ন্যায়পরায়ণ। অত্যাচারী বৈদেশিক শক্তি দ্বারা অন্যায়ভাবে পরাজিত। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি রোমাণ্টিকধর্মী।

১৯৩৮ থেকে মন্মথ রায় মূলত পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। ঠিক এই সময়ে বা তার একটু আগে পরে অপর তিন নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য এবং মহেন্দ্র গুপ্তের নাট্যরচনার একটি তালিকা সন্নিবেশিত হল। মন্মথ অবশ্য এ সময়ে একাঙ্ক সৃজন করে গিয়েছেন।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রক্তকমল ১৯২৯ গৈরিক পতাকা ১৯৩০ ঝড়ের রাতে ১৯৩১ সতীতীর্থ ১৯৩২ জননী ১৯৩৩ দশের দাবী ১৯৩৪ আবুল হাসান ১৯৩৫ বাংলার দুলাল ১৯৩৫ নরদেবতা ১৯৩৫, স্বামী স্ত্রী ১৯৩৭, প্রলয় ১৯৩৭, কালের দাবী ১৯৩৮, সিরাজদ্দৌলা ১৯৩৮, তটিনীর বিচার ১৯৩৯, সংগ্রাম ও শান্তি ১৯৩৯, নার্সিং হোম ১৯৪০, হর-পার্বতী ১৯৪০, সুপ্রিয়ার কীর্তি ১৯৪২, কাঁটা ও কমল ১৯৪২, মাটির মায়া ১৯৪৩, ধাত্রী পান্না ১৯৪৩, রাষ্ট্র বিপ্লব ১৯৪৬, বাংলার প্রতাপ ১৯৪৭, স্বাধীনতার সাধনা ১৯৪৭, এই স্বাধীনতা ১৯৪৭, তুষার কণা ১৯৫১, সবার উপরে মানুষ সত্য ১৯৫৬ , আর্তনাদ ও জয়নাদ ১৯৬১

বিধায়ক ভট্টাচার্য

মেঘমুক্তি ১৯৩৮, মাটির ঘর ১৯৩৯, কুহকিনী ১৯৩৯, মালা রায় ১৯৪০, বিশ বছর আগে ১৯৪০, রত্নদীপ ১৯৪০, রক্তের ডাক ১৯৪১, তুমি আর আমি ১৯৪২, চিরন্তনী - ১৯৪২, তেরশো পঞ্চাশ ১৯৪৬, সেই তিমিরে ১৯৫২, কাতব কান্তা ১৯৫৩, পিতা পুত্র ১৯৫৪, ঝাঁসির রানী ১৯৫৪, যুগাবতার রামকৃষ্ণ ১৯৫৫, মনোময়ী ১৯৫৬, ক্ষুধা ১৯৫৭, কান্নাহাসির পালা ১৯৬০

মহেন্দ্র গুপ্ত

গয়াতীর্থ ১৯৩৭, চক্রধারী ১৯৩৮, অভিযান ১৯৩৯, সোনার বাংলা ১৯৩৯, পঞ্জাব কেশরী, রণজিৎ সিং ১৯৪০, সতী ১৯৪০, গঙ্গাবতরণ ১৯৪০, অলকানন্দা ১৯৪২, রানী দুর্গাবতী ১৯৪৩, মহারাজ নন্দকুমার ১৯৪৩, টিপু সুলতান ১৯৪৪, মঞ্চে ও নেপথ্যে ১৯৪৫, রায়গড় ১৯৪৭, শ্রী দুর্গা ১৯৪৭

মন্মথ রায় সামাজিক নাটক রচনা করেছেন স্বাধীনতা পরবর্তী কালে। ১৯৪৪ সাল থেকে যে নতুন ধরনের নাটকরচনা শুরু হল 'নবান্ন' দিয়ে তারপর থেকে বাংলা সামাজিক নাটকের ধারা বদলে গেল। এই পর্যায়ের তিন প্রখ্যাত নাট্যকার হলেন বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭৭), দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৯০), এবং তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫১)। এঁদের সঙ্গেও মন্মথ রায় একটা আত্মিক যোগ অনুভব করেছিলেন।

বিজন ভট্টাচার্যকে দিয়েই গণনাট্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অভিনয় নাট্য প্রযোজনা ও পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নাটকরচনা করে গেছেন। সুগভীর সমাজ চেতনা ও প্রগতিমূলক চিন্তাধারা তাঁর সব নাটকেরই অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে। জবানবন্দী, নবান্ন, গোত্রান্তর, কলক, মরা চাঁদ, অবরোধ, দেবী গর্জ্জন, গর্ভবতী জননী, আজ বসন্ত, কৃষ্ণ পক্ষ, চলো সাগরে প্রভৃতি অসংখ্য নাটকে নাট্যকাঁর অতি সাধারণ মানুষের প্রতি কিভাবে দায়িত্বশীল হতে হয় তা দেখিয়েছেন। এর জন্য সম্মিলিত অভিনয় ধারার নতুন প্রয়োগও তাঁকে করতে হয়েছে। তিনি সঠিকভাবেই জানতেন বাস্তবের একটা অখণ্ড রূপ কী করে সাবলীলভাবে মঞ্চের ওপরে তুলে ধরা যায়। চার পাঁচের দশকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে বিপর্যয় ও বিপ্লবজনক বহু ঘটনা ঘটে যায় আর এর ফলে বাঙালীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা দারুণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী ধ্বংসাত্মক প্রভাব, ৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ৪৩-এর মন্বন্তর, ৪৭-এর বাংলা ভাগ করে পাওয়া ভারতের স্বাধীনতা বিপুলভাবে তাঁর নাটকে প্রভাব ফেলে। যুদ্ধের সুযোগে ঠিকাদার, মজুতদার, কালোবাজারের কারবারীরা সমাজের শেষ রক্তটুকু শুষে নিতে থাকে। এই অবক্ষয়ের পটভূমিকায় সর্বহারা মানুষদের নিয়েই বিজন ভট্টাচার্যের সমগ্র নাট্যরচনা।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই একই সময়কালের এক অত্যন্ত উৎসাহী নাট্যকর্মী ও নাট্যকার। পাশ্চাত্য নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ এবং আধুনিক মার্কসবাদী সমাজদর্শন চিন্তা সমন্বিত তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি সমান মূল্যবান। তাঁর অন্তরাল, তরঙ্গ, বাস্তুভিটা, মোকাবিলা, মশাল, জীবনস্রোত, দীপশিখা, নাটকগুলি শুধু মঞ্চাভিনয়েই নয় সাহিত্যেও স্থান পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ভাববিলাসহীন বস্তুবাদের ওপর তাঁর নাট্যরচনা তাঁকে অগ্রণী করে তুলেছে। যুদ্ধোত্তর বাঙালী জীবনের নানা প্রশ্ন ও সমস্যার আবর্ত তাঁর নাটকগুলির প্রাণ। আর্থিক সংকট, শ্রমিক মালিক

বিরোধ, মেকি জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব অনিবার্যভাবেই তাঁর নাটকে এসেছে। সমস্যাগুলির বিচার ও বিশ্লেষণে মার্কসীয় তত্ত্ব প্রয়োগ কোনো কোনো সমালোচকের মতের বিরুদ্ধে গেলেও মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম দরদে তিনি সকল দর্শক এবং পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছেন। নাট্যকারের বাস্তব দৃষ্টিতে দৃঢ়তার পরিচয় আছে, ফলে নাটকীয় গতির সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক শক্তির উত্তাপ ও উত্তেজনা দর্শক শ্রোতারা অনায়াসে অনুভব করেছেন।

তুলসী লাহিড়ী তাঁর 'দুঃখীর ইমান' নাটকের নিবেদনে বলেছেন, 'ধনতান্ত্রিক সভ্যতার চরম পরিণতি মন্বন্তরের দিনে এই চিরবঞ্চিত ও অবজ্ঞাতের দল, যারা ধনলোভীর যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছিল তাদের ছবি আঁকতেই এই নাটকের সৃষ্টি।' তাঁর প্রায় সব নাটক সম্পর্কেই একথা বলা চলে। পথিক, উলুখাগড়া, ছেঁড়াতার, বাংলার মাটি, লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার প্রভৃতি নাটকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সব একাকার হয়ে জড়িয়ে জটিল হয়ে উঠেছে। নাটকের প্রেরণা সম্পর্কে যেমন তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাংলার কৃষক ও রামধন পোদ'-এর কথা বলেছেন তেমনি সিঞ্জ, বার্ণাড'শ এবং এইচ.জি. ওয়েলস-এর কথাও বলেছেন। রবীন্দ্রনাথকেও বাদ দেননি। মন্বন্তর তাঁকে দিয়েছিল প্রত্যক্ষ, সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা যা তাঁর নাটকে যুক্ত হয়েছিল। অভিনেতা, নাট্যকর্মী, সঙ্গীত পরিচালনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকায় তাঁর নাটক হয়ে উঠেছিল ও বেদনাসমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার ফসল। দেশ বিভাজন তাঁকে দারুণ দুঃখ দিয়েছিল, তাই তাঁর বহু নাটকই তদানীন্তন ভাঙা বাংলার দীন মনের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের চার নাট্যকার

বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭৭)		তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫১)		দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮—১৯৯০)		মন্মথ রায় (১৮৯৯--১৯৮৮)	
আগুন	১৯৪৩	দুঃখীর ইমান	১৯৪৭	অন্তরাল	১৯৪৫		
জবানবন্দী	১৯৪৪	পথিক	১৯৪৮	তরঙ্গ	১৯৪৬	মহাভারতী	১৯৫২
নবান্ন	১৯৪৪	ছেঁড়াতার	১৯৫৩	বাস্তুভিটা	১৯৪৭	মমতাময়ী হাসপাতাল	১৯৫২
অবরোধ	১৯৪৬	বাংলার মাটি	১৯৫৩	মোকাবিলা	১৯৪৯		
মরাচাঁদ	১৯৪৬	লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার	১৯৫৯	মশাল	১৯৫৪	পথে-বিপথে	১৯৫৩
জীয়ন কন্যা	১৯৪৭			দীপশিখা	-	আজবদেশ	১৯৫৩
কলঙ্ক	১৯৫১			জীবনস্রোত	১৯৬০	চাষীর প্রেম	১৯৫৩
জননেতা	১৯৫১					ধর্মঘট	১৯৫৩
জতুগৃহ	-						
গোত্রান্তর	১৯৫৯					জীবনমরণ	১৯৫৫
মরাচাঁদ	১৯৬১					আমরা কোথায়	১৯৫৫
ছায়াপথ	১৯৬১					লাঙ্গল	১৯৫৫
মাষ্টার মশাই	১৯৬১						
দেবী গর্জন	১৯৬৬					সাঁওতাল বিদ্রোহ	১৯৫৮

ধর্মগোলা	১৯৬৭
কৃষ্ণপক্ষ	১৯৬৭
নাবিক	-
গর্ভবতী জননী	১৯৬৯
স্বর্ণকুম্ভ	-
সোনার বাংলা	১৯৭১
আজ বসন্ত	-
চলো সাগরে	১৯৭১
চল্লী	-
হাঁসখালির হাঁস	১৯৭৪

বন্দিতা	১৯৫৯
বগ্‌ ডাকাত	১০৫৯
অমৃত অতীত	১৯৫৯
মহাপ্রেম	১৯৫৯
দুই আঙিনা- এক আকাশ	১৯৬০
বন্যা	১৯৬৩
মহাউদ্বোধন	১৯৬৩
দুর্গেশনন্দিনীর জন্ম	১৯৬৪
তারাস শেভচেঙ্কো	১৯৬৫
লালন ফকির	১৯৭০
১৮৭২	১৯৭২
শরৎ বিপ্লব	১৯৭৫
অমর প্রেম	১৯৭৬

সারনীগুলির দিকে তাকালে স্পষ্ট উপলব্ধ হয় নাট্যকাররা কিভাবে দর্শক, নাট্যশালা এবং সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছেন। অবশ্য সব নাট্যকারই যে হয়েছেন বা হতে পেরেছেন তা নয়। প্রথম যুগে মন্মথ রায় সরাসরি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাট্যরচনা করেছেন পূর্বসূরীদের দেখে। দর্শক চাহিদা ছিল সেইরকমই, নাট্যশালার অভিনেতা অভিনেত্রীরাও সেইভাবে তৈরি ছিলেন। দেশাত্মবোধ তাঁকে সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রতি দায়বদ্ধ করে তুলেছিল। অভিনেতা প্রধান নাট্যশালার আকর্ষণ তাঁদের মৃত্যুতে ক্রমশ কমতে থাকল। ১৯৪২ থেকে ১৯৫৬'র মধ্যে যোগেশ চৌধুরী (৪২), দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (৪৩), বিশ্বনাথ ভাদুড়ী (৪৫), রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (৪৫), শৈলেন চৌধুরী (৪৬), তারাসুন্দরী (৪৮), নির্মলেন্দু লাহিড়ী (৫০), বিনোদিনী (৫০ অবশ্য ইনি আগেই মঞ্চ ছেড়ে ছিলেন), কুসুম কুমারী (৫০), প্রভাদেবী (৫২), ভূমেন রায় (৫৩), জীবন গঙ্গোপাধ্যায় (৫০), তিনকড়ি চক্রবর্তী (৫৪), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (৫৪), নীহারবালা (৫৫), রবীন্দ্রমোহন রায় (৫৬) মৃত্যু বরণ করেন।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকে সাধারণত ব্যক্তি চরিত্রের নানা দ্বন্দ্বময় সংঘাতের মধ্যে দিয়ে উত্তরণ দেখানো হত। বিশিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্রীদের মৃত্যুতে এই ধরনের নাটকাভিনয়ই বন্ধ হয়ে যেতে থাকল।

তবু শিশির কুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র পুরোনো নাটকের অভিনয় চালিয়ে গেলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তৎজনিত দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর নাট্যকারদের অন্য ধরনের নাটক লিখতে বাধ্য করল। স্বাধীনতার একটা মধুর স্বাদ কিছুদিন নাট্যশালায় জড়িয়ে রইল। তারই মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রমুখ নাট্যকার ছেঁড়া পালেই হাল বেয়েছেন। মহেন্দ্র গুপ্তর মত নাট্যকারেরা পুরাতন স্মৃতিকে আঁকড়ে থাকার

ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। অন্যান্য নাট্যকারেরা চেষ্টা করেছেন ; আর জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে চলচ্চিত্রের নায়ক নায়িকার আকর্ষণে মঞ্চ চালাতে বাধ্য হয়েছেন নাট্যশালার মালিকেরা। আসলে অন্য এক আকর্ষণ মানুষকে টানতে শুরু করেছিল। শিশির ভাদুড়ী (প্রশ্ন, ১৯৫৩), অহীন্দ্র চৌধুরী (সাজাহান, ১৯৫০), এবং নরেশ মিত্র (ক্ষুধা, ১৯৫৭) প্রমূখ অভিনেতারা যখন মঞ্চ ছাড়লেন তখন ঐ যুগেরই অভিনয় ধারার প্রতিনিধি ছিলেন ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কমল মিত্র, মহেন্দ্র গুপ্ত, সরযূ দেবী প্রমুখ। কিন্তু নতুন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক লেখা হল না, হবার সম্ভাবনাও ছিল না। তাঁদের বর্ণময়, সূক্ষ্ম অভিনয়, সামাজিক নাটকে পর্যবসিত হল কোমল, স্নেহশীল অথবা কঠিন ধাতুতে গড়া পরিবারের কর্তা বা কল্যাণী গৃহকর্ত্রীর ভূমিকায়। অভিনেতাদের বয়সও বাড়ছিল, তরুণ নায়ক হবার যোগ্যতা এঁরা হারাচ্ছিলেন, দর্শকরা এঁদের দেখতে আর আগ্রহী হচ্ছিল না।

সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খেয়ালি বিত্তবানেরা আর নাট্যশালার মালিক রইলেন না, এবার এলেন ব্যবসাদার ঠিকাদার, হঠাৎ ফেঁপে ওঠা ধনীরা। শখ, খেয়াল, প্রমোদের জায়গায় এল লাভ, লাভ এবং লাভ। ক্রমাগত থিয়েটার মালিকের পরিবর্তন, আদর্শ নিষ্ঠার অভাব নাট্যশালাগুলিকে মলিন ও জীর্ণ করে দিল।

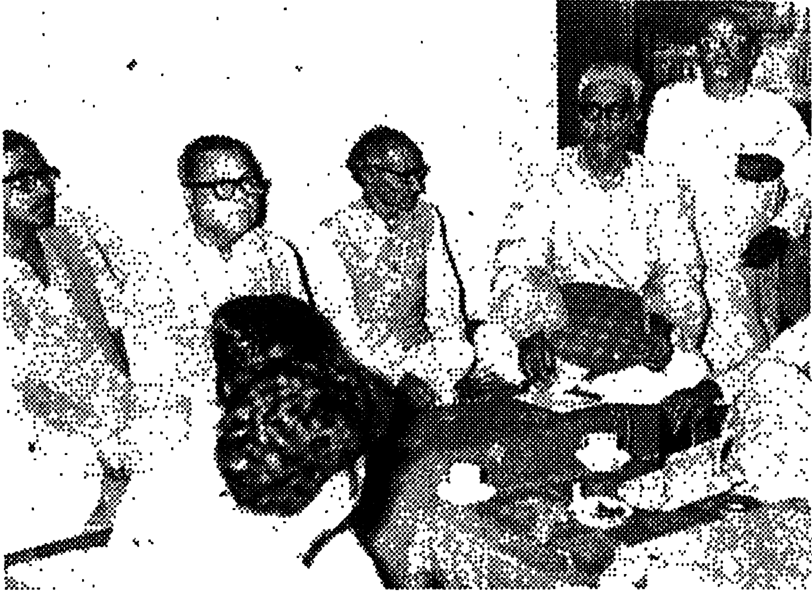
নাট্যকার মন্মথ রায় এই দিন বদলের সন্ধিক্ষণে বোধ করি শিল্পের আর এক অঙ্গনে নিজেকে নিয়োজিত রেখে তৈরি হচ্ছিলেন। গণনাট্যের আদর্শে বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ যে বার্তা বহন করে এনেছিলেন মন্মথ রায় তাকেই দ্রুত উপলব্ধি করে নিজেকে পরিবর্তিত করে নিলেন।

তাঁর সমসাময়িক প্রতিনিধিত্বমূলক নাট্যকারদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ সূত্রটি (সৃজনে) ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে।

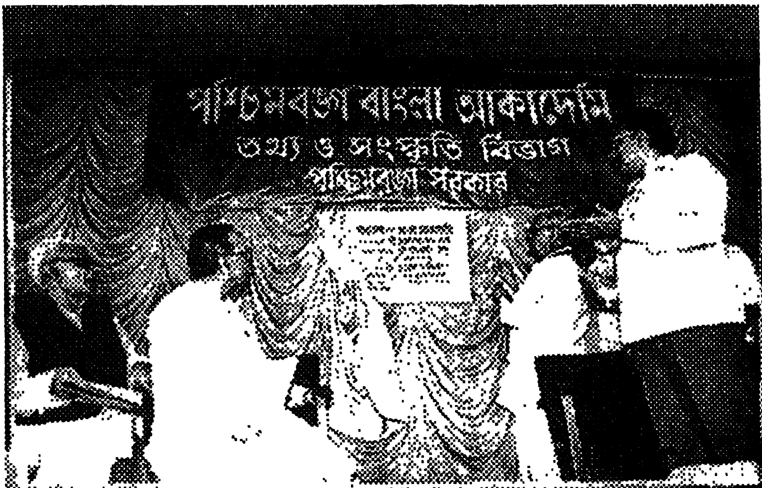
সমালোচকের দৃষ্টিতে 'মন্মথ'র অলংকৃত কবিত্ব সমৃদ্ধ ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। "রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ইঁহার ভাষাতেও প্রকৃতির অবগুণ্ঠন অপসৃত হইয়াছে ও তাহার নয়নাভিরাম রূপ ও সৌন্দর্য ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। মন্মথবাবুর সুনির্বাচিত অলঙ্কৃত বাক্য এক একটা তীব্র গতিশীল সুতীক্ষ্ণ তীরের ন্যায় মর্ম্মস্থলে আসিয়া বিঁধিতে থাকে।' (বাংলা নাটকের ইতিহাস, ড. অজিতকুমার ঘোষ)। সত্যিই তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অলংকরণের এই গুণটি গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা নাট্য সাহিত্যের আধুনিক যুগের দুটো ধারা থেকেই যদিও রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ধারাটি স্বতন্ত্র তবু একথা বলা যেতে পারে পুরাণ ইতিহাসের পথ ছেড়ে যাঁরা মানুষের মাঝখানে নাটককে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে আমাদের দিয়ে গিয়েছেন যা তাহল নাট্যরুচি। নাট্যরচনায় ও প্রযোজনায় পরবর্তীকাল তার সাক্ষ্য বহন করছে।

মন্মথ রায়ের পূর্বে পৌরাণিক নাটকে পদ্যসংলাপ ব্যবহার করা হত। তিনি চিরাচরিত নিয়মরীতি ভেঙে গদ্য সংলাপ দিলেন। কিন্তু এ গদ্য একেবারে প্রাত্যহিক জীবনের গদ্য নয়, এ গদ্য গভীর ভাব প্রকাশের উপযোগী এক কাব্য ভাষা। এতে

আবেগ আছে, আছে উচ্ছ্বাস, বর্ণ ও অলঙ্কারের আতিশয্য। তাই স্বভাবতই এ গদ্য রবীন্দ্রনাথের সংলাপকেই মনে করিয়ে দেয়। এছাড়া নাট্যকার নিজেও বলেছেন--'ভাষার সংকেত গূঢ় রহস্য-ব্যঞ্জনা আমি রবীন্দ্রনাথের নাটক থেকেই লাভ করি।'



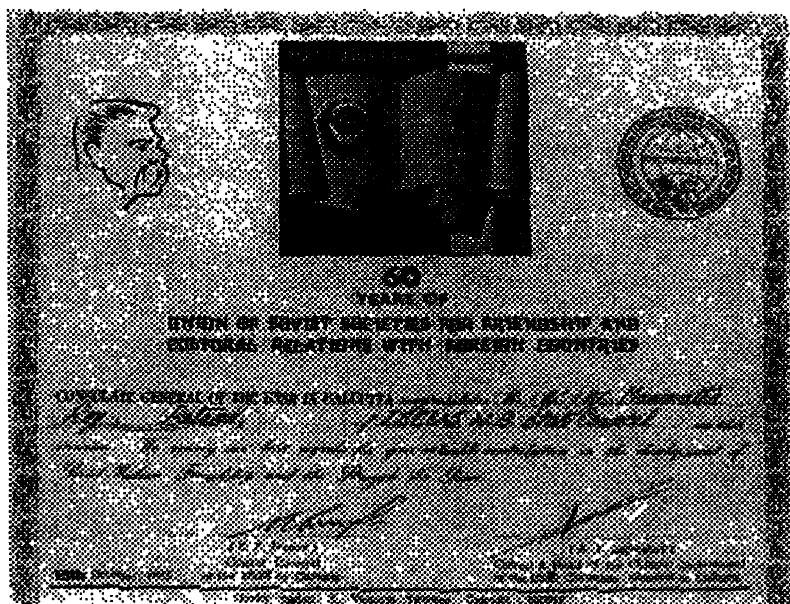
বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কার্যকরী সমিতির সভা ১৩.১১.৭১



পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উদ্বোধনে অন্নদাশঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও মন্মথ রায়



ইন্দিরা গান্ধী ও মন্মথ রায়



60
YEARS OF
UNION OF SOVIET SOCIETIES FOR FRIENDSHIP AND
CULTURAL RELATIONS WITH FOREIGN COUNTRIES

সোভিয়েত ল্যান্ড স্মারক সম্মান

॥ প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় সমীপে ॥

সুধী, অর্ধশতাব্দীব্যাপী নিরন্তর নাট্যরচনার মাধ্যমে আপনি প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বাংলা সাহিত্যে সার্থক একাঙ্ক নাটক রচনার গৌরবও আপনার। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠায় আপনি রাজরোষ উপেক্ষা করেছেন। আপনার 'কারাগার' নাটক সরকারী নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ে। আপনার একাধিক নাটক জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে দেশবাসীকে প্রেরণা দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা প্রতিষ্ঠার সময় আপনার কর্মকুশলতা একে প্রাণবন্ত করেছে। জাতীয় জীবনের বৃহত্তর কল্যাণকর্মে আপনি যুক্ত ছিলেন। জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণ, নাট্যানুষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণবিধি প্রত্যাহারের দাবি প্রভৃতি গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও আপনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন।

আপনার মহান গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্বে আমরা গর্বিত। স্বদেশে ও বিদেশে বহুতর সম্মানে আপনি ভূষিত হয়েছেন। সেইসঙ্গে যুক্ত হল আমাদের এই সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য।

আপনার দীর্ঘ সুস্থ ও কর্মময় জীবন কামনা করি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, [illegible]

সাংস্কৃতিক মনন ও দায়বদ্ধতা

সাংস্কৃতিক মনন ও দায়বদ্ধতা

'যে কোনো জিনিষ আমার প্রিয় তার মধ্যে আমি আপনাকে সত্য করে পাই বলেই তা প্রিয়, তাই সুন্দর। ...আমি চাই সেই চারুকলা, সেই কারিগরী শিল্প...যার আত্মাতে প্রতিফলিত হয় শুধু আমার নয়, আমার সমগ্র সমাজের আত্মিক চেতনা--তবেই আমি তাতে পাবো জীবন সত্য, তবেই আমি তাতে পাবো রসানন্দ। ...আজ গড়বার যুগ...গড়তে হবে গোটা দেশের সমাজের ভাগ্য। ...আজ আমাদের সাহিত্য, আমাদের সঙ্গীত, আমাদের চিন্তা, আমাদের কল্পনা, আমাদের স্বপ্ন সবকেই গড়ে উঠতে হবে সমাজের কল্যাণে...।" এই কথাগুলি মন্মথ বলেছিলেন চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণে (২.৩.৬৫)। কথাগুলি তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর এই আন্তরিক প্রত্যয়ের মূলে ছিল দৃঢ়তা সঞ্জাত এক ধারণা-- তাহল 'আত্মরক্ষার আর এক হাতিয়ার সাহিত্য'। মন্মথ তাঁর দীর্ঘ জীবন প্রবাহের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন নানা পটপরিবর্তন—সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে। লক্ষ্য করেছিলেন স্বাধীনতার জন্য কঠিন সংগ্রাম, আত্মত্যাগ, গভীর দুঃখবরণ, নিপীড়ন, নির্যাতন শোষণ এবং পাশাপাশি সুবিধাবাদী আপসকামিতা। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী পর্যায়ে নতুন দেশ, নতুন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে উদ্দীপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোহভঙ্গও হয়েছিল। কারণ প্রার্থিত স্বাধীনতার হাত ধরে এসেছিল আদর্শহীনতা মূল্যবোধের অবনমন--যদিও এর বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামও সে যুগে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

ফলে মন্মথর সাংস্কৃতিক মননে সর্বদাই জাগরূক ছিল এক সাবধানী বিবেক। সব সময়েতেই যা তাঁকে সঠিক পথনির্দেশ করেছে এবং তিনিও দৃঢ়তার সঙ্গে সেই পথ হেঁটেছেন তাঁর বিশ্বাসের ওপর ভর করেই। সোচ্চারে ঘোষণা করতে পিছ্‌পা হননি-- 'আমাদের সামনে আজ এক অগ্নিপরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে জাতি ও সমাজের যে উৎসাহ, যে উদ্যম এবং যে দেশাত্মবোধ চাই, তা সঞ্চার করাই আজ সাহিত্যের পরমতম কর্তব্য—চরমতম দায়িত্ব।" নিছক কলাবিলাস চর্চায় মন্মথ অভ্যস্থ ছিলেন না। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে দেখেছিলেন জনজীবনকে উদ্বেলিত করার মত বহু ঘটনাবলী। সবসময়ই কিন্তু তিনি যুগোপযোগী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন—কখনো শাণিত কলমের সাহায্যে, কখনো বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে। কখনো কিন্তু তাঁকে পিছু হটতে হয়নি বরং তিনি নাটক সৃজনের পাশাপাশি নিজের অসংখ্য কর্মধারাকে ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন নানা ক্ষেত্রে। তার থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিতে তিনি শুধু 'নাট্যকার' পরিচয়ের ছোট্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকেননি। যদিও নিজের নামের আগে 'নাট্যকার' কথাটি লিখতে তিনি খুব ভালবাসতেন। দায়িত্বপূর্ণ সরকারি কাজ করার পাশাপাশি অচিরেই তিনি নাট্য আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতারূপে সকলের কাছে পরিচিত হয়ে গেলেন।

১৯৩৮ থেকে প্রায় চোদ্দ বছর জীবন জীবিকার তাগিদে মন্মথ সাধারণ রঙ্গালয়ের

প্রয়োজনে নাটক লেখা থেকে বিরত ছিলেন। ফলে এই দীর্ঘ সময় ধরে তিনি পেশাদার মঞ্চের ক্ষেত্রটি থেকে বেশ দূরে সরে গিয়েছিলেন। অপেশাদার নাট্য আন্দোলন (১৯৪৪/নবান্ন) তখন বেশ জোরদার। দেশের মেহনতী শ্রেণীর স্বার্থে সংস্কৃতি কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিলেন। সারা দেশ জুড়ে তখন নতুন ভাবাবেগের জোয়ার। নাট্যকার এই যুগান্ত সৃষ্টিকারী ঘটনাধারার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। পরবর্তীকালে তা সগর্বে ঘোষণা করতেও ভোলেননি। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৩৭তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে বলেছিলেন (১৯৬১) "নতুন এক সৃষ্টি, নতুন এক ভাবাদর্শ নিয়ে বাংলায় শুরু হয়ে গেল নবনাট্য আন্দোলন। পেশাদার নাট্যশালার বাইরে অপেশাদার নাট্যসঙ্ঘও যে জনচিত্ত জয়কারী অভিনয়ে সমর্থ—এটা নতুন করে প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী গঠনের জোয়ার এসে গেল দেশে। যুগসত্যকে রূপায়িত করে যুগমানস প্রতিফলিত করে নাট্যকাররা লিখতে লাগলেন যুগোপযোগী নাটক। নাটক ও তার প্রযোজনা নিয়ে শুরু হয়ে গেল নানা পরীক্ষা ও নিরীক্ষা।"

মন্মথ ছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নাট্যকার। তিনি তাঁর সমকালকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন নিখুঁতভাবে। তাঁর দেশাত্মবোধক প্রতিবাদী সত্তা সব সময়েতেই দেশের মানুষের ব্যাপকতম অংশের আন্তরিক চাহিদার সঙ্গে সমন্বিত করে নিয়েছিল নিজেকে। ১৯৩৯ থেকে ১৯৫২ এই পর্যায়ে আমাদের দেশে ঘটে গিয়েছিল অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যার অভিঘাত এড়ানো মন্মথর পক্ষে সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে আমাদের দেশেও এসেছিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে টালমাটাল। দেশের অভ্যন্তরে ইংরেজ শাসনের অবসান চেয়ে সংগঠিত হচ্ছিল স্বাধীনতাকামী মানুষের তীব্র আন্দোলন, পাশাপাশি ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে চলছিল নিজেদের শাণিত করা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কালোবাজার, অর্থনৈতিক মন্দা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের ভয়ানক দুর্গতি, দেশবিভাজনকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা, দেশ বিভাজনের মূল্যে দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি, সাম্যবাদের প্রভাববৃদ্ধি, কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা, আবার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সমস্তই মন্মথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। একজন সচেতন মানুষ হিসেবে তাঁকেও এই সমস্ত ঘটনার অভিঘাত স্পর্শ করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন দেশের মূল আবেগের স্রোতপথ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। স্বাধীনতা পাবার আগে যে আবেগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল দেশপ্রেম, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, তা দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশের অভ্যন্তরের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে। তিনি বুঝেছিলেন কেন স্বাধীনতা পাবার বহু বছর পরেও আমাদের দেশ স্বনির্ভর নয়—পরমুখাপেক্ষী। খাদ্য বস্ত্র এবং আচ্ছাদনের চাহিদা যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল তা সঠিক পদ্ধতি নয়। ফলে প্রশ্রয় পাচ্ছিল চোরাকারবার, মজুতদার, দালাল এবং মুনাফাবাজীর স্বার্থপর পাপচক্র। এই বিপন্নতার কথা তিনি তুলে ধরেছিলেন তাঁর সেই সময়কালে লেখা বিভিন্ন একাঙ্কের মধ্যে দিয়ে।

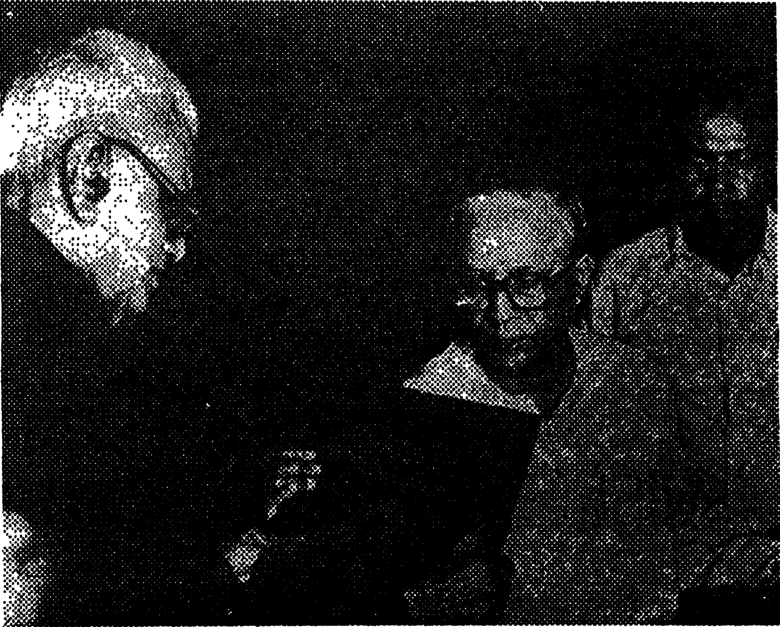
দুর্গতি ও বিপর্যয়ের ঐ ঘটনাগুলিকে তিনি আজীবন মনে রেখেছিলেন। তাই রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত (২০.১১.৬৪) বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে দেশের বর্তমান প্রেক্ষিতকে ভাল করে উপলব্ধি করার জন্য অতীত দিনের ঐ বিপর্যয়ের ঘটনাগুলির উল্লেখ করতে তিনি ভোলেননি :

"আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন, অস্তিত্ব বিপন্ন। ঘরের শত্রু দেশদ্রোহী, কালোবাজারী, মজুতদার ও মুনাফাবাজদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে। বাইরের শত্রুর চেয়ে এরা আরো ঘৃণ শত্রু।"

মন্মথ সব সময়ই দেশ ও সমাজের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশি। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে নতুন চিন্তা তরঙ্গে উদ্বেলিত দেশের ভাবাবেগকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে রূপায়িত করেছিলেন তাঁর বিচিত্র সৃজনের আধারে। এক্ষেত্রে আমরা তাই আবিষ্কার করেছিলাম নতুন মনন, নতুন ধরন সমন্বিত তীক্ষ্ণ ও শাণিত মন্মথকে—অন্যায়ের সঙ্গে কোনোদিনই যিনি আপস করেননি। জাতীয় কংগ্রেসের ওপর আস্থাশীল মন্মথর আস্থা দেশের সামগ্রিক পটপরিবর্তনের সূত্রে অপসৃত হয়ে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় পরিবর্তিত হয়েছিল। লোকরঞ্জনের লক্ষ্যে জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে যেদিন 'লোকরঞ্জন শাখা'র জন্ম হয়েছিল—সেই সূচনামুহূর্ত থেকেই কিন্তু সরকারি প্রচার প্রযোজক হিসেবে তিনি শুধুমাত্র দায়হীন দায়িত্বের বোঝা বহন করেননি। একজন দায়বদ্ধ সাংস্কৃতিক মনন সমৃদ্ধ নাট্যকার ও সংগঠক হিসেবেও সঠিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। লোকরঞ্জন শাখার জন্যে লিখেছিলেন একের পর এক এমন নাটক যার মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, সাধারণ মানুষের ত্যাগ স্বীকারের মহত্ত্ব, শ্রমিক কৃষক, মেহনতী মানুষের ওপর পুঁজিবাদী শাসন শোষণের নির্মম দিক, বাংলার বামপন্থী কৃষক আন্দোলনের উজ্জ্বল ছবি। সরকারের প্রচার প্রযোজক হিসেবে তাঁকে এই পর্যায়ে প্রাধান্য দিতে হয়েছিল সরকারি তরফের প্রচারকে, বিস্তৃত কর্মসূচী সম্বলিত পরিকল্পনাকে। ফলে নাটক-সৃজনের শৈল্পিক বিকাশ কিছুটা ব্যাহত হলেও সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে দায়িত্বহীনতা দেখা যায়নি।।

মন্মথ রায়ের নাট্য ব্যক্তিত্ব ছিল জনমুখীন। মানুষকে বাদ দিয়ে তাঁর চিন্তা অগ্রসর হতো না। সব সময়ই অসম অন্যায় ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘদিন পরেও দেশের বেশির ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে যন্ত্রণাময় জীবন যাপন করছে কোটি কোটি যুবক যুবতী বেকার। দেশে নিরক্ষরের সংখ্যাই বেশি। বৈদেশিক ঋণে দেশ আকণ্ঠ নিমগ্ন। দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী। ধনতান্ত্রিক প্রভাবপুষ্ট সংবিধান-এর চোরাগলি দিয়ে প্রবাহিত অর্থনীতির ফলে—দেশের গরীবরা হচ্ছে আরো গরীব—ধনীরা হচ্ছে আরো ধনী। দেশে কালো টাকা বাড়ছে। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে গণতন্ত্রী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাই জাতিকে উদ্ধার করে সাম্য মৈত্রীভিত্তিক আদর্শ জীবনে উত্তরণ ঘটাবে—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে তিনি নানান সময়ে ব্যক্ত করেছেন। (১২.৯.৮৫-তে গণনাট্য পত্রিকার পক্ষে হীরেন ভট্টাচার্যকে দেওয়া সাক্ষাৎকার

থেকে।) মন্মথ শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন। সাম্যবাদী আদর্শ ও ধ্যান ধারণার প্রতি অনুরাগও তাঁর ছিল। কিন্তু সবটাই ছিল মানবতাবাদের মোড়কে আচ্ছাদিত। গান্ধীবাদ ও লেনিনবাদের সামঞ্জস্য ও সমন্বয় করতে গিয়ে তিনি তাঁর রাজনৈতিক দর্শনকে খানিকটা শিথিল করে ফেলেছিলেন। ফলে তাঁকে ঘিরে বিশিষ্ট কোনো উজ্জ্বল বলয় রেখা হয়ত তৈরি হয়নি বা তিনি তাঁর দর্শনের পথরেখা ধরে অনেককে পথ চলতে অনুপ্রাণিত করেননি। কিন্তু সকলের কাছেই তাঁর সমকালে তিনি ছিলেন সম্মানিত মহান অথচ নিজ গণ্ডিতে একক--অদ্বিতীয় কৃতী পুরুষ। কংগ্রেসী শাসনকালে সরকারি কর্মী হয়েও তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন। তার অজস্র উদাহরণের উল্লেখ গ্রন্থের অন্য পরিচ্ছেদেই আছে।



পঃ বঃ সরকারের দীনবন্ধু পুরস্কার মন্মথর হাতে তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু



তেনজিং নোরগের সঙ্গে মন্মথ

মন্মথর এই সংগ্রামী মনোভাব জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিল। কিছু দৃষ্টান্ত না দিলে বোধকরি মূল্যায়ন সম্পূর্ণ হবে না। ১৯৬২-তে স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নতুন করে নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল চালু করতে উদ্যত হয়ে গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল। সব ধরনের অভিনয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই ঐ বিজ্ঞপ্তি জারি। তখন দলমত নির্বিশেষে সকলে ঐ বিল প্রতিরোধের জন্য একটি প্রস্তুতি পরিষদ গঠন করে। তার

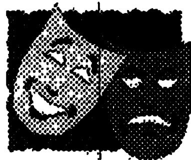
সভাপতি হয়েছিলেন মন্মথ রায়। ১৩.৫.৬৩ তে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে একটি জনসভা হয়। ঐ সভায় বিভিন্ন যাত্রাদল, নাট্যসংস্থা, নাট্যকার, নাট্যশিল্পী, যুগান্তর, অমৃতবাজার, দৈনিক বসুমতী, স্বাধীনতা পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রবল জন আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই সভা পরিচালনা এবং বিলটি প্রত্যাহারের জন্য তীব্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মন্মথ রায়। এই বিলটি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে জ্যোতির্ময় বসু রায়ের একটি প্রতিবেদন আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়। মন্মথ অত্যন্ত কড়া ভাষায় আনন্দবাজারেই তার জবাব দেন ২৪.৫.১৯৬৩-তে। প্রবল জনমতের চাপে অবশেষে তৎকালীন সরকার বিলটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

১৯৭০ সালে কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় অভিনয়ের ওপর কর বাড়ানো হবে। সারা বাংলা নাট্য সংগ্রাম সমিতি তার বিরোধিতা করে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মন্মথ রায়। নাট্যকারদের স্বার্থরক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নাট্যকার সংঘ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। মন্মথ তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে বিশ্বরূপা থিয়েটারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের তিনি একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ উৎসব পালনের যে কমিটি তৈরি হয়েছিল তিনি ছিলেন তারও কার্যকরী সভাপতি। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির তিনি ছিলেন প্রথম সভাপতি। ১৯৬৪ সালে সারা বাংলা নাট্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মুখ্য উপদেষ্টা ছিলেন মন্মথ। এই সম্মেলনেই সভাপতি হিসেবে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "আজকের নাট্য আন্দোলনের ধারাটি যে নতুন খাতে প্রবাহিত করা আবশ্যক, সেটা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের খাত।"

রবীন্দ্র সদনের নির্মাণ বিলম্বের জন্য প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রসদনকে জাতীয় নাট্যশালা না করার স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদে তিনি কার্যনির্বাহক সদস্যপদ থেকে ইস্তাফা দিয়েছিলেন। ২৮.৬.৭৩-এর বসুমতীতে 'জাতীয় নাট্যশালারূপে রবীন্দ্র সদন'-এর পক্ষে তিনি দৃঢ় বক্তব্য রেখেছেন। তৎকালীন রাষ্ট্রমন্ত্রী যখন রবীন্দ্রসদনকে বাদ দিয়ে জাতীয় নাট্যশালার জন্য অন্য জমি খুঁজছেন তখন মন্মথ আপসহীন ভাবে জানাতে ভোলেননি, "...বর্তমান বাজার দরে জাতীয় নাট্যশালার উপযুক্ত আধুনিক সাজ সরঞ্জাম সমেত একটি নতুন সৌধ গড়ে তুলতে হলে প্রায় সত্তর লাখ থেকে এক কোটি টাকার ধাক্কা। ....পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সাধারণ নাট্যশালা শতবার্ষিকী উৎসব বৎসরেই রবীন্দ্রসদনকে একটি জাতীয় নাট্যশালারূপে গ্রহণ করুন। এতে কোন খরচ নেই। কেন্দ্র থেকে যে টাকা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে সেই টাকা দিয়ে রবীন্দ্র সদনে কেন্দ্রীভূত জাতীয় নাট্যশালার কয়েকটি শাখা গড়ে তুলুন।" নাট্যসঙ্কট প্রতিরোধ সমিতির সভাপতি হয়ে তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে (১৯৭২) তিনি তীব্র ক্ষোভে প্রকাশ্য দাবিপত্রে বলেছেন : "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এই উপেক্ষাজনক মনোভাবে আমরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত। ....সকলের মতামত ও অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করিয়া শুধুমাত্র সরকারী আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা

অপব্যয় করিতেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের পুণ্যস্মৃতি ও সুন্দর শিল্পবোধের উপর আঘাত হানিয়াছেন।" সভাপতি হিসেবে ভিয়েতনামের নির্যাতিত সেনাদের সমর্থনে তিনি শহীদ মিনারের নীচে শিল্পীদের সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন।

মন্মথ রায় শিল্পী ও স্রষ্টার সামাজিক দায়বদ্ধতায় বিশ্বাসী ছিলেন আজীবন। দুই-এর দশক থেকে আট-এর দশক—এই দীর্ঘ সময় ধরে তিনি নিজেকে সময়ের সঙ্গে সমন্বিত করে নিয়েছেন। ফলে তাঁর সমাজ চিন্তা, রাজনৈতিক দর্শন বিবর্তিত হয়েছে-দেশাত্মবোধক জাতীয়তাবাদী গান্ধী-নীতি পরিবির্তিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসে। তিনি তাঁর সব রচনাতেই মানুষের সংগ্রামী জীবন ও জীবনযাত্রা, আত্মিক উন্নয়নকে প্রতিভাত করেছেন। ১৯২৭-১৯৩৮ সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতে অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে তাঁর রচিত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বাতাবরণে লেখা আধুনিক মননের নাটকগুলি। সেযুগের বিখ্যাত নট এবং নাট্য নির্দেশকের সমৃদ্ধ অভিনয় ও নির্দেশনায় সেগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭২ বিভিন্ন নাট্যদল অভিনয় করেছে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের নাটকগুলি। সবগুলির প্রযোজনা উল্লেখযোগ্য হতে পারেনি। বর্তমানে তাঁর শতবর্ষে মূল্যায়ন প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন ঘুরে ফিরে এসেছে—সম্মানিত ঋত্বিক মন্মথ রায়ের কোনো নাটক কেন বর্তমানে অভিনীত হচ্ছে না? কেনই বা তার দু'একটি মাত্র কেবল উচ্চশিক্ষার পাঠক্রমেই আবদ্ধ। মন্মথর ক্ষেত্রে বোধ করি এটাই সত্য, যে তাঁর রচনার গভীরতর তাৎপর্য যে সময়কালকে ঘিরে অর্থবহ হয়েছে, যে সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্য নিয়ে তার নির্মাণ হয়েছে তাতে তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য পূরণ হয়তো ঘটেছে কিন্তু সে সৃজন আবহমান কাল ধরে চিরন্তন শাশ্বত বাণীরূপের বাহক হবার আধার হয়ে উঠতে পারেনি। কিংবা সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বারবার নিজেকে বদলেছেন বলে হয়তো উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী ধারার নাট্যকার হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করতেও পারেননি। অথচ আমরণ তিনি সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত থেকেছেন সমকালীন সবরকমের প্রগতিশীল ঘটনার সঙ্গে। তাঁর এই সমস্ত পদক্ষেপের নেপথ্যে কাজ করেছিল এক বিবেকবান মননের প্রেরণা—যার উৎস ছিল তাঁর নিজের অন্তর। বিবেকী শিল্পী ও স্রষ্টার কণ্ঠরোধ যাতে না হয় এ চেষ্টা তার আজীবন কালের। যা তিনি আহরণ করেছেন বিভিন্ন দেশকালের প্রগতির ইতিহাস থেকে। সেই অভিজ্ঞতাই মন্মথকে প্রতিবাদী হতে শিখিয়েছে এবং সে প্রতিবাদ অবশ্যই হয়েছে মানুষকে নিয়ে—মানুষের জন্যে।



ভাই তৃপ্তি

তুমি গেলে পর আমার
হাতে বহুদিন এসেছিলো যেমো
হয়েছিল তোমার স্কুলে থেকে
আমার সহোদরা বোন লীলার
স্মরণে মাঝে মাঝে চাবে ~~[illegible]~~
দুই একদিন থাকি — এবার গেলে
তোমাকে ওখানে বলে শুরু
মেলোর মতো আত্মদায়িত্ব হবে —
আর হবে থিয়েটারের দিনগুলোর
মণিমুক্তো সব সঞ্চয়।
~~[illegible] তুমি খুব~~
~~অসুস্থ~~ তবে হয়নি,
এখন দেখেছি তুমি খুব
অসুস্থ নও। কিন্তু তা
কখনো তো শুনবো না। তোমার
মতো মনের জোর কার?
মনের সেই অনন্ত জোরে
ভালো হও। আমি ও এখন
অসুস্থ। খুবই। কিন্তু মনের
জোরেই টিকে আছি এই
৯০ বছরেও।

আশীর্বাদক দাদা
মন্মথ রায়

মন্মথ রায়ের শেষ চিঠি, তৃপ্তি মিত্রকে লেখা। চিঠিটি লেখার দিনেই আকস্মিকভাবে নাট্যকার পড়ে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এন আর এস হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। চিঠিটি লেখার আট দিনের মাথায় ২৬.৮.৮৮ তে তিনি প্রয়াত হন।

রবীন্দ্রসদনকে জাতীয় নাট্যশালারূপে ঘোষণার জন্য মন্মথর দাবী

আমাদের 'জাতীয় নাট্যশালা' সম্পর্কে গত সপ্তাহে আমরা রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জেনেছি যে, কলকাতার জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁকে একটি হিসাব দাখিল করতে বলেছেন। খুবই আনন্দের সংবাদ সন্দেহ নেই।

ঐ বিজ্ঞপ্তিতে শ্রীমুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'জাতীয় নাট্যশালা'-র জন্য উপযুক্ত জমি খোঁজা হচ্ছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, জাতীয় নাট্যশালা-র সঙ্গে একটি 'মুক্তাঙ্গন' থাকবে। সেখানে যাত্রাভিনয় হবে। নাট্যশালার সৌখিন সম্প্রদায়েরা সুলভে নাটক মঞ্চস্থ করবেন। নাটকের গবেষণার জন্য একটি গ্রন্থাগারও স্থাপিত হবে। এ সবই খুব আনন্দের সংবাদ এবং এজন্য শ্রীমুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দনও জানাচ্ছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না, এই 'জাতীয় নাট্যশালা'-র জন্য 'রবীন্দ্র সদন' থাকতে অন্যত্র জমি খোঁজা হচ্ছে কেন? 'রবীন্দ্র সদন' জাতীয় নাট্যশালার জন্য রচিত হয়েছিল এতো সরকারের কথা। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী' অনুষ্ঠানে জহরলাল নেহরুকে দিয়ে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রবীন্দ্র সদন'-এর শিলান্যাসকালে মন্তব্য করেছিলেন, এটা জাতীয় নাট্যশালা হচ্ছে এবং রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী বৎসরের শেষ উৎসবই হবে ওর দ্বারোদঘাটন। অবশ্য ডাক্তার রায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে এবং তদানীন্তন কর্তৃপক্ষের অবহেলায় ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সৌধ রচনা সমাপ্ত হয় নি। আমার সভাপতিত্বে তদানীন্তন নাট্য সম্মেলনের উদ্যোগে সর্বদলীয় শিল্পীদের প্রচণ্ড আন্দোলনের চাপে তদানীন্তন সরকার ১৯৬৬ সালে সৌধ রচনা সমাপ্ত করে 'রবীন্দ্র-জন্মদিবসে যখন ওর দ্বারোদঘাটন করেন, সেই উৎসবে সর্বদলীয় শিল্পীরা কিন্তু নিমন্ত্রিত হন নি, বরং পুলিশের লাঠিচার্জে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন--যদিও টেপ রেকর্ড' করা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর শুভেচ্ছাবাণীতে ঐ সময় ঘোষিত হয়েছিল যে, 'জাতীয় নাট্যশালারই দ্বারোদঘাটন হল আজ।'

নাট্য সম্মেলনের উদ্যোগে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এই রবীন্দ্র-স্মৃতিসৌধ ঘিরে বাংলার সর্বদলীয় শিল্পীদের আর একটি দাবী ঘোষিত হল—"রবীন্দ্র স্মরণী"র পরিচালন ভার একটি নির্বাচিত স্বয়ংশাসিত সংস্থার হাতে অর্পণ করা হোক। রেজেস্ট্রীকৃত নাট্য, নৃত্য, সঙ্গীত সংস্থাগুলি থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক এই জাতীয় নাট্যশালার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিচালনার নীতি নির্ণীত হোক। পরিচালক-মণ্ডলীতে নাটক, নৃত্য ও সঙ্গীতের দেশ বিখ্যাত প্রতিভাধারীদেরও সদস্য নির্বাচন করা হোক। সরকার সমগ্র দেশের আস্থাভাজন এই নির্বাচিত স্বয়ংশাসিত সংস্থার হাতে জাতীয় নাট্যশালার ভার ন্যস্ত করে জাতীয় নাট্যশালার ব্যয়ভার গ্রহণ করুন। একমাত্র অডিট করা ভিন্ন সরকারের এই সম্পর্কে আর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। দেশের শিল্পমানসের উপর সরকারের এই আস্থা দেশবাসী অবশ্যই দাবী করতে পারে।" এই দাবিপত্রে যাঁদের স্বাক্ষর আছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন— সত্যজিৎ রায়, অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ও সি গাঙ্গুলী), বিষ্ণু দে, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, সুচিত্রা মিত্র, সরযূ দেবী, উৎপল দত্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, সুব্রত সেন,

দক্ষিণারঞ্জন বসু, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, তাপস সেন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অনুপকুমার, শেখর চট্টোপাধ্যায়, শৈবালকুমার গুপ্ত, জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য, ত্রিগুণা সেন, সুধী প্রধান, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সমর সেন, দক্ষিণারঞ্জন বসু, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ কুণ্ডু, বিজন ভট্টাচার্য এবং মন্মথ রায়। পরবর্তী ইউনাইটেড ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট কর্তৃক গঠিত রবীন্দ্র সদনের প্রথম কার্যনির্বাহক সমিতির প্রথম সভাতে বে-সরকারী সদস্য আমরা উপরোক্ত দাবী একটি প্রস্তাবাকারে পেশ করলে, ওই দাবীর মূল নীতিটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি আইনের খসড়াও কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য রচিত হয়ে সরকার সমীপে পেশ করা হয়। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল—উদ্দেশ্য পূর্ণ তো হলই না, বরং রবীন্দ্র সদনে আমলাতান্ত্রিক শাসন ক্রমশঃ জোরদার হচ্ছে দেখে তার প্রতিবাদে আমি ১৯৭১ সালে ১৬ই নভেম্বর সদস্যপদে ইস্তফা দিই।

কিন্তু শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক ঘোষণাবলীতে খুবই আশান্বিত হচ্ছি এখন। তাঁর উপরোক্ত ঘোষণা ও সাম্প্রতিক বেতার ভাষণ (পশ্চিমবঙ্গ, ৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা—১৫-৯-৭২) অবিলম্বে কলকাতায় 'জাতীয় নাট্যশালা' প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অভিনন্দনযোগ্য সুসমাচার। বেতার ঘোষণায় তিনি বলেছেন—"আমাদের দেশে বিষয়টি একেবারেই নতুন। কোন বৈদেশিক প্রয়াসকে অন্ধ অনুকরণ না করে আমাদেরই জাতীয় ঐতিহ্যকে স্মরণে রেখে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গঠনমূলক বিতর্ক, আলোচনা, সুপারিশ এবং কাজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই জাতীয় নাট্যশালার যথার্থ রূপটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে বলে আমাদের বিশ্বাস।"

এ সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ একমত। ওপরে সর্বদলীয় শিল্পীদের যে সুচিন্তিত দাবিপত্র উল্লিখিত হয়েছে তার লক্ষ্যও এই-ই' রেজেষ্ট্রীকৃত সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা 'জাতীয় নাট্যশালা' সম্পর্কে যে চিন্তা ভাবনা করবেন তারই সম্মিলিত আলোচনায় প্রস্তাবিত জাতীয় নাট্যশালার সেই রূপটিই সংকলন করতে হবে—যা জাতীয় প্রয়োজনে এবং জাতীয় সংস্কৃতির স্বার্থে অপরিহার্য। এইরূপ একটি সম্মেলন জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধিমূলক হবে বলেই সমালোচনা বা পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থাকতে পারবে। অবশ্য এই সম্মেলনে নাটক, নৃত্য ও সঙ্গীতে দেশ বিখ্যাত বিশেষজ্ঞদের স্থানও সংরক্ষিত থাকবে। এই সম্মেলনে গঠনতান্ত্রিক সংবিধান পরিষদ ('কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলী')-এর দায়িত্ব পালন করে জাতীয় নাট্যশালার লক্ষ্য, কর্মপদ্ধতি ও পরিচালনবিধি প্রণয়ন করে দেবেন। আইনসভায় এটা পেশ করা হবে এবং জাতীয় নাট্যশালা বিষয়ক আইন তৈরী হয়ে যাবে। এখানে আমরা শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বেতার ভাষণের একটি অংশ সানন্দে উদ্ধৃত করছি—কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তির নয়, সমগ্র জাতির, সমগ্র জনগণের একটি অমূল্য সম্পদরূপেই জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, বৈচিত্র্যময় নাট্য অনুশীলন এবং বহু ধারা-উপধারাকে সম্মিলিত করে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মহান আদর্শকে রূপ দেবে।" বলাই বাহুল্য, এই মত এবং পথই চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক।

শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় উপরোক্ত বেতার ভাষণেই জাতীয় নাট্যশালার জমি নির্বাচনের ব্যাপারে বলেছেন—'নাট্যশালাটি যেন এই বিশাল শহরের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হয়, সেখানে ভার বহণের ব্যবস্থা যেন সুপ্রচুর থাকে। যাতে সর্বসাধারণের পক্ষে সেখানে অনায়াসে ও নিরাপদে যাতায়াত করা সম্ভব হয়। এসব প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধা ছাড়া জাতীয় নাট্যশালা জনগণের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হবে, যা কারোরই কাম্য হতে পারে না।" তাঁর এই অভিমতটিও অতীব যুক্তিযুক্ত এবং এদিক দিয়েও তাঁর এই অনুসন্ধানের একমাত্র উত্তর এবং অবিসম্বাদী উত্তর—'রবীন্দ্র সদন'। রবীন্দ্র সদনই প্রশ্নাতীতরূপে তাঁর সকল শর্তই পূরণ করছে। বর্তমান বাজার দরে জাতীয় নাট্যশালার উপযুক্ত আধুনিক সাজসরঞ্জাম সমেত নতুন একটি সৌধ গড়ে তুলতে হলে প্রায় সত্তর লাখ থেকে এক কোটি টাকার ধাক্কা। এই টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে পাওয়া যাবে এটা ধরে নিয়ে আমি একটি প্রস্তাব পেশ করছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সাধারণ নাট্যশালা শতবার্ষিক উৎসব বৎসরেই রবীন্দ্র সদনকে একটি জাতীয় নাট্যশালারূপে ঘোষণা করুন। এতে কোন খরচ নেই। কেন্দ্র থেকে যে টাকা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে, সেই টাকা দিয়ে রবীন্দ্র সদনে কেন্দ্রীভূত জাতীয় নাট্যশালার কয়েকটি শাখা বিভিন্ন নাট্যপ্রধান অঞ্চলে অথবা কলিকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডে গড়ে তুলুন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের স্বপ্ন পূর্ণ হবে, জওহরলাল নেহরু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর শুভেচ্ছা সার্থক হবে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ উল্লসিত হবে। বসুমতী ২৮.৬.১৯৭৩ - এ তাঁর এ বিষয়ে একটি লেখা প্রকাশিত হয়।



মন্মথ রায়ের সঙ্গে রাশিয়ায় ড. এইচ. আর. ব[redacted]ন, এল. এন. ভাবে, ও এ. কে. নায়ার

রবীন্দ্র স্মরণী সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট প্রকাশ্য দাবীপত্র

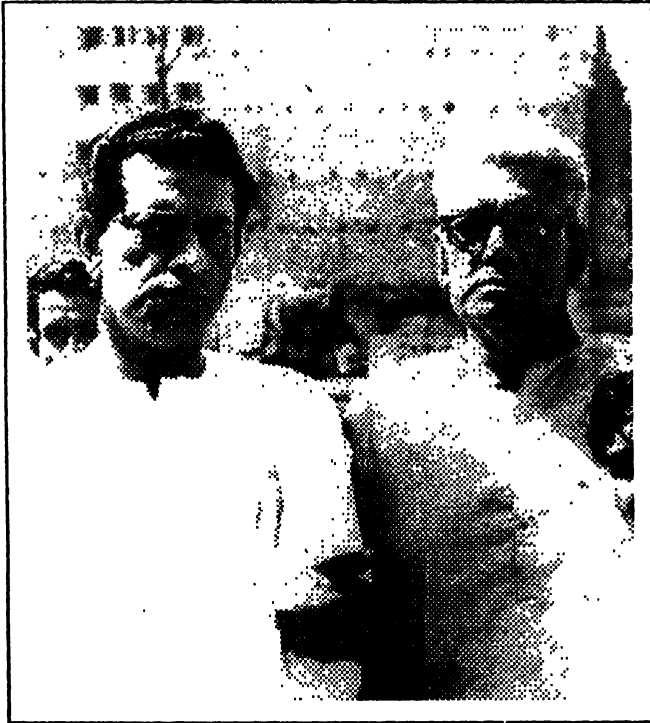
পশ্চিম বাংলার রবীন্দ্র স্মরণী সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার জন্য বারবার দাবী করার পর এবং বিশেষ ভাবে গত বছর রবীন্দ্র স্মরণী'র প্রাঙ্গন সম্মুখে, বাংলার সুধী নাট্যসংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের সমবেত মিছিলের ফলেই আজ রবীন্দ্র স্মরণীর দ্বারোদঘাটনের সিদ্ধান্তে আমরা প্রথমে খুবই আনন্দিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সরকারের অব্যবস্থাগুলি এবং কার্যকলাপে আমরা অত্যন্ত হতাশ হইয়াছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এই উপেক্ষাজনিত মনোভাবে আমরা অত্যন্ত বিক্ষুদ্ধ ও বিচলিত। রবীন্দ্র প্রতিভার প্রতি এই অবজ্ঞাজনক মনোভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্যান্য সকলকেই টেক্কা দিয়াছেন। সংবাদপত্রের বা সুপরিচিত শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকার সকলের অভিজ্ঞাত বা মনোভাবকেই অগ্রাহ্য করিয়া, শুধুমাত্র সরকারী অপদার্থ আমলাতন্ত্রের ওপর অযথা নির্ভর করিয়া তাহারা দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় করিতেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের পুণ্য স্মৃতি ও সুন্দর শিল্পবোধের ওপর আঘাত হানিয়াছেন। ইহার কারণ সরকারের বিভাগীয় কর্তাব্যক্তিদের অনভিজ্ঞতা এবং বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর রবীন্দ্রনাথের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসিন্য। যাহার জন্য বিরাট অর্থব্যয় নির্মিত এই স্মৃতিসৌধটি রবীন্দ্রপ্রতিভার কোন স্বাক্ষরই রাখিতে পারিবে না বলিয়া আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সত্যজিৎ রায়, উদয়শঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মন্মথ রায়, ডাঃ ত্রিগুণা সেন, শৈবাল মিত্র এবং প্রতিষ্ঠিত বহু সাংবাদিক, সাহিত্যিক, নাট্যকার ও নাট্যসংস্থাগুলিও সকল সমালোচনা অগ্রাহ্য করিয়া 'রবীন্দ্র স্মরণী'র পরিবেশ, পরিচালনা ব্যবস্থাপনা এমনকি রঙ ও অঙ্কনের সম্পূর্ণ অপদার্থতার পরিচয় দিয়াছেন। এমতাবস্থায় রবীন্দ্র স্মরণীকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন একটি আমলাতান্ত্রিক সংগঠন করিতে দিতে আমরা কিছুতেই রাজী হইতে পারি না। তাই আমাদের দাবী যে অবিলম্বে রবীন্দ্র স্মরণীকে একটি জাতীয় নাট্যশালা হিসেবে ঘোষণা করিয়া উহার পরিচালনার ভার একটি স্বয়ংশাসিত, নির্বাচিত সমিতির হাতে ন্যস্ত করা হউক। জাতীয় নাট্যশালার দাবী নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী বারবার করিয়া আসিতেছেন এবং বর্তমানে এই দাবী একটি জাতীয় দাবী হিসেবে সকলের কাছে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং রবীন্দ্র স্মরণীকে জাতীয় নাট্যশালা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার দাবীর ন্যায্যতা স্বীকার করিয়া লওয়াই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি। জাতীয় নাট্যশালা পরিচালনা সমিতি, পশ্চিম বাংলার শ্রদ্ধেয় সকল সুধী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠিত নাট্যসংস্থাগুলির সম্মিলিত বৈঠকে নির্বাচিত হইতে পারে। এই নির্বাচিত সমিতির জাতীয় নাট্যশালা পরিচালনার জন্য একটি গঠনমূলক রচনা করিবেন। এইভাবেই জাতীয় নাট্যশালা এবং 'রবীন্দ্র স্মরণী' পশ্চিমবাংলার জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করিতে পারিবে বলিয়া আমরা খুব দৃঢ় ভাবে মনে করি এবং এই দাবী সমর্থনের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সংস্কৃতিমনস্ক সকল ব্যক্তি ও সংস্থাকেই অগ্রসর হইতে আবেদন জানাই।

পরিশেষে আমরা সরকারের নিকট আবেদন করি যে, তাহারা আমাদের দাবীর

যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া অবিলম্বে আমাদের সহিত আলোচনায় বসিবেন এবং 'রবীন্দ্র স্মরণী'কে সত্যকার রবীন্দ্রপ্রতিভার স্কুল এবং ঐতিহাসিক স্মারকসৌধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের আশা পূরণ করিবেন।

সকল সুধী ও নাট্যসংস্থার পক্ষে
শ্রী মন্মথ রায়
সভাপতি
নাট্যসংকট প্রতিরোধ সমিতি

২৫শে বৈশাখ ১৩৭৫



সত্যজিৎ রায় ও মন্মথ

'অভিনয়'-এর আহ্বানে

বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবর্ষপূর্তির প্রাক্কালে 'রবীন্দ্র সদন'-কে স্বয়ংশাসিত সংস্থায় পরিণত করার দাবীতে ১৪ নভেম্বর ১৯৭১ সকাল দশটায় মিনার্ভা থিয়েটারে নাট্যকর্মীদের কনভেনশানে যোগ দিন।

<u>৩১.১.৭১ তারিখে 'অভিনয়' দপ্তরে শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় গৃহীত প্রস্তাব।</u>

১৮৭২ সালে ৭ই ডিসেম্বর কলকাতায় সর্ব সাধারণের জন্য ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হয়। এটা ছিল জাতীয় নাট্যশালা প্রবর্তনের একটি প্রাথমিক ইঙ্গিত। থিয়েটারটি বেশিদিন না চললেও এই থিয়েটারই ছিল পাবলিক থিয়েটারের পথিকৃৎ। তারপর থেকে কলকাতা মহানগরীতে মালিকানা যত্নে কিছু নামকরা থিয়েটার গড়ে ওঠে। অনেক নামকরা নটনটী, নাট্যকার এবং নাট্যশিক্ষক নাটক ও নাট্যশালাকে বাংলার জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠ করেন। এই পর্বেরই শেষ অধ্যায়ে একে একে সমাগত হন অবিস্মরণীয় কয়েকটি নাট্য প্রতিভা যার মধ্যে সমধিক উল্লেখযোগ্য—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বিনোদিনী, তারাসুন্দরী, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শিশির কুমার, অর্ধেন্দুশেখর, অহীন্দ্র চৌধুরী। যে সব থিয়েটারে এরা নাট্যকর্ম করেছেন তার প্রত্যেকটিই পরিচালিত হত ব্যবসায়িক ভিত্তিতে। লাভ লোকসানের কথাই ছিল বড় কথা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল বিপজ্জনক। সত্যিকার প্রতিভার নিরঙ্কুশ বিকাশের সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায় নাট্য মনীষীরা কামনা করতেন একটি জাতীয় নাট্যশালা ; যেখানে নাট্য প্রতিভার সম্যক বিকাশ সম্ভব এবং রসাস্বাদনে তৃপ্ত হতে পারে দেশের নাট্যামোদী জনসাধারণ। এই কামনাই ধ্বনিত হয়েছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র এবং নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর চিন্তা-ভাবনায় এবং আকাঙ্ক্ষায়। পদ্মভূষণ খেতাব প্রত্যাখ্যান করে শিশির কুমার দাবী করেছিলেন একটি জাতীয় নাট্যশালার।

পরবর্তী ইতিহাসে দেখা যায় ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকীর উদ্বোধন দিবসে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের আমন্ত্রণে জওহরলাল নেহরু জাতীয় নাট্যশালা রূপে ঘোষিত (তৎকালীন পত্র পত্রিকা দ্রষ্টব্য) 'রবীন্দ্র স্মরণী' সৌধের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর অন্তে ১৯৬৬ সালে সর্বদলীয় শিল্পীদের তীব্র আন্দোলনে সরকারী ঔদাসীন্যের কবল থেকে মুক্ত রবীন্দ্র স্মরণীর দ্বারোদঘাটন কি করে সম্ভব হল সমকালীন সেই তিক্ত ইতিহাস সুবিদিত। দ্বারোদঘাটন দিবসে রবীন্দ্র স্মরণীতে প্রবেশ নিষেধ, 'পুলিশী লাঠিচার্জ-লাঞ্ছিত' শিল্পীদল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর টেপ করা শুভেচ্ছা বাণীতে রবীন্দ্র স্মরণী জাতীয় মঞ্চ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল তা অবশ্য শুনেছিলেন। এবং তার পরেই ওই রবীন্দ্র স্মরণী ঘিরে বাংলার সর্বদলীয় শিল্পীমানসের দাবী ঘোষিত হয়েছিল—"রবীন্দ্র স্মরণী'র পরিচালন ভার একটি নির্বাচিত স্বয়ংশাসিত সংস্থার হাতে অর্পণ করা হোক। রেজেস্ট্রীকৃত নাট্য, নৃত্য-সঙ্গীত সংস্থাগুলি থেকে নির্বাচিত

প্রতিনিধিগণ দ্বারা এই জাতীয় নাট্যশালার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিচালনার নীতি-নির্ণীত হোক। পরিচালকমণ্ডলীতে নাটক, নৃত্য ও সঙ্গীতের দেশ-বিখ্যাত প্রতিভাধরদেরও সদস্য নির্বাচন করা হোক। সরকার সমগ্র দেশের আস্থাভাজন এই নির্বাচিত স্বয়ংশাসিত সংস্থার হাতে জাতীয় নাট্যশালার ভার ন্যস্ত করে জাতীয় নাট্যশালার আর্থিক ব্যয়ভার গ্রহণ করুন। একমাত্র 'অডিট' করা ভিন্ন সরকারের এই সম্পর্কে আর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। দেশের শিল্পমানসের উপর সরকারের এই আস্থা দেশবাসী অবশ্যই দাবী করতে পারে।" এই দাবীপত্রে যাদের স্বাক্ষর আছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন—সত্যজিৎ রায়, অর্দ্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, (ও. সি. গাঙ্গুলী), বিষ্ণু দে, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, সুচিত্রা মিত্র, সরযূ দেবী, উৎপল দত্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, সুব্রত সেন, চারুপ্রকাশ ঘোষ. অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, তাপস সেন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অনুপ কুমার, শেখর চট্টোপাধ্যায়, শৈবাল কুমার গুপ্ত, জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য, ত্রিগুণা সেন, সুধী প্রধান, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সমর সেন, দক্ষিণারঞ্জন বসু, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ কুণ্ডু, বিজন ভট্টাচার্য এবং মন্মথ রায়। ইতিমধ্যে রবীন্দ্র স্মরণীর নতুন নাম হল 'রবীন্দ্র সদন'। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক রবীন্দ্র সদনের পুনর্গঠিত পরিচালকমণ্ডলীর প্রথম সভাতেই উপরোক্ত দাবী একটি প্রস্তাবাকারে একযোগে পেশ করেন পাঁচ জন সদস্য ঃ মন্মথ রায়, সুধী প্রধান, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আনন্দের বিষয়, রবীন্দ্র সদনের পরিচালক সভা এই প্রস্তাবের মূল নীতি সর্ব সম্মতিক্রমে গ্রহণ করে রবীন্দ্র সদনকে একটি নির্বাচিত স্বয়ং শাসিত সংস্থায় রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে গঠনতান্ত্রিক একটি আইনের খসড়া রচনার ভার অর্পণ করেন সদস্য সুধী প্রধানকে। এরপর প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে এবং রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রথম পর্যায় শুরু হয়, তবু সুধী প্রধান রচিত খসড়া রবীন্দ্র সদনে বঙ্গাব্দ ১৩৭৫ সালের রবীন্দ্র জয়ন্তীর প্রভাতী অনুষ্ঠানে সমবেত ত্রিশ হাজার দর্শকের সামনে পরিচালকমণ্ডলীর তৎকালীন সভাপতি ডঃ ভবতোষ দত্তের হস্তে আনুষ্ঠানিক ভাবে সমর্পণ করেন রবীন্দ্র সদন উৎসব উপসমিতির সভাপতি মন্মথ রায়। কিন্তু কোন ফলই হয়নি আজ পর্যন্ত। মন্ত্রীসভার ক্রমাগত উত্থান পতনের ফলে বিষয়টি সম্পর্কে আজও কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি এই কথাই শোনা যায়। মাঝে একবার শিক্ষাসচিব—সভাপতি জে, সি, সেনগুপ্ত এক সভায় মন্তব্য করেন যে, ক্যাবিনেটে নির্বাচিত স্বয়ংশাসিত জাতীয় নাট্যশালার প্রস্তাবটি না মঞ্জুর হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থের তালিকা

বাংলা নাটকের ইতিহাস : ডঃ অজিতকুমার ঘোষ
নাটকের কথা : ঐ
নাট্যতত্ত্ব পরিচয় : ঐ
বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস : ঐ
রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর : অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড) : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
শতবর্ষে নাট্যশালা : সম্পাঃ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ
ভারতীয় নাটমঞ্চ (১ম ও ২য়) : হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত
একশ বছরের বাংলা থিয়েটার : শিশির বসু
পুরাতন বাংলা নাটক : সম্পাঃ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস (১ম) : কালীশ মুখোপাধ্যায়
একাঙ্ক নাটকের কথা : দিলীপকুমার মিত্র
আধুনিক বিশ্বনাট্য সাহিত্য : ঐ
বাংলা একাঙ্ক নাটক রূপ ও রূপকার : সনাতন গোস্বামী
একাঙ্ক নাটকের রূপ ও রেখা : ডঃ সরোজমোহন মিত্র
বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক : ডঃ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা : মন্মথ রায়
অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য : ড: অরুণকুমার মিত্র
দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার : রথীন্দ্র নাথ রায়
নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার : সাধন কুমার ভট্টাচার্য
সাময়িক পত্রে বাংলা সমাজচিত্র (১ম, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড) : বিনয় ঘোষ সম্পাদিত
রাশিয়া ভ্রমণ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস : বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
হিন্দী একাঙ্কী : সত্যেন্দ্র
আজকের নাটক ও নবনাট্য আন্দোলন : সম্পাঃ সুনীল দত্ত
নিজেরে হারায়ে খুঁজি (১ম ও ২য়) : অহীন্দ্র চৌধুরী
বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সমালোচনা : সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
বাংলা ঐতিহাসিক নাটক : শক্তি ভট্টাচার্য
একাঙ্ক সঞ্চয়ন : সম্পাঃ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও ড: অজিতকুমার ঘোষ
মুক্তির সন্ধানে ভারত (৩য় সংখ্যা) : যোগেশচন্দ্র বাগল
নাটমঞ্চ ও নাট্যরূপ : ডঃ পবিত্র সরকার

সাজঘর : ইন্দ্র মিত্র
ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক : ডঃ সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়
বাংলা নাটক ও নাট্যশালা : শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
বিপ্লবের সন্ধানে : নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
জীবনধর্মী নাট্য প্রযোজনার রূপ ও রেখা : সুনীল দত্ত
আমার জীবন : মধু বসু
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য়) : ভূদেব চৌধুরী
বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত : ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
নাট্যতত্ত্ব বিচার : দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়
উত্তর চল্লিশের রাজনৈতিক নাটক : প্রভাতকুমার গোস্বামী
নাট্য প্রযোজনা ও পরিচালনা : ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য
আমার যুগ আমার গান : পঙ্কজকুমার মল্লিক
নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা : ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য
নাটক লেখার মূলসূত্র : ঐ
শিল্পতত্ত্ব পরিচয় : ঐ
ক্রোচের এস্থেটিক ও এসেন্স অফ এস্থেটিক : ঐ
টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ : ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত
রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ : রমাপতি দত্ত
ভারতীয় থিয়েটার : আদ্য রঙ্গাচার্য
এ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্ : ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য
গিরিশ গ্রন্থাবলী : সাক্ষরতা প্রকাশন
দীনবন্ধু রচনা সংগ্রহ : ঐ
সঙ্গীত ও সংস্কৃতি : নারায়ণ চৌধুরী
বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস : প্রণব কুমার বিশ্বাস
বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র : ড. নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায়
নাট্যাচার্য শিশির কুমার : শংকর ভট্টাচার্য
ঋগ্বেদে নাট্য কবিতা : সুকুমার সেন
(নট, নাট্য, নাটক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত)
সাহিত্য সন্দর্শন (৬।২৫) : শ্রীশ চন্দ্র দাস
সাহিত্য দর্পণ : বিশ্বনাথ কবিরাজ
বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা : দীপক চন্দ্র
বাংলার নাটক ও নাট্যশালা : শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
এই দশকের একাঙ্ক : প্রবোধ বন্ধু অধিকারী
ছোটগল্পের সীমারেখা : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
সবারে আমি নমি : কানন দেবী
The Theory of Drama : A Nicoll.
The One-Act play Today : W. Kozlenko.
Towards Revolutionary Theatre : Utpal Dutt

Indian Film	Barnow Erick & Krishnaswamy.
The Story of the Calcutta Theatre 1953-1980	Sushil Kumar Mukherjee
How Films are made	Khwaja Ahmed
Mass Communication published by and Man.	Gaston Roberge
Film	Manvell Roger
Seventy years of Cinema	Peter Cowie.
Film Form	Eisenstein Sergei M.
Chitra Bani	Gaston Roberge.
One act play	Dictionary of World Literary Terms by Shipley P. 225.

Oxford companion to The Theatre	:	Interlude (O.V.P. 1951) P.387.
,, ,, ,, ,, ,,	.	Intermezzi (,, ,,) P. ,,
,, ,, ,, ,, ,,	:	Curtain Raiser (,, ,,) P. 171

সহায়ক পত্র-পত্রিকার তালিকা

আনন্দবাজার	:	৯.২.৩১
ঐ	:	১.২.৩৪
ঐ	:	১১.১০.৩৭
ঐ	:	২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮
ঐ	:	২৬.৭.৬২
ঐ (শারদীয়া	:	১৩৪৯
ঐ (শ্রাবণ সংখ্যা)	:	,,
ঐ	:	১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫
ঐ	:	২৭.২.৫৩
ঐ	:	১৯৫৫
ঐ (স্বাধীনতা সং)	:	১৯৫৬
অমৃত বাজার	:	২.১০.২৭
ঐ	:	১২.২.৩১
ঐ	:	২০.৪.৬৫
ঐ	:	১০.১০.৩৭
আনন্দবাজার	:	২২.৩.৩৭
ঐ	:	৩.১০.৪১
হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড	:	২১.৩.৪১
গণনাট্য (শারদ সংখ্যা)	:	১৩৭৫
ঐ (১ম বর্ষ)	:	এপ্রিল ১৯৬৫
ঐ (১৬শ সংখ্যা)	:	১৯৮০
ঐ (শারদীয়া)	:	অক্টোবর ১৯৬৫
নাট্যশালা শতবর্ষ স্মরণিকা (পশ্চিম দিনাজপুর)	:	১৯৭৩
গল্পভারতী . বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা	:	১৯৮০
গল্পভারতী (আষাঢ়)	:	১৩৭৫
কাফেলা	:	১৩৭৬
ধ্বনি	:	১৫ই মার্চ ১৯৬৯
নর্থবেঙ্গল (পূজা সংখ্যা)	:	১৩৬৬
যাত্রাজগৎ (ঐ)	:	১৩৭৫
সূত্রধার (শারদীয়া)	:	১৯৬২
বসুধারা (ভাদ্র সং)	:	১৯৬১
যুগান্তর	:	১লা ফাল্গুন, ১৩৪৪
ঐ	:	৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

ঐ	:	১৯৩৭
চিত্রিতা (শারদীয়া)	:	১৩৬৪
ঐ ঐ	:	১৩৬৫
চিত্রবাণী (অহীন্দ্র সং)	:	১৩৬৩
দেশ	:	১৩৬১
দেশ	:	২০.৭.৬৫
দেশ	:	১৭ই বৈশাখ, ১৩৪৫
আমোদ (৬য় বর্ষ ১৬শ সংখ্যা)	:	২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৪০
শিশির (১৩শ বর্ষ ২৮ সংখ্যা)	:	১লা পৌষ ১৩৪০
ঐ	:	১৮ই ,, ১৩৩৭
নাচঘর (নবম বর্ষ ৪৫ সংখ্যা)	:	২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৪০
ঐ	:	১৩৩৮
ঐ	:	১৭ই পৌষ১৩৩৭
ঐ	:	১০.১০১৯৩০
ঐ	:	২৩.৯.১৯২৭
রঙ্গালয় (শারদীয়া)	:	১৩৬০
বহুরূপী পত্রিকা (নবম সংখ্যা)	:	১৯৫৯
বিশ্বরূপা নাট্য-পরিকল্পনা মুখপত্র Mercury	:	৫.৫.৫৯
রুশভারতী (১ম বর্ষ, ১ম ও ২য় সং)	:	মে-আগষ্ট, ১৯৬৫
সংহতি (শারদীয়া)	:	১৯৩১
সংহতি	:	১৩৫৫ পৌষ
নবশক্তি	:	১৭ই পৌষ ১৩৩৭
ভোটরঙ্গ	:	১৮.১.৩১
বঙ্গবাণী (৩ খণ্ড, ২৬ সং)	:	৩০শে আষাঢ় ১৩৩৮
,,	:	৭.৩.৩১
অমৃত (বিনোদন সংখ্যা)	:	১৪ই পৌষ ১৩৭৯
দীপালী (৫ম বর্ষ ৩৭ সং)	:	২১শে অগ্রহায়ণ ১৩৪০
ঐ	:	জুলাই ১৯৩১
ঐ	:	১লা মাঘ ১৩৩৭
দীপালী	:	২৮.১০.৩৭
কল্লোল	:	পৌষ ১৩৩৫
আত্মশক্তি	:	৪ঠা কার্ত্তিক ১৩৩৪
ভগ্নদূত (৪৭সংখ্যা ৬বর্ষ)	:	২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৪০
ঐ	:	৩.১.৩১
খেয়ালী	:	২৩.২.১৩৩৮
দুন্দুভি (১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)	:	৪.৭.৩১

উত্তরা	:	১৩৬০
সোভিয়েত দেশ (১৪শ সংখ্যা)	:	১৯৬৮
স্বদেশ	:	২১.১০.৩৭
হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড	:	১৩.৩.৩৮
ঐ	:	নিউ দিল্লী, ১৯৫৭
প্রবাসী	:	চৈত্র সংখ্যা, ১৩৬১
অমৃত	:	২৩.১১.৬২
যুগান্তর	:	৪.১১.৬২
ধূমকেতু	:	২৩শে ভাদ্র ১৩৪৫
বাঙলা	:	১৮.১১.৩৮
আজাদ	:	৯.৯.৩৮
বাতায়ন	:	১৯.১১.৩৮
স্বদেশ	:	৯.৯.৩৮
দীপালী	:	৮.২.৪০
ঐ	:	১০.১.১৯৩৫
ঐ	:	৮.৯.৩৮
ঐ	:	১৮.১১.৩৮
স্বাধীনতা	:	২৭.৫.৫৫
দর্শক ১১শ বর্ষ ১৯ সংখ্যা	:	নাট্যকার : মন্মথ রায় রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় ১৩৭৮
মধুপর্ণী :	:	মন্মথ রায়
মহানগর (১ম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা)	:	কি দেখেছি, কি দেখছি : মন্মথ রায়
শনিবারের চিঠি	:	নলিনীকান্ত ভট্টশালী : রবীন্দ্র তিরোধান সংখ্যা, ১৩৪৮
পাঞ্চজন্য (চট্টগ্রাম শারদীয় সংখ্যা)	:	১৩৪৬
রূপমঞ্চ	:	১৩৪৮
ঐ (শারদীয়া)	:	১৯৬২
ঐ	:	১৩৬৫
ঐ	:	১৩৬৬
Advance	:	31.6.31
,,	:	11.10.37
,,	:	28.1.34
,,	:	1935
Dipali (Voll VII No.29)	:	19.7.35
The Statesman	:	14.3.38
,,	:	New Delhi, 1957.
The Times of India	:	1957
Advance	:	13.3.34

Forward	19.3.34
The Illustrated Weekly of India	17.3.40
Bombay Chronicle	15 3.40
The Times of India	15 2.41
„ (Bombay)	8.10.41
The Hindu (Madras)	28.2.41
The Motion Picture Magazine (Bombay)	Oct. 1941
The Statesman	5.10.41
The Amrita Bazar Patrika	5.10.41
Cine Advance	7 4.55